কালের মন্দিরা

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়



গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ... কলিকাতা-৬

তিন টাকা আট আনা

শ্রাবণ ১৩৫৮

প্রথম সংস্করণ

এই কাহিনীর ঐতিহাসিক পটভূমিকা ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম ভাগ দ্বিতীয় সংস্করণে এইরূপ পাওয়া যায়—

'মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমার গুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। স্কন্দগুপ্ত যৌবরাজ্যে পুষ্য মিত্রীয় ও হূণগণকে পরাজিত করিয়া পিতৃরাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, যুবরাজ ভট্টারক স্কন্দগুপ্ত পিতৃকুলের বিচলিতা রাজলক্ষ্মী স্থির করিবার জন্য রাত্রি ত্রয় ভূমিশয্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। প্রথমবার পরাজিত হইয়া হূণগণ উত্তরাপথ আক্রমণে বিরত হন নাই, প্রাচীন কপিশা ও গান্ধার অধিকার করিয়া হূণগণ একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। ৪৬৫ খৃষ্টাব্দের পর হূণগণ পুনর্বার ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করে ও বারবার গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ করে।"

আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, কেবল স্কন্দগুপ্তের চরিত্র ঐতিহাসিক।

এই আখ্যায়িকায় নিছক গল্প বলা ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য যদি থাকে তবে তাহা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে—

হেথায় আর্য হেথা অনার্য হেথায় দ্রাবিড় চীন
শক হূণ দল পাঠান মোগল এক দেহে হ'ল লীন।

অতীতে যাহা বারবার ঘটিয়াছে ভবিষ্যতেও তাহা ঘটিবে, ইতিহাসের এই আত্মনিষ্ঠায় অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। যাহারা মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধি চিরস্থায়ী করিতে চাহে তাহারা ইতিহাসের অমোঘ ধর্ম লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করে, তাহারা শুধু বিচারমূঢ় নয়—মিথ্যাচারী।

সবশেষে এই কাহিনী সম্বন্ধে একটি ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি আছে

তাহা পাঠকপাঠিকাকে নিবেদন করা প্রয়োজন মনে করি। ১৯৩৮ সালে মুঙ্গেরে থাকা কালে এই কাহিনী লিখিতে আরম্ভ করি। কয়েক পরিচ্ছেদ লেখা হইবার পর সুদূর বোম্বাই হইতে আহ্বান আসিল, জীবনের সমস্ত কর্মসূচী ওলটপালট হইয়া গেল। তারপর দীর্ঘ দশ বৎসর এ কাহিনী আর লিখিতে পারি নাই। শুধু সময়ের অভাবেই নয়, এ আখ্যায়িকা লিখিবার পক্ষে মনের যে ঐকান্তিক অনন্যপরতা প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অতঃপর ১৯৪৮ সালে দৃঢ়ব্রত হইয়া আবার আখ্যায়িকার ছিন্নসূত্র তুলিয়া লইয়াছি এবং আরম্ভের ঠিক বারো বৎসর পরে শেষ করিয়াছি।

বারো বৎসরের ব্যবধানে মানুষের মন এক প্রকার থাকে না; চরিত্র দৃষ্টিভঙ্গী রসবোধ সবই বদলাইয়া যাইতে পারে; সৃষ্টিশক্তিরও তারতম্য ঘটা সম্ভব। গল্পের যে স্থানটিতে বারো বছরের ফাঁক পড়িয়াছে পাঠকপাঠিকা হয়তো সহজেই তাহা ধরিয়া ফেলিতে পারিবেন। যদি না পারেন, বুঝিব আমার অন্তর্লোকে মহাকালের মন্দিরা এখনও একই ছন্দে বাজিতেছে, তাহার তাল কাটে নাই।

৬।২।১৯৫০
মালাড্

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মোঙের বিলাপ

বৃদ্ধ হূণ-যোদ্ধা মোঙ্‌ গল্প বলিতেছিল। নির্জন বনপথের পাশে ক্ষুদ্র একটি জলসত্র, এই সত্রের প্রপাপালিকা যুবতী অদূরে বসিয়া করলগ্ন-কপোলে মোঙের গল্প শুনিতেছিল।

চারিদিকে প্রস্তরাকীর্ণ অসমতল ভূমির উপর দেবদারু, পিয়াল ও মধুকের বন। পথের ধারে বন তত ঘন নয়, যত দূরে গিয়াছে ততই নিবিড় হইয়াছে। অনুচ্চ পর্বতের শ্রেণী দ্বিপ্রহরের খর রৌদ্রে শল্কাবৃত সরীসৃপের ন্যায় নিদ্রালুভাবে পড়িয়া আছে। নবাগত গ্রীষ্মের আলস্য ও পক্ব মধুক-ফলের গুরু সুগন্ধ মিশিয়া আতপ্ত বাতাসকে মদমন্থর করিয়া তুলিয়াছে।

এই পর্বত-কান্তার-তরঙ্গিত বিচিত্র দৃশ্যের ভিতর দিয়া সঙ্কীর্ণ কুটিল পথটি যেন অতি যত্নে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া দক্ষিণ হইতে উত্তরাভিমুখে গিয়াছে। দ্বিপ্রহরেও পথ জনহীন, এই পার্বত্য রাজ্যের কেন্দ্রপুরী কপোতকূট এখান হইতে প্রায় ক্রোশেক পথ দক্ষিণে। পথের পাশে রুক্ষ প্রস্তরে নির্মিত একটি কুটীর—ইহাই জলসত্র, তাহার দুই পাশে দুইটি দীর্ঘ ঋজু দেবদারু বৃক্ষ ঘন কুঞ্চিত পত্রভারে স্থানটিকে ছায়াশীতল করিয়া রাখিয়াছে। বৃদ্ধ হূণ মোঙ্‌ একটি দেবদারুর কাণ্ডে পৃষ্ঠ-ভার অর্পণ করিয়া জানুদ্বয় বাহু দ্বারা আশ্লেষন পূর্বক নিজ স্মৃতিকথা বলিতেছিল।

মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক মগধেশ্বর স্কন্দের ষোড়শ রাজ্যাঙ্কে উত্তর-পশ্চিম ভারতের শৈলবন্ধুর অধিত্যকার একপ্রান্তে, বিটঙ্ক নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী কপোতকূট হইতে অনতিদূরে এক ক্ষুদ্র জলসত্রের তরুচ্ছায়ামূলে আমাদের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইতেছে।

বৃদ্ধ মোঙ্‌ নিজের বিলাপপূর্ণ স্মৃতিকথা শুনাইতে ভালবাসিত। আহার

যোদ্ধ জীবন শেষ হইয়াছে, দেহে আর শক্তি নাই ; যে দুর্ধর্ষ প্রকৃতি লইয়া পঁচিশ বৎসর পূর্বে মুক্ত কৃপাণ হস্তে এই রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাও বোধকরি নিভিয়া গিয়াছে। তাই, উত্তর মেরুর সুদীর্ঘ রাত্রে তুষার সঙ্কটের মধ্যে অগ্নি জালিয়া মেরুবাসী যেমন সূর্যের স্বপ্ন দেখে, জরাগ্রস্ত মোঙ্ তেমনই হূণ জাতির অতীত বীর্য গৌরবের স্বপ্ন দেখিত। তাহার দেহ খর্ব, মাংসপেশী ক্ষয় হইয়া দেহের চর্ম লোল করিয়া দিয়াছে ; তথাপি সে যে এককালে অতিশয় বলশালী ছিল তাহা তাহার শিথিল-চর্মাবৃত দেহ-কঙ্কালের সুবিপুল প্রস্থ হইতে অনুমান হয়। কেশলেশহীন মুখমণ্ডল অগণিত কুঞ্চন চিহ্নে শুষ্ক নারিকেল ফলের আকৃতি ধারণ করিয়াছে ; উচ্চ হনু ও ভ্রূ-অস্থির মাঝখানে ক্ষুদ্র চক্ষুদুটি কিন্তু সুকৃষ্ণ। মাথার উপর কয়েক গুচ্ছ পাংশুবর্ণ কেশ আপন বিরলতার ফাঁকে ফাঁকে করোটির গঠন প্রকট করিতেছে।

মোঙের কণ্ঠস্বর শ্রুতিমধুর নয়। হূণ জাতির কণ্ঠস্বর স্বভাবতই প্রসাদগুণবর্জিত ; মোঙ্ কথা কহিলে মনে হইত, গুরুভারবাহী গো-শকটের তৈলহীন চক্র হইতে আর্ত আপত্তি উত্থিত হইতেছে। নগরের পান-শালায় মোঙ্ গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেই শ্রোতারা উঠিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিত। কিন্তু তথাপি মোঙ্ নিরাশ হইত না ; কোনও ক্রমে একটি শ্রোতা সংগ্রহ করিতে পারিলেই সে অতীতের কাহিনী আরম্ভ করিয়া দিত।

বর্তমানে মোঙের একটি শ্রোত্রী জুটিয়াছিল—সে এই জলসত্রের প্রপাপালিকা সুগোপা। তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণা তন্বী, বয়স অনুমান কুড়ি বাইশ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বস্তুত পঁচিশ বৎসর। অধর প্রান্তে একটু চটুলতার আভাস, চক্ষুদুটি নীলাঞ্জন মেঘের স্নিগ্ধতায় সরস। সুগোপা কপোতকূটের রাজ-উদ্যানের মালাকরের বনিতা, তাহার হাতের মালা নহিলে রাজকুমারী—

কিন্তু সুগোপার পূর্ণ পরিচয় পরে প্রকাশ পাইবে।

মোঙ্ দন্তধাবন কাষ্ঠের অন্বেষণে প্রায় নগর বাহিরে জঙ্গলের মধ্যে আসে, করঞ্জবৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ অন্যত্র পাওয়া যায় না। তখন দুদণ্ড সুগোপার কাছে বসিয়া সে নিজের প্রিয় কাহিনী বলিয়া যায়, সুগোপাও আপত্তি করে না। সারাদিন তাহাকে একাকিনী এই প্রপায় থাকিতে হয়, ক্বচিৎ দুই চারিজন দূরাগত পথিক জলপান করিবার জন্য ক্ষণেক দাঁড়ায়, তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া নগরাভিমুখে চলিয়া যায়, এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে মোঙের গল্প তাহার মন্দ লাগে না। সুদূর বক্ষু নদীর তীরে হূণেরা কি করিয়া জীবনযাপন করিত, তারপর একদিন যাযাবর জাতির স্বভাবজ অস্থিরতা কেমন করিয়া তাহাদের বিশাল গোষ্ঠীকে গান্ধারের সীমান্তে আনিয়া উপনীত করিল, তারপর পঞ্চনদ-ধৌত শ্যামল উপত্যকার লোভে তাহারা কি ভাবে পঙ্গপালের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, স্কন্দের সহিত হূণদের যুদ্ধ, হূণগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, তারপর দ্বাদশ সহস্র হূণ এই বিটঙ্ক রাজ্য অধিকার করিয়া বসিল, কপোতকূটে প্রবেশ করিয়া রাজপুরী আক্রমণ করিল—

মোঙ গল্প বলিতেছিল, সুগোপা অদূরে পীঠিকার ন্যায় একটি উচ্চ প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া করলগ্নকপোলে শুনিতেছিল—

দর্দুর ধ্বনিবৎ একটি শব্দ মোঙের কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, ইহা তাহার হাস্য। ক্ষণিক কৌতুক অপনোদিত হইলে মোঙ্ বলিল, 'মেষ। গড্ডলিকা! হূণ জাতি আর নাই, ভেড়া বনিয়া গিয়াছে। পঁচিশ বৎসর পূর্বে যাহারা সিংহ ছিল, তাহারা আজ ভেড়া! কাহাকে দোষ দিব? আমাদের যিনি রাজা, যিনি একদিন স্বহস্তে এদেশের বীর্যহীন অধিপতির মাথা কাটিয়া শূলশীর্ষে স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি আজ অহিংসা ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, বরাহ পর্যন্ত আহার করেন না। ধর্ম! তরবারি

যাহার একমাত্র দেবতা, সে চৈত্য নির্মাণ করিয়া কোন্ এক মৃত ভিক্ষুকের অস্থি পূজা করিতেছে ! হ হ হ—' মোঙের কণ্ঠ হইতে আবার শ্লেষপূর্ণ দর্দুর ধ্বনি বাহির হইল।

সুগোপা করতল হইতে মুখ তুলিয়া বলিল—'মহারাজ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন।'

মোঙ্ও বৃক্ষকাণ্ডের অবলম্বন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল, তালপত্রের পুত্তলীর ন্যায় সহসা দুই হস্ত আস্ফালিত করিয়া বলিল—'সেই কথাই তো বলিতেছি। কিন্তু কেন এমন হইল? দ্বাদশ সহস্র শোণিত-লোলুপ মরু-সিংহ পঁচিশ বৎসর পূর্বে এদেশে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা আজ কোথায়? ভেড়া—সব ভেড়া।'

সুগোপার অধর কোণে একটু হাসি দেখা দিল; সে বলিল—'মোঙ্, তবে তো তুমিও ভেড়া।'

মোঙ্ ও কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুনশ্চ ঠেস্ দিয়া বসিল, ক্ষুদ্র চক্ষুযুগল কিছুক্ষণ সুগোপার মুখের উপর স্থাপন করিয়া রহিল; তারপর কতকটা যেন নিজ মনেই বলিল—'অসির নখ, ঘোড়ার পিছনের পা এবং স্ত্রীলোকের কটাক্ষ—মানুষের সমস্ত বিপদের মূলে এই তিনটি। হূণ শিশুকাল হইতেই প্রথম দুইটিকে এড়াইয়া চলিতে শিখে, কিন্তু ঐ তৃতীয় বিপদই তার সর্বনাশ করিয়াছে। বেশ ছিলাম আমরা মরুর কোলে; আমাদের বলিষ্ঠ রূপহীনা নারীরা অশ্ব উষ্ট্রের সহিত একসঙ্গে কাজ করিত, দুর্দম হূণশিশু প্রসব করিত—এদেশের কুহকিনীদের মত পুরুষকে মেষ-শাবকে পরিণত করিতে পারিত না। প্রবাদ বাক্য মিথ্যা নয়, অসির নখ, ঘোড়ার পা আর স্ত্রীলোকের কটাক্ষ—' মোঙ্ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ভাবে সুগোপার সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া শুষ্ক নারিকেলের মত মাথাটি নাড়িতে লাগিল।

মৃদু হাসিয়া সুগোপা বলিল—'মোঙ্—তোমার নাগসেনার কটাক্ষ কি এখনও খুব তীক্ষ্ণ আছে?'

মোঙ্ দুই হাত নাড়িয়া সুগোপার পরিহাস দূরে সরাইয়া দিয়া বলিল—'এক পুরুষের মধ্যে একটা জাতি নির্বীর্য হইয়া গেল! আমরা না হয় বুড়া হইয়াছি—যৌবন ও অশ্বিনীদুগ্ধজাত মদ্যের মাদকতা চিরদিন থাকে না, কিন্তু আমাদের সন্তানেরাই বা কী? তাহারা হূণের পুত্র বটে, তবু তাহারা হূণ নয়। মরু-সিংহের ঔরসে একপাল ভেড়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে।'

ভেড়ার উপমাটী বৃদ্ধকে চাপিয়া ধরিয়াছে, তদুপরি সে উত্তরোত্তর উষ্ণতর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সুগোপা বলিল—'সেজন্য বিলাপ করিয়া লাভ নাই। এ দেশের নারীরা তোমাদের সাধিয়া বিবাহ করে নাই, তোমরাই বলপূর্বক তাহাদের বিবাহ করিয়াছিলে—এখন কাঁদিলে চলিবে কেন? আর, ফলও নিতান্ত মন্দ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তোমাদের বংশধরেরা—আর কিছু না হোক তোমাদের চেয়ে সুশ্রী। তাহাদের কুল না থাক, শীল আছে।'

'শীল আছে!' মোঙের স্বর ক্রোধে আরও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল—'কী প্রয়োজন শীলের? শিষ্টতার দ্বারা শত্রুর মুণ্ড কাটিয়া লওয়া যায়? কশার পরিবর্তে সৌজন্য প্রয়োগ করিলে ঘোড়া অধিক দৌড়ায়? আমরা যেদিন রাজধানী অধিকার করি সেদিন কি শিষ্টতা দেখাইয়াছিলাম? বাজপাখীর মত আমরা কপোতকূটের উপর পড়িয়াছিলাম—নগরের পয়ো-নালক পথে রক্তের স্রোত বহিয়া গিয়াছিল! রাজপ্রাসাদের রক্ষীরা আমাদের বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল—হ হ হ—' মোঙ্ আবার হাসিল—'রাজপ্রাসাদ বিজয়ের কথা স্মরণ হইলে এখনও আমার রক্ত নৃত্য করিয়া ওঠে—'

সুগোপা বলিল—'রক্তপিপাসু হূণ, তবে সেই গল্পই বল, তোমার আক্ষেপ শুনিবার আগ্রহ আমার নাই।'

দুরন্ত শিকারের প্রতি চলচ্ছক্তিহীন স্থবির ব্যাঘ্র যেভাবে তাকাইয়া

থাকে, মোঙ্ সেইভাবে শূন্যে তাকাইয়া রহিল, লালায়িত রসনায় বলিতে লাগিল—'সেদিন দুই মুঠি ভরিয়া সোনা লুঠ করিয়াছিলাম। প্রাসাদের নিম্নে অন্ধকূপ কক্ষে সোনার দীনার স্তূপীকৃত ছিল—আটজন বন্দী সেই গর্ভগৃহ পাহারা দিতেছিল তুষফাণ প্রথমে সেই গুপ্ত কোষাগারের সন্ধান পায়, আমরা ত্রিশ জন হূণ গিয়া বন্দীদের কাটিয়া ফেলিলাম। তারপর সকলে মিলিয়া সেই দীনার স্তূপ · এত সোনা আর কখনও দেখিব না। তুষফাণ ছিল আমাদের নায়ক, অধিকাংশ দীনার তাহার ভাগে পড়িল। যুদ্ধ শেষ হইবার পর সেই সোনা আমাদের রাজাকে উপহার দিয়া তুষফাণ চষ্টনদুর্গের অধিপতি হইয়া বসিল—'

সুগোপা বলিল—'তা জানি। তারপর আর কি করিলে?'

মোঙ্ বলিয়া চলিল—'রত্নাগার হইতে উপরে আসিয়া আমরা রাজ অবরোধের দিকে ছুটিলাম। আমাদের পূর্বেই সেখানে বহু হূণ পৌঁছিয়াছিল, চারিদিক হইতে নারীকণ্ঠের চীৎকার, ক্রন্দন, আর্তনাদ উঠিতেছিল। আমরা অবরোধের অলিন্দে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সেখানে এক পরম কৌতুককর খেলা চলিতেছে। ছয় সাত জন হূণ যোদ্ধা একটা ক্ষুদ্র বালকের দেহ লইয়া মুক্ত কৃপাণের উপর লোফালুফি করিতেছে। বালকটা রাজপুত্র—এক বৎসর বয়ঃক্রম হইবে—মাংসের একটা উলঙ্গ পিণ্ড বলিলেই হয়। একজন তাহাকে তরবারির ফলার উপর লইয়া আর একজনের দিকে ছুঁড়িয়া দিতেছে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহাকে তরবারির ফলার উপর গ্রহণ করিতেছে, মাটিতে পড়িতে দিতেছে না। শূন্যে শূন্যে খেলা চলিতেছে। শিশুটা মরে নাই, মাঝে মাঝে অস্পষ্ট কাতরোক্তি করিতেছে। পাছে তরবারির আঘাতে কাটিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায় এইজন্য সকলেই তাহাকে ফলার পার্শ্বদেশে গ্রহণ করিতেছে, তবু শিশুটার সর্বাঙ্গ কাটিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে।

'আমরাও গিয়া খেলায় যোগ দিলাম, মাঝে মাঝে হাসির অট্টরোল

উঠিতে লাগিল। একটা যুবতী দ্বার পথে উঁকি মারিয়া সহসা চীৎকার করিয়া পলায়ন করিল, আমাদের মধ্যে দুই চারিজন খেলা ছাড়িয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল।

'এই সময় কে একজন আসিয়া সংবাদ দিল, রাজা ধরা পড়িয়াছে। রক্তপাগল হূণের দল শিশুকে সেইখানে ফেলিয়া চলিয়া গেল। আমি কিন্তু তাহাদের সঙ্গে গেলাম না। শুধু হত্যা আর লুণ্ঠনে হূণের তৃপ্তি হয় না; নগ্ন তরবারি হস্তে আমি অবরোধের ভিতর প্রবেশ করিলাম।'

এতক্ষণ গল্প বলিতে বলিতে মোঙের ক্ষুদ্র চক্ষুযুগল হিংস্র উল্লাসে জ্বলিতেছিল, এখন সহসা যেন চক্ষুর জ্যোতি নিভিয়া গেল। সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বিষণ্ণ স্বরে বলিল—'এই অবরোধের একটা কক্ষে প্রথম নাগসেনার সাক্ষাৎ পাই। পালঙ্কের নীচে লুকাইয়াছিল, তাহাকে টানিয়া বাহির করিলাম। সে কঙ্কণ দিয়া আমার কপালে আঘাত করিল। আমি তরবারি ফেলিয়া তাহাকে সাপটাইয়া ধরিলাম; সে আমার বক্ষে কামড়াইয়া দিল। কামড়ের দাগ এখনও আমার বুকে আছে। সেই অবধি—' মোঙের স্বর অত্যন্ত করুণ হইয়া ক্রমে থামিয়া গেল।

সুগোপা করতলে কপোল রাখিয়া নিঃশব্দে শুনিতেছিল, এই নৃশংস কাহিনী তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। দেশব্যাপী বিপ্লবের মধ্যে যাহার জন্ম, অমানুষিক নিষ্ঠুরতার বহু চিত্র যাহার শৈশব স্মৃতির মূল উপাদান, যাহার নিজের জননী ও বহু পরিজন এই শোণিতস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে—মোঙের কাহিনী শুনিয়া তাহার বিচলিত হইবার কথা নয়। শুধু রাজপুরী অধিকারের এই পুরাবৃত্ত তাহার অজ্ঞাত ছিল বলিয়াই সে মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল।

কিয়ৎকাল নীরবে কাটিবার পর সুগোপা মুখ তুলিয়া বলিল—'সেই শিশুর কি হইল?'

'শিশুর—?' মোঙ্ স্মৃতির জলে পুনরায় ডুব দিয়া বলিল—'শিশুটা সেই অলিন্দে রক্ত-কর্দমের মধ্যে পড়িয়া ছিল—তারপর—? হাঁ ঠিক, মনে পড়িয়াছে। চু-ফাঙ্! পাগলা চু-ফাঙ্! অবরোধ হইতে নাগসেনাকে লইয়া যখন বাহির হইতেছি, দেখি আমাদের পাগল চু-ফাঙ্ শিশুটাকে নিজের ঝোলার মধ্যে পুরিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এটাকে লইয়া কী করিবে—শূল্য মাংস তৈয়ার করিয়া খাইবে?' চু-ফাঙ্ ভাঙ্গা দাঁত বাহির করিয়া হাসিল—'মোঙ্ আবার চিন্তামজ্জিত হইয়া পড়িল—আশ্চর্য্য, চু-ফাঙকে সেদিনের পর আর দেখি নাই, হয়তো মরিয়া গিয়াছে। তৃণের আয়ু আর মরীচিকার মায়া কখন শেষ হইবে কেহ জানে না। চু-ফাঙ্ পাগল ছিল বটে কিন্তু অনেক যন্ত্র-মন্ত্র জানিত, গাছের পাতা ও শিকড়ের রস দিয়া দেহের অস্থিক্ষত অবিকল জুড়িয়া দিতে পারিত—'

সুগোপা জিজ্ঞাসা করিল—'আর সেই যুবতী? তাহার কি হইল?'

'কোন যুবতী? নাগসেনা?'

সুগোপার অধর একটু প্রসারিত হইল, সে বলিল—'না, নাগসেনার কী হইল তাহা আমরা জানি, নাগসেনা এখন নাগিনী হইয়া তোমার বক্ষ চাপিয়া ধরিয়াছে। আমি অন্য যুবতীর কথা বলিতেছি—যে তোমাদের খেলা দেখিয়া চীৎকার করিয়া পলাইয়াছিল—'

মোঙ্ তাচ্ছিল্যভরে বলিল—'কে তাহার সংবাদ রাখে! দুই তিন জন তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়াছিল তারপর কি হইল জানিনা। রাজপুরীতে বহু কিঙ্করী পরিচারিকা ছিল, হূণেরা যে যাহাকে পাইল দখল করিল। কয়েকটা যুবতী আত্মহত্যা করিয়াছিল—'

সুগোপা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল 'বোধহয় সেই যুবতীই আমার মাতা। তিনি রাজপুত্রের ধাত্রী ছিলেন, আমরা একই স্তনদুগ্ধ পান করিয়াছিলাম।'

মোঙ্ বিস্ময় প্রকাশ করিল না, নিরুৎসুক ভাবে সুগোপার পানে চাহিয়া বলিল—'হইতেও পারে। তাহার বয়স তোমারই মতন ছিল।'

ভূমির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া সুগোপা বলিল—'জানিনা আমার মায়ের কি দশা হইয়াছিল। তিনি আর রাজপুরী হইতে গৃহে ফিরেন নাই। হয় তো আত্মহত্যাই করিয়াছিলেন—'

এই সময় তাহাদের বিশ্রান্তালাপে বাধা পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অশ্বচোর

ভূমিনিবদ্ধ দৃষ্টি তুলিয়া সুগোপা চমকিয়া দেখিল, এক পুরুষ দেবদারু ছায়ার তলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কখন এই অপরিচিত আগন্তুক নিঃশব্দ পদে তাহাদের অত্যন্ত সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহারা জানিতে পারে নাই।

সুগোপা বলিয়া উঠিল—'কে তুমি?'

আগন্তুক উত্তর করিল 'পথিক। তুমি প্রপাপালিকা? জল দাও।'

সুগোপা পথিককে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। আগন্তুক যে বিদেশী তাহা তাহার বেশভূষা দেখিয়া সন্দেহ থাকে না। একটি জীর্ণ লৌহজালিকে ঊর্ধ্বাঙ্গ আবৃত, মস্তকেও অনুরূপ লৌহজালিকের শিরস্ত্রাণ। কটিতে চর্ম-কোষবদ্ধ তরবারি, পদদ্বয় স্থূল বৃংচর্মের পাদুকায় চর্মরজ্জু দ্বারা আবদ্ধ। দেহে কোথাও মাংসের বাহুল্য নাই, বরং দৈর্ঘ্যের অনুপাতে ঈষৎ কৃশ। সমস্ত মিলাইয়া ছিলাহীন ধনু-দণ্ডের মত দেহ ঋজু ও নমনীয়, কিন্তু মনে হয়, প্রয়োজন হইলে মুহূর্ত মধ্যে গুণসংযুক্ত হইয়া প্রাণঘাতী আকার ধারণ করিতে পারে।

আগন্তুকের বয়ঃক্রম অনুমান করা কঠিন, তবে ত্রিশ বৎসরের অধিক

নয়। মুখাবয়বের মধ্যে চক্ষু ও নাসা অতিশয় তীক্ষ্ণ। ভ্রমরকৃষ্ণ চক্ষুর দৃষ্টিতে একটা সতর্ক দুঃসাহসিকতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বাহুবল ও কূট-বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া যাহাদের জীবনধারণ করিতে হয়, তাহাদের চক্ষে এরূপ দৃষ্টি বোধকরি স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়ে।

ফলতঃ আগন্তুক যে একজন যুদ্ধজীবী তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তাহার মুখে ও বাহুতে অগণিত সূক্ষ্ম ক্ষতরেখা দেখিয়া এই অনুমান দৃঢ় হয়। ছিন্ন লৌহজালিকের ফাঁকে বক্ষের উপরেও বহু রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে, দেখিলে মনে হয় গৌরবর্ণ ত্বকের উপর কজ্জল দিয়া কেহ রেখাগুলি আঁকিয়া দিয়াছে। উপরন্তু ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে গোলাকৃতি তিলকের ন্যায় একটি তাম্রবর্ণ চিহ্ন আছে। ইহা ক্ষতচিহ্ন অথবা সহজাত জটুল তাহা নির্ণয় করা যায় না।

সুগোপা ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে আগন্তুককে দেখিয়া লইয়া জল আনিবার জন্য কুটীর অভিমুখে প্রস্থান করিল। আগন্তুক মন্থরপদে আসিয়া তাহার পরিত্যক্ত শিলাপট্টের উপর বসিল। তাহার বসিবার ভঙ্গীতে একটু ক্লান্তভাব প্রকাশ পাইল।

মোঙ্ এতক্ষণ কৌতূহল সহকারে নবাগতকে দেখিতেছিল, এখন বলিল—'তুমি দেখিতেছি বিদেশী। তোমার দেশ কোথায়?'

বিদেশী উত্তর না দিয়া এমনভাবে হস্ত সঞ্চালন করিল, যাহাতে গান্ধার হইতে পুণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত যে-কোনও দেশ হইতে পারে।

মোঙ্ আবার প্রশ্ন করিল—'তুমি যুদ্ধ ব্যবসায়ী?'

বিদেশী সতর্ক দৃষ্টি তাহার দিকে ফিরাইয়া তাহাকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, তারপর সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

মোঙের ভেকধ্বনিবৎ ব্যঙ্গহাস্য আবার উত্থিত হইল—'ভাগ্য দেবতা দেখিতেছি তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন নয়; অস্ত্রক্ষত ছাড়া যুদ্ধ ব্যবসায়ে আর কিছু লাভ করিতে পার নাই। কোন রাজ্যের সেনাভুক্ত ছিলে?'

বিদেশী এবারও উত্তর দিল না, উর্ধ্বদিকে তাকাইয়া যেন অন্যমনস্ক রহিল। মোঙের কৌতূহল উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল, সে অতঃপর গাম্ভীর্য অবলম্বনপূর্বক পৌরুষ সহকারে বলিল—'যুবক, তুমি এ রাজ্যে নূতন আসিয়াছ, বোধহয় জান না ইহা হূণ অধিকৃত। মহাপরাক্রান্ত হূণ কেশরী রোট্ট ধর্মাদিত্য এই বিটঙ্ক রাজ্যের অধীশ্বর। আমিও হূণ। হূণগণ বিজাতীয়ের স্পর্ধা সহ্য করে না। তোমার নাম কি?'

যুবকের স্বল্প গুম্ফের অন্তরালে একটু হাসি দেখা দিল; সে বলিল—'আমার নাম চিত্রক।'

'চিত্রক! চিতা বাঘ!' মোঙের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—'তোমার নাম সার্থক বটে, তোমার সর্বাঙ্গে অস্ত্রাঘাত চিহ্ন দেখিয়া তোমাকে চিতা বাঘ বলিয়াই মনে হয়। এরূপ নাম কেবল হূণদের মধ্যেই ছিল—সিংহ শূকর নাগ বৃষ—যাহার যেরূপ আকৃতি প্রকৃতি সে সেইরূপ নাম গ্রহণ করিত। এখন আর কিছু নাই—' সখেদ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আগ্রহ-ভরে মোঙ্ বলিল—'তুমি বয়সে নবীন, কিন্তু নিশ্চয় অনেক যুদ্ধ করিয়াছ! বহু নগর লুণ্ঠন করিয়াছ। এই বিটঙ্ক রাজ্য একদিন আমরা—কিন্তু এদেশে যুদ্ধবিগ্রহ আর হয় না। মেষপাল কাহার সহিত যুদ্ধ করিবে? পঁচিশ বৎসর পূর্বে একদিন ছিল—'

যুবক জিজ্ঞাসা করিল—'কপোতকূট এখান হইতে কত দূর?'

মোঙ্ বলিল—'তুমি কপোতকূট যাইবে? অধিক দূর নয়, দুদণ্ডের পথ। এক প্রহর এখানে বিশ্রাম করিয়া যাত্রা করিলেও সন্ধ্যার পূর্বে রাজধানী পৌঁছিতে পারিবে। তোমার অশ্ব নাই দেখিতেছি, হূণ যোদ্ধা কিন্তু অশ্ব বিনা এক পা চলে না। উষ্ট্র রোমের শিবির এবং অশ্বের পৃষ্ঠ—হূণের ইহাই বাসস্থান। পঁচিশ বৎসর পূর্বে আমরা দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী—'

সুগোপা মৃৎপাত্রে জল লইয়া ফিরিয়া আসিল, সুতরাং মোঙের গল্পে

বাধা পড়িয়া গেল। পথিক সত্যই তৃষ্ণার্ত ছিল, সে সাগ্রহে উঠিয়া আসিয়া প্রথমে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিল, তারপর গণ্ডূষ ভরিয়া তৃপ্তি-সহকারে জল পান করিল। সুগোপা তাহার অঞ্জলিতে জল ঢালিয়া দিতে দিতে মোঙের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল—'মোঙ্, আর বিলম্ব করিও না, দাঁতন লইয়া গৃহে ফিরিতে বিলম্ব হইলে তোমার নাগসেনা দাঁতনের পরিবর্তে তোমার মুণ্ডটি চিবাইবে।'

মোঙ্ চকিতভাবে ঊর্ধ্বে চাহিল, সূর্যদেব মধ্য গগন অতিক্রম করিয়া পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছেন। মোঙ্ শঙ্কিতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল; জঙ্গলের মধ্যে করঞ্জ কাষ্ঠ অন্বেষণ করিতে সময় লাগিবে, তারপর গৃহে ফিরিবার পথও অনেকখানি। বৃদ্ধ বয়সে দ্রুত চলিবার শক্তি নাই, নাগসেনার সম্মুখে ফিরিয়া যাইতে হয়তো সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। সেটা মোঙের পক্ষে সুখকর হইবে না। পারিবারিক ব্যাপারে যুদ্ধবিগ্রহ মোঙ্ ভালবাসে না।

পঁচিশ বৎসর পূর্বেকার বীরত্ব কাহিনীটা আগন্তুককে শুনাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। মোঙ্ গাত্রোত্থান করিল; কাহাকেও কোনও সম্ভাষণ না করিয়া ক্ষুব্ধ অস্পষ্ট স্বরে তরবারির নখ, ঘোড়ার ক্ষুর ও স্ত্রীজাতির কটাক্ষ সম্বন্ধীয় প্রবাদ বাক্যটা আবৃত্তি করিতে করিতে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল।

এদিকে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া চিত্রক আবার শিলা-পীঠের উপর বসিয়াছিল। সুগোপা দেখিল, সে দুই জানুর উপর কফোনি রাখিয়া মুষ্টিবদ্ধ হস্তের শীর্ষে চিবুক ন্যস্ত করিয়া স্থিরনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া আছে। হঠাৎ সুগোপা একটু অস্বস্তি অনুভব করিল। সে মাসের পর মাস একাকিনী এই জলসত্রে দিন কাটায়, কত পথিক আসে যায়; কেহ নবীনা প্রপাপালিকাকে দেখিয়া দুটা রঙ্গ পরিহাসের কথা বলে, সুগোপা চটুলকণ্ঠে তাহার উত্তর দেয়; কেহ বা প্রগল্‌ভতার সীমা অতিক্রম

করিলে দুই চারিটি কঠিন বাক্যবাণে জর্জরিত করিয়া তাহাকে অধোবদনে বিদায় করে। কোনও অবস্থাতেই সুগোপার আত্মপ্রত্যয় বিচলিত হয় না। কিন্তু আজ এই জীর্ণবেশ বিদেশী যুবকের নিষ্পলক চাহনি তাহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল।

স্খলিত নিচোলপ্রান্ত বুকের উপর টানিয়া দিয়া সুগোপা বলিল—'তুমি তো কপোতকূটে যাইবে, তবে বিলম্ব করিতেছ কেন?'

চিত্রক তেমনিভাবে চাহিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল—'শ্রান্তি দূর করিতেছি। আমার ত্বরা নাই।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল; চিত্রকের অচঞ্চল দৃষ্টি সুগোপার উপর বিন্যস্ত হইয়া আছে। সুগোপা ক্রমে অধীর হইয়া উঠিল, ঈষৎ রুক্ষস্বরে কহিল—'তুমি কোন্ বর্বর দেশের মানুষ—স্ত্রীলোক কখনও দেখ নাই?'

এইবার চিত্রক সুগোপার মুখ হইতে দৃষ্টি সরাইয়া সাবধানে চারিদিকে চাহিল। তাহার অধরোষ্ঠ একবার সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইল। তারপর আবার মুষ্টির উপর চিবুক রাখিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল—'স্থানটি বেশ নির্জন।'

এই অসংলগ্ন উত্তরে সুগোপা রুষ্টভাবে অধর দংশন করিল, তারপর ভূমি হইতে জলপাত্র তুলিয়া লইয়া কুটীরের দিকে চলিল।

- 'তুমি সুন্দরী এবং যুবতী।'

সুগোপা চকিতে গ্রীবা বাঁকাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। চিত্রকের কণ্ঠস্বরের সমতা বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না, সে পুনশ্চ বলিল—'তুমি সুন্দরী এবং যুবতী। এই জনহীন স্থানে একাকিনী থাকিতে তোমার ভয় করে না?'

ভ্রূভঙ্গ করিয়া সুগোপা বলিল—'ভয়! কিসের ভয়?'

'বনে হিংস্র জন্তু আছে!'

'হিংস্র জন্তুকে আমি ভয় করি না।'

'আর—মানুষকে?'

'মানুষ ধৃষ্টতা করিলে আমার অস্ত্র আছে।'

'কী অস্ত্র?'

সুগোপা তর্জনী তুলিয়া কুটীরের প্রাঙ্গণ দেখাইল। চিত্রক ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে একটি সম্মার্জনী রহিয়াছে। তাহার কণ্ঠে একটু নীরস হাস্যধ্বনি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সে বলিল—'তুমি সাহসিকা বটে। কিন্তু ঐ অস্ত্রের দ্বারা লোলুপ পুরুষকে নিবারণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়?'

'হয়।' অস্পষ্টস্বরে এই কথাটি বলিয়া সুগোপা আবার কুটিরের দিকে পা বাড়াইল। কিন্তু তাহাকে এক পদের অধিক অগ্রসর হইতে হইল না।

চিত্রক এতক্ষণ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট ভঙ্গিতে বসিয়া ছিল, এখন সহসা বন্য বিড়ালের মত লম্ফ দিয়া সুগোপার সম্মুখে দাঁড়াইল, তাহার মুখের অত্যন্ত নিকটে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—'সাহসিনি, এখন কোন অস্ত্র ব্যবহার করিবে?' তাহার কণ্ঠস্বরে গভীর ব্যঙ্গের সহিত গভীরতর একটা উত্তেজনার আভাস স্ফুরিত হইয়া উঠিল।

সত্রাস চক্ষু তুলিয়া সুগোপা দেখিল, চিত্রকের দুই চক্ষু হীরকখণ্ডের মত জ্বলিতেছে, তাহার ললাটস্থ তাম্রবর্ণ চিহ্নটা রক্ত তিলকের মত লাল হইয়া উঠিতেছে। সুগোপা ক্ষণকাল স্তম্ভিতবৎ থাকিয়া বলিল—'পথ ছাড়, বর্বর।'

'যদি না ছাড়ি?'

সুগোপা অসহায় নেত্রে চারিদিকে চাহিল। এই সময়, যেন তাহার বিভ্রান্ত উৎকণ্ঠার সাক্ষাৎ প্রত্যুত্তর স্বরূপ শিলাকঙ্করপূর্ণ পথের উপর দ্রুত অশ্বের আস্কন্দিত ধ্বনি শুনা গেল। পরক্ষণেই একটি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে উচ্চ আহ্বান আসিল—

'সুগোপা! সুগোপা!'

চিত্রক সুগোপার পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণেক পরে অশ্বারোহীকে দেখা গেল; বিদ্যুতের মত দ্রুতগতি অশ্ব পথ হইতে দেবদারু বৃক্ষের তলে আসিয়া দাঁড়াইল। আরোহী এক লম্ফে ভূমিতে অবতরণ করিতেই সুগোপা ছুটিয়া গিয়া তাহাকে দুই বাহুতে জড়াইয়া ধরিল।

অশ্বারোহীর বয়স অধিক নয়, কিশোর বলিলেই হয়, মুখে শ্মশ্রুগুম্ফের চিহ্নমাত্র নাই। মস্তকে উজ্জ্বল ধাতুনির্মিত উষ্ণীষ, বক্ষে বর্ম, পৃষ্ঠে ধনু ও তূণীর। অপরূপ সুন্দর আকৃতি, দেখিয়া মনে হয় দেব-সেনাপতি কিশোর কার্তিকেয় শত্রু বিজয়ে বাহির হইয়াছেন।

তরুণ বীর প্রফুল্ল বক্তাধরে হাসিয়া বলিল—'সুগোপা, কী হইয়াছে সখি?'

সুগোপার মন হইতে ক্ষণিক বিপন্নতার সমস্ত গ্লানি মুছিয়া গিয়াছিল, সে গদ্ গদ্ আনন্দের স্বরে বলিল—'কিছু না—ঐ বিদেশী গ্রামীণটা প্রগলভতা করিয়াছিল মাত্র। এস—ঘরে এস। শিকারে বাহির হইয়াছিলে বুঝি? গাল দুটি যে রৌদ্রে রাঙা হইয়া গিয়াছে।'

চিত্রক ইতিমধ্যে নিঃশব্দে সরিয়া গিয়া দেবদারু বৃক্ষের কাণ্ডে এক হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অন্য হস্তটি অবহেলাভরে তরবারির উপর ন্যস্ত ছিল। তরুণ ঈষৎ বিস্ময়ে তাহার দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। ক্ষণিকের জন্য উভয়ের চক্ষু মিলিত হইল। তারপর অবজ্ঞাপূর্ণ তাচ্ছিল্যের সহিত অশ্বের বল্গা চিত্রকের দিকে নিক্ষেপ করিয়া সুকুমার কান্তি তরুণ বলিল—'আমার অশ্ব রক্ষা কর—পারিতোষিক পাইবে।' বলিয়া সুগোপার কটি বাহুবেষ্টিত করিয়া হাসিতে হাসিতে কথা কহিতে কহিতে কুটীরের দিকে চলিল।

সুগোপা সোহাগ-বিগলিত-কণ্ঠে বলিল—'তুমি যে এই নিভৃত স্থানে আমাকে দেখা দিতে আসিবে তাহা আমার সকল দুরাকাঙ্ক্ষার অতীত।'

তরল হাসিয়া তরুণ বলিল—'প্রপাপালিকা কিরূপ কর্তব্য পালন করিতেছে রাজপক্ষ হইতে তাহাই পরিদর্শন করিতে আসিলাম।'

তাহারা কুটীর মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেলে চিত্রক ধীরে ধীরে অশ্বের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। সুন্দর কাম্বোজীয় অশ্ব, প্রস্তর মূর্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মধুপিঙ্গলবর্ণ ত্বকে চীনাংশুকের মসৃণতা, গ্রীবার চামর মুক্তামালায় মণ্ডিত, পৃষ্ঠে কোমল রোমাবলি নির্মিত আসন, বল্গার রজ্জু স্বর্ণালঙ্কৃত।

চিত্রক অশ্বের গ্রীবায় একবার লঘু স্পর্শে হাত বুলাইল, অশ্ব আপ্যায়িত হইয়া নাসা মধ্যে ঈষৎ হর্ষসূচক শব্দ করিল। চিত্রক তখন সঙ্কুচিত সতর্ক চক্ষে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। নিস্তব্ধ অপরাহ্ণ; কেবল কুটীরের অভ্যন্তর হইতে মাঝে মাঝে কলহাস্যের ধ্বনি প্রকৃতির বৈকালী তন্দ্রালসতা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে। পথে জনমানব নাই।

চিত্রকের ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসি দেখা দিল, কুটিল তিক্ত হাসি, তাহাতে আনন্দ বা কৌতুকের স্পর্শ নাই। তাহার ললাটের তিলকচিহ্ন আবার ধীরে ধীরে আরক্ত হইয়া উঠিল।

অশ্বের বল্গা ধরিয়া চিত্রক সন্তর্পণে তাহাকে পথের দিকে লইয়া চলিল; শষ্পাকীর্ণ ভূমির উপর শব্দ হইল না। তারপর একবার পিছনে কুটীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এক লম্ফে সে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিল। আসনের উপর ঝুঁকিয়া বসিয়া জঙ্ঘা দ্বারা তাহার পঞ্জর চাপিয়া ধরিতেই অশ্ব তাড়িৎ স্পৃষ্টের ন্যায় লাফাইয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। প্রস্তরময় পথের উপর তাহার ক্ষিপ্র ক্ষুরধ্বনি কয়েকবার শব্দিত হইয়াই আবার পরপারের তৃণভূমির উপর নীরব হইয়া গেল।

নিমেষ মধ্যে অশ্ব ও আরোহী পথিপার্শ্বস্থ গভীর বনানীর মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মগধের দূত

মহাকবি কালিদাস রঘুর দিগ্‌বিজয় বর্ণনাচ্ছলে যে অমিত-বিক্রম মগধেশ্বরের বিজয়গাথা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম সমুদ্রগুপ্ত। এক হিসাবে সমুদ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডার অপেক্ষাও শক্তিধর ছিলেন; আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য তাঁহার মৃত্যুর পরেই ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার সমুদ্রমেখলাধৃত বিশাল সাম্রাজ্যকে এমন সুকঠিন শৃঙ্খলে বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার বংশধরগণ তিন পুরুষ পর্যন্ত প্রায় নিরুপদ্রবে তাহা ভোগ করিয়াছিলেন, শত বর্ষ মধ্যে সে বন্ধন শিথিল হয় নাই।

গুপ্ত সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরিল সমুদ্রগুপ্তের পৌত্র কুমারগুপ্তের সময়। তখনও সাম্রাজ্য কপিশা হইতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ পর্যন্ত বিস্তৃত; কিন্তু বহিরাকৃতি অটুট থাকিলেও গজভুক্ত কপিত্থবৎ অন্তঃশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। যে দুর্দম জীবনশক্তি এই বিরাট ভূখণ্ডকে একত্রীভূত করিয়া রাখিয়াছিল, কালক্রমে জরার প্রভাবে তাহা শ্লথ হইয়া গিয়াছে।

কুমারগুপ্তের দীর্ঘ রাজত্বকালের শেষভাগে উন্মত্ত ঝঞ্ঝাবর্তের মত হূণ-অভিযান সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে আঘাত করিল। এই প্রচণ্ড আঘাতে জীর্ণ সাম্রাজ্য কাঁপিয়া উঠিল। কুমারগুপ্ত ভোগী ছিলেন, বীর ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার ঔরসে এক মহাবীর পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল—গুপ্তবংশের শেষ বীর স্কন্দ। তরুণ স্কন্দগুপ্ত তখন যুবরাজ-ভট্টারক পদে আসীন; রাজবংশের চঞ্চলা লক্ষ্মীকে স্থির করিবার জন্য স্কন্দ তিন রাত্রি ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া যুদ্ধযাত্রায় বাহির হইলেন। সেই দিন হইতে ক্ষয়গ্রস্ত পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যকে অটুট রাখিবার অক্লান্ত চেষ্টায় দীর্ঘ জীবনের

শেষ দিন পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে ও সৈন্য শিবিরে যাপন করাই এই ভাগ্যহীন বীরকেশরীর পূর্ব ইতিহাস।

যুবরাজ স্কন্দ পঞ্চনদ প্রদেশে হূণ অক্ষৌহিণীর সম্মুখীন হইলেন। হিংস্র বর্বর হূণগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করিল, কিন্তু অসামান্য রণপণ্ডিত স্কন্দের সহিত আঁটিয়া উঠিল না। তথাপি আশ্চর্য্য এই যে, তাহারা নিঃশেষে দূরীভূত হইল না। পঞ্চনদ প্রদেশ নদনদী ও পর্বত দ্বারা বহুধা খণ্ডিত; চক্রবর্ত্তী গুপ্তসম্রাটের অধীনে প্রায় পঞ্চাশটি ক্ষুদ্রবৃহৎ সামন্তরাজা ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য রচনা করিয়া এই দেশ শাসন করিতেন। হূণদের আক্রমণে সমস্তই লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়াছিল, কূলপ্লাবী বন্যায় খড়কুটার সহিত মহীরুহও ভাসিয়া গিয়াছিল। অতঃপর স্কন্দের আবির্ভাবে বন্যার জল নামিল বটে কিন্তু নানা স্থানে আবদ্ধ জলাশয় রাখিয়া গেল। পরাজিত হূণ অনীকিনীর অধিকাংশ দেশ ছাড়িয়া গেল, কতক প্রকৃতি-সুরক্ষিত দুর্গম ভূমি আশ্রয় করিয়া রহিয়া গেল।

কুটিল রোগ যেমন তীব্র ঔষধের দ্বারা বিদূরিত না হইয়া দেহের দুর্লক্ষ্য দুরধিগম্য স্থানে আশ্রয় লয়, কয়েকটা হূণ গোষ্ঠীও তেমনি ইতস্তত সানু-সঙ্কট-বন্ধুর স্থানে অধিষ্ঠিত হইল। হয় তো স্কন্দ আরও কিছুকাল এই প্রান্তে থাকিতে পারিলে সম্পূর্ণরূপে হূণ উৎপাত উন্মূলিত করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি থাকিতে পারিলেন না, সাম্রাজ্যের অপর প্রান্তে গুরুতর অশান্তির সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে ফিরিতে হইল। পঞ্চনদ প্রদেশ বাহ্যতঃ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রহিল বটে, কিন্তু ধর্ষিতা নারীর ন্যায় তাহার প্রাক্তন অনন্যপরতা আর রহিল না।

বিটঙ্ক নামক ক্ষুদ্র গিরিরাজ্য এই সময় একদল হূণের করতলগত হইয়াছিল। এই হূণদের প্রধান পুরুষ রোট্ট রাজ্যের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী ধারা দেবী নাম্নী এক কুমারীকে অঙ্কশায়িনী করিয়া নূতন রাজবংশের সূচনা করিয়াছিলেন।

প্রথম সংঘর্ষের বিস্ফুরিত অগ্ন্যুদ্‌গার নিভিয়া যাইবার পর বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে বিদ্বেষ-ভাব হ্রাস পাইতে লাগিল। উগ্র হূণ প্রকৃতি পারিপার্শ্বিক প্রভাবের ফলে শান্ত হইয়া আসিল। সর্বাপেক্ষা অধিক পরিবর্তন হইল স্বয়ং মহারাজ রোট্টের। ধারা দেবীর কোমল এবং সহিষ্ণু অন্তরে না জানি কোন অপরিমেয় শক্তি ছিল, তিনি এই দুর্ধর্ষ বর্বরকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিলেন। রোট্ট ক্রমশঃ বুদ্ধের করুণাবাণীর শরণাপন্ন হইলেন, তাঁহার নামের পশ্চাতে ধর্মাদিত্য উপাধি যোজিত হইল। কপোত-কূটের যে চৈত্য হূণদের প্রথম আগমনে ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছিল তাহা পুনর্গঠিত হইল।

রোট্ট ধর্মাধিত্যের রাজত্বকালের সপ্তমবর্ষে মহাদেবী ধারা একটি কন্যা প্রসব করিয়া চিরদিনের জন্য তাঁহার পরম সহিষ্ণু কোমল চক্ষুদুটি মুদিত করিলেন। কিন্তু রোট্ট আর নূতন মহাদেবী গ্রহণ করিলেন না—একটিমাত্র কন্যার নাম রাখিলেন রট্টা যশোধরা।

প্রথম হূণ অভিযানের পর শতাব্দীর একপাদ ক্ষয় হইয়া গেল। ওদিকে স্কন্দগুপ্ত পিতার মৃত্যুর পর সম্রাট হইয়াছেন। সাম্রাজ্যের চতুঃসীমা ঘিরিয়া বিদ্রোহ এবং অশান্তির আগুন জ্বলিতেছে; ধীরে ধীরে মগধকে ...য়া বহ্নিচক্র অগ্রসর হইতেছে। রাজ্যের অভ্যন্তরেও পুষ্য-...গোপনে মাৎস্যন্যায় ও চক্রান্তের বিষ ছড়াইতেছে। এই বিষ-...া স্কন্দ ক্লান্তিহীন নিদ্রাহীনভাবে যুদ্ধ করিয়া ফিরিতেছেন। ...ল বাহিনী কখনও লৌহিত্যের উপকূলে উপস্থিত হইয়া ...ন্তরে আতঙ্ক সঞ্চার করিতেছে, আবার পরদণ্ডেই সেতুবন্ধ ...া করিয়া শান্তি-সেতু বন্ধনের প্রয়াস পাইতেছে। বর্ষান্তে ...হার মহাস্থানীয়ে পদার্পণ করিবার অবকাশ পান না। ...টলিপুত্রে থাকিয়া যথাসাধ্য রাজকার্য চালাইতেছেন। ...ব্যাপী এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে রাজকার্য যে সুচারুরূপে চলিতে-

ছিল না তাহা বলা বাহুল্য। ভূমিকম্পে যখন মাথার উপর গৃহ ভাঙিয়া পড়িতেছে তখন গৃহকোণে রক্ষিত ক্ষুদ্র তৈজস কেহ লক্ষ্য করে না। তুচ্ছ বিটঙ্ক রাজ্যের কথা পাটলিপুত্রের সকলে ভুলিয়া গিয়াছিল; পঁচিশ বৎসরের মধ্যে কেহ তাহার খোঁজ লয় নাই।

রাজ্যের প্রাচীন পুস্তপাল মহাশয়ের মৃত্যু হওয়াতে এক নবীন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নবীনতার উদ্যমে তিনি একদিন অক্ষপটল-গৃহের পুরাতন নিবন্ধ পুস্তকাদি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বিটঙ্ক রাজ্যের নাম আবিষ্কার করিলেন। পঁচিশ বৎসর এই রাজ্য হইতে রাজস্ব আসে নাই। রাজ্যটা গেল কোথায়?

বহু নথিপত্র অনুসন্ধানের পর প্রকৃত তথ্য জানা গেল। চিন্তান্বিত নবীন পুস্তপাল মহাশয় দুঃসংবাদটা মহামন্ত্রীর কানে তুলিলেন।

স্কন্দ তখন পাটলিপুত্রে উপস্থিত। সুদূর কেবল দেশে যুদ্ধ করিতে করিতে একটা গুরুতর দুর্যোগের জনশ্রুতি শুনিয়া তিনি ত্বরিতে রাজধানী ফিরিয়াছেন। আবার নাকি হূণ আসিতেছে; লক্ষ লক্ষ শ্বেত হূণ বক্ষু নদী পার হইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। দুইজন চৈনিক শ্রমণ এই সংবাদ লইয়া কপিশায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেখান হইতে রাজদূত দিবারাত্র অশ্বচালনা করিয়া স্কন্দের নিকট বার্তা আনিয়াছে। কেবল যুদ্ধের ভার কয়েকজন প্রাচীন সেনাপতির উপর অর্পণ করিয়া স্কন্দ পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্তন করিযাছেন।

মহামন্ত্রী বিটঙ্ক রাজ্যের সংবাদ লইয়া রাজসকাশে উপস্থিত হইলেন,—'একটা বড় ভুল হইয়াছে। বিটঙ্ক নামক পঞ্চনদ প্রদেশের একটা রাজ্য আমাদের হিসাব হইতে হারাইয়া গিয়াছিল। দেখা যাইতেছে হূণেরা সেটা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। পঁচিশ বৎসর তাহারা রাজস্ব দেয় নাই।'

স্কন্দ তখন প্রাসাদের এক বিশ্রাম কক্ষে একাকী ছিলেন, মন্ত্রী

কুট্টিমের উপর বসিয়া অক্ষবাটের সম্মুখে পাষ্টি ফেলিতেছিলেন ; মন্ত্রীর কথায় স্বপ্নাতুর চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন। স্কন্দের বয়ঃক্রম এই সময় প্রায় পঞ্চাশ বৎসর, কিন্তু বলদৃপ্ত দেহে কোথাও জরার চিহ্নমাত্র নাই ; রমণীর ন্যায় কোমল চক্ষু দুটি যেন সর্বদাই স্বপ্ন দেখিতেছে। তাঁহার সুঠাম দেহ ও লাবণ্যপূর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া তাঁহাকে পরাক্রান্ত যোদ্ধা বলিয়া মনে হয় না, কবি ও ভাবুক বলিয়া ভ্রম হয়।

স্কন্দ দুই হাতে পাষ্টি ঘষিতে ঘষিতে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—'পাশা বলিতেছে এবার হূণকে তাড়াইতে পারিব না। তিনবার পাশা ফেলিলাম, তিনবারই পাশা ঐ কথা বলিল। গুপ্ত সাম্রাজ্য টলিতেছে, ভাঙিয়া পড়িতে আর বিলম্ব নাই।'—তারপর চকিতে সচেতন হইয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন—'আসন গ্রহণ করুন আর্য।'

মহাসচিব পৃথিবীসেন রাজার সম্মুখস্থ আসনে বসিলেন। অশীতিপর বৃদ্ধ, শুষ্ক দেহ বংশযষ্টির ন্যায় ঋজু ও গ্রন্থিযুক্ত ; ইনি একাধারে এই বৃহৎ রাজ্যের মহাসচিব ও মহাবলাধিকৃত ; স্কন্দের পিতা কুমারগুপ্তের সময় হইতে অনন্যমনে রাজ্যের সেবা করিয়া আসিতেছেন।

পৃথিবীসেন নীরসকণ্ঠে বলিলেন—'কবি কালিদাস একদিন আমাদের বলিয়াছিলেন—পাশার ভবিষ্যদ্বাণী, মদ্যপের প্রতিজ্ঞা ও শত্রুর হাসি যাহারা বিশ্বাস করে তাহারা বিচারমূঢ়।—হায় কালিদাস!' দীর্ঘশ্বাস মোচন-পূর্বক স্বর্গত কবির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া মন্ত্রী কহিলেন—'এখন এই বিটঙ্ক রাজ্যটা লইয়া কি করা যায়?'

ঈষৎ হাসিয়া স্কন্দ বলিলেন—'রাজ্যটা হারাইয়া গিয়াছিল? বিচিত্র নয়। কেরল যুদ্ধে আমার অঙ্গুরীয় হইতে একটি নীলকান্ত মণি কখন খসিয়া গিয়াছিল জানিতে পারি নাই। আজ প্রথম লক্ষ্য করিলাম। এই দেখুন।' বলিয়া অঙ্গুরীয় দেখাইলেন।

অতঃপর রাজা ও মন্ত্রী মিলিয়া দীর্ঘকাল মন্ত্রণা করিলেন। বিটঙ্ক

রাজ্য অবশ্য তাঁহাদের চিন্তার অতি ক্ষুদ্রাংশেই অধিকার করিল। অবশেষে স্থির হইল যে হূণ যখন আবার আসিতেছে তখন চতুরঙ্গ বাহিনী লইয়া স্কন্দ তাহাদের আগম-পথ রোধ করিবার জন্য এক মাসের মধ্যে পুরুষপুর যাত্রা করিবেন। উপরন্তু পঞ্চনদ প্রদেশে যত সামন্ত রাজা আছেন সকলের নিকট অচিরাৎ দূত প্রেরিত হইবে, যাহাতে এই সম্মিলিত সামন্তচক্র হূণদের বিরুদ্ধে ব্যূহরচনা করিয়া স্বরাজ্য রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকেন। বিটঙ্ক রাজ্যেও মগধের দূত যাইবে; তত্রত্য হূণ রাজাকে মগধের আনুগত্য স্বীকার করিবার আদেশ প্রেরিত হইবে। হূণ যদি স্বীকৃত না হয় তখন স্কন্দ তথায় উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবেন।

সচিব রাজ সন্নিধান হইতে বিদায় লইবার কিয়ৎকাল পরে বিদূষক পিপ্পলী মিশ্র আসিয়া দেখা দিলেন। অতি স্থূলকায় ব্রাহ্মণ, হস্তে একটি বৃহৎ কুষ্মাণ্ড। রাজা দেখিয়া বলিলেন—'পিপুল, একি! কুষ্মাণ্ড কেন?'

কুষ্মাণ্ড মহারাজের পদপ্রান্তে রাখিয়া বিদূষক মন্ত্রীর পরিত্যক্ত আসনে বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন—'মহারাজ, রিক্তপাণি হইয়া রাজ সমীপে আসিতে নাই, ইহাই শিষ্ট নীতি।'

রাজা বলিলেন—'ঠিকই হইয়াছে, তোমার বুদ্ধি ও কলেবর দুই-ই কুষ্মাণ্ডবৎ। এটি কোথায় সংগ্রহ করিলে?'

পিপ্পলী বলিলেন—'চালে ফলিয়াছিল। ব্রাহ্মণীকে অনেক স্তোক দিয়া বয়স্যের জন্য আনিয়াছি।'

'ব্রাহ্মণীকে কী স্তোক দিয়াছ?'

'বয়স্য, ব্রাহ্মণীর একটি অকাল কুষ্মাণ্ড ভ্রাতুষ্পুত্র আছে, তাহার বড়ই দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা। এখন মহারাজ যদি তাহাকে কোনও দূর দেশে দূতরূপে প্রেরণ করেন তবেই তাহার সাধ পূর্ণ হয়। আমি মহারাজের নিকট নিবেদন করিব এই স্তোক দিয়া গৃহিণীর কুষ্মাণ্ডটি হস্তগত করিয়াছি।'

রাজা সহাস্যে বলিলেন—'ধন্য পিপুল, তোমার বয়স্য-প্রীতি অতুলনীয়। তাহাই হইবে; তোমার ব্রাহ্মণীর ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেশ ভ্রমণে পাঠাইব। এখন এই কুষ্মাণ্ড রন্ধনশালায় প্রেরণ কর।'

কুষ্মাণ্ড স্থানান্তরিত হইলে স্কন্দ বলিলেন—'পিপুল, এস পাশা খেলি। আর একবার ভাগ্য পরীক্ষা করিব। তুমি যদি আমাকে পরাজিত করিতে পার, বুঝিব নিয়তির বিধান অলঙ্ঘনীয়।'

পিপ্পলী মিশ্র বলিলেন—'বয়স্য, পরাজিত করিতে পারি বা না পারি, নিয়তির বিধান চিরদিনই অলঙ্ঘনীয়। কারণ নিয়তি স্ত্রীজাতি।'

'দেখা যাক' বলিয়া স্কন্দ পাশা ফেলিলেন।

ইহা আমাদের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইবার প্রায় তিন মাস পূর্বের ঘটনা।

* * * *

অশ্বচোর চিত্রক যে বনের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়, প্রায় ছয় ক্রোশ ভূমির উপর প্রসারিত। বড় বড় গাছ ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া ঊর্ধ্বে মাথা তুলিয়াছে, তাহাদের শাখায় শাখায় জড়াজড়ি, নিম্নে রবিকরবিদ্ধ ছায়ান্ধকার। বনভূমি সর্বত্র সমতল নয়, স্থানে স্থানে উচ্চ হইয়া রুক্ষ উপলাকীর্ণ অঙ্গ প্রকট করিতেছে। কোথাও তরু পরিবেষ্টিত শষ্পাচ্ছাদিত উন্মুক্ত স্থান; কোথাও বা কঠিন রসহীন মৃত্তিকার উপর শুষ্ক কণ্টক গুল্ম। ক্বচিৎ দুই একটি ক্ষীণধারা প্রস্রবণ। এই বনে মৃগ শূকর শশক ময়ূর নানাবিধ শিকার আছে। প্রধান নগরীর উপকণ্ঠে রাজন্যবর্গের মৃগয়ার জন্য এইরূপ ক্রীড়া কানন সযত্নে রক্ষা করিবার রীতি ছিল।

এই বনের মধ্যে প্রায় তিন ক্রোশ পথ তীর বেগে ঘোড়া ছুটাইবার পর চিত্রক বল্গার ইঙ্গিতে অশ্বের গতি হ্রাস করিল। বহুদিন চিত্রক ঘোড়ায় চড়ে নাই, তাই ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া বায়ুর খর প্রবাহে তাহার

রক্তে গতির হর্ষোন্মাদনা জাগিয়াছিল। সে সহসা মস্তক উৎক্ষিপ্ত করিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু পরক্ষণেই সে থামিয়া গেল; দূর হইতে যেন মনুষ্য কণ্ঠের আহ্বান আসিল। অশ্ব একটি নিষ্পাদপ মুক্ত স্থানের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছিল, চকিতে তাহার গতি রোধ করিয়া চিত্রক চারিদিকে চাহিল। দেখিল, মুক্ত ভূমির কিনারায় এক বৃহৎ মধুক বৃক্ষতলে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পাশে একটি ঘোটক।

এতক্ষণ এই বনে একটি মানুষের সঙ্গেও চিত্রকের সাক্ষাৎ হয় নাই, সে সন্দিগ্ধচক্ষে এই ব্যক্তিকে নিরীক্ষণ করিল। দূর হইতে ভাল দেখা গেল না, তবু বেশভূষা হইতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। চিত্রক চক্ষুর উপর হস্তাচ্ছাদন দিয়া ভাল করিয়া দেখিল, লোকটি যেই হোক সে একাকী, কাছাকাছি অন্য কেহ নাই। তথাপি চিত্রক ইতস্ততঃ করিল; ভাবিল, পলায়ন করি। কিন্তু ঐ ব্যক্তির সঙ্গেও অশ্ব রহিয়াছে, পলাইলে পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারে। এরূপক্ষেত্রে কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া চিত্রক ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া রহিল।

এইবার অন্য ব্যক্তি অশ্বের বল্গা ধরিয়া তরু মূল হইতে বাহির হইয়া আসিল। তখন চিত্রক দেখিল, অশ্বটি খঞ্জ, তিন পায়ে ভর দিয়া খোঁড়াইয়া চলিতেছে।

ব্যাপার বুঝিয়া চিত্রক অগ্রসর হইয়া গেল। অন্য ব্যক্তি তাহাকে আসিতে দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, মধুকবৃক্ষের নিকটে উভয়ে মুখোমুখি হইল। কিছুক্ষণ দুইজনে পরস্পর পর্যবেক্ষণ করিল।

চিত্রক দেখিল লোকটির দেহ মেদ-সুকুমার, মুখমণ্ডল গোলাকৃতি, চক্ষুও তদ্রূপ। এক যোড়া সুপুষ্ট গুম্ফ মুখের শোভা বর্ধন করিতেছে বটে, কিন্তু গুম্ফের সুচারু প্রসাধন আর নাই, নানা দুর্যোগের মধ্যে পড়িয়া বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে। মস্তকে রক্তবর্ণ উষ্ণীষ, পরিধানে হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র ও

অঙ্গাবরণ; উত্তরীয়টি তুষের ন্যায় উদর বেষ্টন করিয়া পাশে গ্রন্থিবদ্ধ। কটি হইতে একটি বৃহৎ তরবারি ঝুলিতেছে।

অপরপক্ষে সে ব্যক্তি দেখিল, মহামূল্য সজ্জায় অলঙ্কৃত একটি তেজস্বী অশ্ব, তাহার পৃষ্ঠে বসিয়া আছে এক দীনবেশী সৈনিক। অশ্ব ও অশ্বারোহীর বেশভূষা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহার ধারণা জন্মিল, অশ্বটি কোনও ধনীব্যক্তির সম্পত্তি এবং আরোহী এই অশ্বের রক্ষক।

সে বলিল—'বাপু, বলিতে পার তোমাদের এই বন্য দেশে কোথাও লোকালয় আছে কি না?'

চিত্রক বুঝিল লোকটি তাহারই মত এদেশে নবাগত। সে নিশ্চিন্ত হইয়া বলিল—'তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?'

লোকটি ঈষৎ রুষ্ট হইল। এই কিঙ্করটা তাহার সহিত সমকক্ষের মত কথা বলে! এ দেশের লোকগুলা কি একেবারেই গ্রাম্য, সম্মানার্হ বিশিষ্ট পুরুষ দেখিলে চিনিতে পারে না? সে গুম্ফ ফুলাইয়া বলিল—'কোথা হইতে আসিতেছি সে সংবাদে তোমার প্রয়োজন নাই। এই বন্য রাজ্যে প্রবেশ করিয়া অবধি কেবল পাহাড় পর্বতে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি; মানুষগুলাও এমন অসভ্য যে মাগধী অবহট্‌ঠ ভাষা পর্যন্ত ভাল করিয়া বুঝে না। সাতদিন ধরিয়া অত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এখনও রাজধানী কপোতকূটে পৌঁছিতে পারিলাম না। কাল রাত্রে এক গ্রামে গৃহস্থের কুটীরে আশ্রয় লইয়াছিলাম; প্রাতে উঠিয়া দাসীপুত্রটা কপোতকূটের সিধা পথ দেখাইয়া দিল। সেই অবধি পাঁচটা পাহাড় পার হইয়াছি, কিন্তু এখনও কপোতকূটের দেখা নাই। তারপর গণ্ডের উপর পিণ্ড, এই বনে প্রবেশ করিয়া ঘোড়াটা এক গর্তে পা দিল—' লোকটি সশব্দ নিশ্বাস ত্যাগ করিল—'ঘোড়ার পা ভাঙিয়াছে, সমস্তদিন পেটে অন্ন নাই; যদি গুরুতর রাজকার্য না থাকিত কোন্ কালে এই দেববর্জিত দেশ ছাড়িয়া যাইতাম।'

চিত্রক প্রশ্ন করিল—'তুমি কপোতকূটে যাইতে চাও? রাজকার্যে?'

লোকটি গম্ভীর ভাবে বলিল—'হাঁ, গুরুতর রাজকার্যে। আমার নাম শশিশেখর শর্মা, মগধের রাজ-বয়স্য আমার—, কিন্তু সে যাক। কপোতকূট কি এখান হইতে অনেকদূর?'

পাঠক বুঝিয়াছেন, শশিশেখর শর্মা আর কেহ নয়, বিদূষক পিপ্পলী মিশ্রের ব্রাহ্মণীর ভ্রাতুষ্পুত্র। তাহার প্রশ্নের উত্তরে চিত্রক বলিল—'কপোতকূট অনেকদূর, আজ রাত্রে পৌঁছিতে পারিবে না। ঘোড়া থাকিলে পৌঁছিতে পারিতে।'

মগধের রাজদূত চিত্রকের ঘোড়ার পানে লুব্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিতেছিল, বলিল—'এটি কি তোমার ঘোড়া?'

'হাঁ।'

শশিশেখর পূরা বিশ্বাস করিল না, কিন্তু অবিশ্বাস করিয়াও কোনও লাভ নাই। সে উৎসুক স্বরে বলিল—'তোমার ঘোড়া বিক্রয় করিবে?'

চিত্রক কুঞ্চিত নেত্রে তাহার পানে চাহিল—'কত মূল্য দিবে?'

শশিশেখর অশ্বের প্রতি তাকাইয়া গুম্ফের একপ্রান্ত অঙ্গুলি দ্বারা আকর্ষণ করিতে করিতে বিবেচনা করিল, তারপর বলিল—'সসজ্জ অশ্বের জন্য পাঁচ কার্যাপণ দিব।'

চিত্রক ভাবিল, পরের দ্রব্য পরকে বিক্রয় করিয়া যদি পাঁচ কার্যাপণ পাওয়া যায় মন্দ কি? অপহৃত অশ্ব নিজের কাছে রাখা নিরাপদ নয়, ধরা পড়িবার ভয় আছে। কিন্তু চিত্রক দেখিল, রাজদূত মহাশয়ের প্রয়োজনের গুরুত্ব বড় বেশী; প্রয়োজনের অনুপাতে পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। চিত্রক অবজ্ঞা ভরে হাসিয়া বলিল—'কার্যাপণ! এই অশ্বের সজ্জার মূল্যই পাঁচ দীনার। তোমাদের মগধ দেশে সম্ভবত তোমরা গর্দভে আরোহণ করিয়া থাক, তাই অশ্বের মূল্য জান না।' বলিয়া অশ্বের মুখ ফিরাইয়া প্রস্থানোদ্যত হইল।

শশিশেখর মনে মনে বড়ই ক্রুদ্ধ হইল; কিন্তু এদিকে অশ্বারোহী চলিয়া যায়। শশিশেখর ক্রোধ গলাধঃকরণ করিয়া ডাকিল—'শুন শুন। তুমি আমার অসহায় অবস্থা দেখিয়া অনুচিত মূল্য দাবী করিতেছ। পাটলিপুত্রে এরূপ করিলে দুই শত পণ দণ্ড দিতে হইত। কিন্তু এই অসভ্য বন্য দেশে—, যাক, পাঁচ দীনারই দিব।'

চিত্রক ফিরিয়া বলিল—'পাঁচ দীনার তো সজ্জার মূল্য। অশ্বটি কি বিনা শুল্কে চাও?'

শশিশেখর বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল। সে অর্থ সম্বন্ধে বিলক্ষণ হিসাবী, অকারণে অর্থ-ব্যয় করিতে তাহার বড়ই অরুচি। অথচ এই অর্থ-গৃধ্নু রাক্ষসটা সুবিধা পাইয়া তাহার রক্ত শোষণ করিতে চায়। সে অস্থির হইয়া বলিল—'আবার অশ্বের মূল্য। পাঁচটি দীনারেও যথেষ্ট হইল না? এটা কি দস্যুর রাজ্য?'

চিত্রক হাসিল—'দস্যুর রাজ্যই বটে।—ভাবিয়া দেখ অশ্বের জন্য আরও পাঁচটি দীনার দিতে পারিবে? না পার—চলিলাম।'

আবার অশ্বারোহী চলিয়া যায়। তখন শশিশেখর বিষণ্ণ স্বরে বলিল—'আমি—আমি ছয়টি দীনার এবং এই অশ্বটি তোমাকে দিব, পরিবর্তে তোমার ঘোড়া আমাকে দাও। ইহার অধিক আর আমি দিতে পারিব না।'

'তোমার অশ্ব লইয়া আমি কি করিব? মৃত গর্দভের মূল্য কি?'

'মৃত গর্দভ! উহার সামান্য আঘাত লাগিয়াছে মাত্র, দুই দিনেই সারিয়া যাইবে। তখন উহাকে অনেক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবে।'

চিত্রক দেখিল, মগধের দূত আর বেশী উঠিবে না। তাহার ঘোড়াটি নিতান্ত মন্দ নয়, পায়ের আঘাত অল্প শুশ্রূষাতেই আরোগ্য হইবে। চিত্রকের একটি ঘোড়া থাকিলে ভাল হয়, যোদ্ধার অশ্বই সম্পদ। সে সম্মত হইল।

তখন শশিশেখর কটি হইতে উত্তরীয় খুলিয়া তদভ্যন্তর হইতে একটি

থলি বাহির করিল। থলিটি বেশ পরিপুষ্ট। শশিশেখর সঞ্চয়ী ব্যক্তি, বিদেশ যাত্রার পূর্বে নানাবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু এই থলিতে ভরিয়া লইয়াছিল। রাজকোষ হইতে প্রাপ্ত স্বর্ণরৌপ্য তো ছিলই, উপরন্তু কড়ি ছিল, প্রসাধনের জন্য, চন্দন তিলক ছিল, কঙ্কতিকা ছিল, মুখ-শুদ্ধির জন্য এলা লবঙ্গ হরীতকী ছিল—আরও কত কি! আড চক্ষে চিত্রকের পানে চাহিয়া শশিশেখর থলির মুখ খুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

থলি হইতে দীনার বাহির করিতে গিয়া অসাবধানে কয়েকটি শলাকার ন্যায় ক্ষুদ্র বস্তু মাটিতে পড়িল। চিত্রক সেই দিকেই তাকাইয়া ছিল, এখন দ্রুত অশ্ব হইতে নামিয়া সেগুলি কুড়াইয়া লইল। হাতে তুলিয়া লইয়া দেখিল, গজদন্তের পাষ্টি।

দ্যূতক্রীড়ার দুর্নিবার মোহ আছে। চিত্রক উৎসুক বিস্ময়ে বলিল—'দূত মহাশয়, আপনার থলিতে পাশা খেলার পাষ্টি দেখিতেছি!'

শশিশেখর কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল—'অক্ষক্রীডা চতুঃষষ্টি কলার অঙ্গ, পাটলিপুত্রের সজ্জন নাগরিক মাত্রেই পাশা খেলিয়া থাকেন। স্বয়ং পরম ভট্টারক—'

চিত্রক বলিল—'তুমি আমার সহিত পাশা খেলিবে? ঘোড়া বাজি রহিল, যদি জিতিতে পার, বিনা মূল্যে আমার ঘোড়া পাইবে; আর যদি আমি জিতি, তোমার ঐ খঞ্জ অশ্ব লইব।'

মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া শশিশেখর দেখিল, হারিলে তাহার কোনও ক্ষতি নাই, জিতিলে বিশেষ লাভ—ছয়টি স্বর্ণ দীনার বাঁচিয়া যাইবে। সে বলিল—'উত্তম, খেলিব। আমি বর্ণশ্রেষ্ঠ হইলেও দ্বন্দ্বযুদ্ধ বা দ্যূতক্রীড়ায় কেহ আহ্বান করিলে পশ্চাৎপদ হই না।'

তখন দুইজনে, অশ্ব ছাড়িয়া দিয়া, বৃক্ষতলে তৃণের উপর বসিয়া খেলিতে আরম্ভ করিল। অল্পকাল মধ্যেই উভয়ে খেলায় মাতিয়া উঠিল, ক্ষুধা তৃষ্ণা আর রহিল না।

কিন্তু উত্তেজনা মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে। খেলা যখন শেষ হইল তখন দেখা গেল শশিশেখরের অশ্বটীর স্বত্বাধিকার হস্তান্তরিত হইয়াছে।

ক্ষোভে গুম্ফের প্রান্ত টানিতে টানিতে শশিশেখর বলিল—'তুমি নিপুণ ক্রীড়ক বটে। ভাগ্য বলে আমাকে পরাজিত করিয়াছ। আবার খেলিবে?'

চিত্রক বলিল—'খেলিব। এবার কি পণ রাখিবে?'

'এবার তরবারি পণ।' বলিয়া শশিশেখর কটি হইতে তরবারি খুলিয়া পাশে রাখিল।

চিত্রক বলিল—'ভাল, আমি দুটি অশ্বই পণ রাখিলাম।'

শশিশেখর হৃষ্ট হইয়া খেলিতে বসিল। কিন্তু এবারও ভাগ্যলক্ষ্মী তাহার প্রতি বিমুখ হইলেন। তরবারি তুলিয়া লইয়া চিত্রক বলিল—'আর খেলিবে?'

যে পরাজিত হয় তাহার খেলিবার ঝোঁক আরও বাড়িয়া যায়; কৃপণও তখন দুঃসাহসী হইয়া উঠে। শশিশেখর আরক্ত নেত্রে চাহিয়া বলিল—'খেলিব। তুমি দুইবার জিতিয়াছ বলিয়া কি বার বার জিতিবে?'

'উত্তম। আমি দুইটি অশ্ব ও তরবারি পণ রাখিলাম। তোমার পণ?'

'আমার পণ—' শশিশেখর সহসা থমকিয়া গেল; তাহার মস্তিষ্ক কোটরে ঈষৎ সুবুদ্ধির উদয় হইল। ঘোড়া ও তরবারি তো গিয়াছে, এইভাবে যদি সব যায়?

তাহাকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া চিত্রক ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—'ভয় পাইতেছ?'

সুবুদ্ধিটুকু ভাসিয়া গেল। শশিশেখর ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল—'ভয়! কোন অর্বাচীন এমন কথা বলে? আমি যথাসর্বস্ব পণ রাখিয়া খেলিতে পারি। তুমি খেলিবে?'

'আপত্তি নাই। কিন্তু আপাততঃ ঐ অঙ্গুরীয় পণ রাখিতে পার।'

শশিশেখর নিজ অঙ্গুরীয়ের পানে চাহিল। মগধের রাজকীয় মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরীয়, ইহাই বিটঙ্ক রাজসভায় তাহার প্রবেশপত্র। কিন্তু শশিশেখর তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। সে অঙ্গুরীয় খুলিয়া সবেগে ভূমির উপর স্থাপন করিয়া বলিল—'তাহাই হোক। এস—এবার দেখিব।'

আবার খেলা আরম্ভ হইল। খেলার ফল কিন্তু ভিন্নরূপ হইল না। খেলার শেষে চিত্রক অঙ্গুরীয়টি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া নিজ তর্জনীতে পরিধান করিল, বলিল—'দূত মহাশয়, এবার আমি চলিলাম। আজ সারাদিন আহার হয় নাই, ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। আমাকেও অনেক দূর যাইতে হইবে।'

এতক্ষণে শশিশেখর একেবারে ফাটিয়া পড়িল; লাফাইয়া উঠিয়া গর্জন করিল—'তুই কিতব! হস্তলাঘব করিয়া আমার পণ জিতিয়া লইয়াছিস!'

চিত্রকও বিদ্যুতের মত উঠিয়া দাঁড়াইল। কিতব শব্দটা অক্ষক্রীড়কের পক্ষে অত্যন্ত দূষণীয়। তাহার ললাটের তিলক-চিহ্ন আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল।

কিন্তু পরক্ষণেই তাহার ক্ষিপ্র রোষ অন্তর্হিত হইল। শশিশেখরের মেদ-মসৃণ দেহের উগ্র ভঙ্গিমা দেখিয়া ক্রুদ্ধ শজারুর শল্লকাবৃত বিক্রমের চিত্র স্মরণ হইয়া গেল। সে তাহার স্ফীত-গুম্ফ মুখের পানে চাহিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, বলিল—'পাষ্টি তোমার, আমি হস্তলাঘব করিলাম কিরূপে?'

কথাটা সঙ্গত। যাহার পাশা সে পাষ্টির মধ্যে ধাতু প্রবিষ্ট করাইয়া কৈতব করিতে পারে। শকুনি ও পুষ্কর তাহাই করিয়াছিল। কিন্তু শশিশেখরের তাহা বুঝিবার মত মনের অবস্থা ছিল না, সে চীৎকার করিতে লাগিল—'তুই ধূর্ত কিতব, কিতবের অসাধ্য কাজ নাই—'

চিত্রক বলিল—'ও শব্দ আর ব্যবহার করিও না, বিপদ ঘটিবে।

ভাগ্যদেবী তোমার প্রতি বিমুখ তাই তুমি হারিয়াছ। শুন, আর একবার তোমাকে সুযোগ দিতেছি। তুমি এখনি বলিয়াছ যে সর্বস্ব পণ রাখিয়া খেলিতে পার। এস, সর্বস্ব পণ করিয়া খেল, আমিও সর্বস্ব পণ করিতেছি। যদি জিতিতে পার, যাহা কিছু হারিয়াছ সমস্তই ফিরিয়া পাইবে, আমার ঘোড়াও পাইবে। সম্মত আছ ?'

শশিশেখর কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া চিন্তা করিল। তাহার সর্বস্বই গিয়াছে, আছে কেবল থলিটি। থলিতে গুটিকয় স্বর্ণ রৌপ্যের মুদ্রা আছে সত্য, কিন্তু এই নির্জন অরণ্যে সেগুলি কোন্ কাজে লাগিবে ? ঘোড়া ফিরিয়া পাইলে আশা আছে লোকালয়ে পৌঁছিতে পারিবে, নচেৎ বনে রাত্রিবাস সুনিশ্চিত। বনে নিশ্চয় ব্যাঘ্র তরক্ষু আছে—! আসন্ন রাত্রির কথা ভাবিয়া সহসা তাহার হৃৎকম্প হইল। ইহা যে মৃগয়া কানন তাহা সে জানিত না।

শশিশেখর আর দ্বিধা করিল না, আবার খেলিতে বসিল। কিন্তু ভাগ্যদেবী সত্যই তাহার উপর রুষ্ট হইয়াছিলেন, সে জিতিতে পারিল না। ক্ষোভে হতাশায় পাশ্টি দূরে নিক্ষেপ করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

চিত্রক সযত্নে পাশ্টিগুলি তুলিয়া লইয়া বলিল—'এ পাশ্টি এখন আমার। মনে রাখিও তুমি সর্বস্ব হারিয়াছ।'

শশিশেখর উন্মত্ত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—'তুই চোর তস্কর, কৈতব করিয়া আমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছিস্।'

চিত্রকের চক্ষু অসি ফলকের ন্যায় তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল—'আর যাহা বল আপত্তি নাই, কিন্তু কিতব শব্দ আর উচ্চারণ করিও না। একবার নিষেধ করিয়াছি।'

উন্মত্ত শশিশেখর গর্জন করিয়া বলিল—'কিতব! কিতব! কিতব! সহস্রবার বলিব। আমার হাতে যদি তরবারি থাকিত—'

চিত্রকের নাসা স্ফুরিত হইয়া উঠিল, সে শশিশেখরের তরবারি তাহার

দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিল—'এই নাও তোমার তরবারি। কি করিবে? যুদ্ধ?'

শশিশেখর তরবারি তুলিয়া লইল। সে বোধ হয় কিছু অসিবিদ্যা জানিত, কিন্তু বর্তমান মানসিক অবস্থায় তাহাও বিস্মরণ হইয়াছিল। সে তরবারি ঊর্ধ্বে তুলিয়া চিত্রককে আক্রমণ করিল।

দুইবার অসিতে অসিতে ঠোকাঠুকি হইল, তারপর শশিশেখরের অস্ত্র ছিট্‌কাইয়া দূরে গিয়া পড়িল।

চিত্রক বলিল—'ভাবিয়াছিলাম তোমাকে দয়া করিব, সর্বস্ব লইব না। কিন্তু তুমি অপাত্র। থলি দাও।'

ক্রন্দনোন্মুখ শশিশেখর ফুলিতে ফুলিতে থলি ফেলিয়া দিল।

'এবার তোমার উষ্ণীষ বস্ত্র ও অঙ্গাবরণ দাও।'

শশিশেখর হতভম্ব হইয়া গেল।

'অ্যাঁ—তবে কি আমি উলঙ্গ থাকিব?'

চিত্রক হাসিল। 'সে তুমি জান। আমার সম্পত্তি আমি লইব।'

'তুই চোর দস্যু তস্কর।'

'শাস্ত্র দাও—নচেৎ কাড়িয়া লইব।'

হতভাগ্য শশিশেখর তখন নিরুপায় হইয়া মধুক বৃক্ষের অন্তরালে গেল, বস্ত্রাদি খুলিয়া চিত্রকের দিকে ফেলিয়া দিল। নিষ্ফল ক্রোধের তপ্ত অশ্রুজল তাহার গুম্ফ ভিজাইয়া দিতে লাগিল।

নিজের সমস্ত সম্পত্তি লইয়া চিত্রক অশ্বে চড়িয়া বসিল। শশিশেখরের ঘোড়ার পৃষ্ঠে তরবারির কোষ দ্বারা সবেগে আঘাত করিতেই সে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পলায়ন করিল। চিত্রক তখন বৃক্ষের কাণ্ড লক্ষ্য করিয়া বলিল—'তোমাকে তবু একটা দয়া করিলাম, তোমার তরবারিটা ফেলিয়া গেলাম। যদি নকুল অথবা শশক তাড়া করে, আত্মরক্ষা করিতে পারিবে।'

বেলা তখন পড়িয়া আসতেছে, সূর্য তরুচূড়া স্পর্শ করিয়াছে। দিক্-নির্ণয় করিয়া লইয়া চিত্রক সূর্যকে দক্ষিণে রাখিয়া দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইল।

শশিশেখর বনের মধ্যেই পড়িয়া রহিল। তাহার বর্তমান অবস্থায় তাহাকে আর পাঠক পাঠিকার সম্মুখে উপস্থিত করা উচিত হইবে না।

* * * *

প্রাকার-বেষ্টিত কপোতকূট নগরের উত্তর তোরণের নিকট চিত্রক যখন পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা ঘনীভূত হইয়াছে। তোরণের অনতিদূর পর্যন্ত গিয়া বন শেষ হইয়াছে; এইখানে আসিয়া চিত্রক অশ্ব ছাড়িয়া দিল। তারপর শশিশেখরের বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া, মস্তকে লৌহ-জালিকের উপর উষ্ণীষ বাঁধিয়া স্বচ্ছন্দ অনুদ্বেগ পদক্ষেপে নগরে প্রবেশ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রাসাদ শিখরে

আকাশে প্রায় পূর্ণাবয়ব চন্দ্র। চন্দ্রালোকে কপোতকূট নগর অতি সুন্দর দেখাইতেছিল।

বিটঙ্ক রাজ্যটি পারিপার্শ্বিক ভূখণ্ড হইতে উচ্চে মালভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। মালভূমিও সমতল নয়, তরঙ্গায়িত হইয়া প্রান্ত হইতে যতই কেন্দ্রের দিকে গিয়াছে ততই উচ্চ হইয়াছে। কেন্দ্রস্থলে কপোতকূট নগর। রাজ্যের সর্বোচ্চ শিখরের উপর অধিষ্ঠিত বলিয়াই বোধহয় ইহার নাম কপোতকূট।

নগরটি রাজ্যের ক্ষুদ্র সংস্করণ; কোথাও সমভূমি নয়, চারিদিকে উচ্চ

প্রাকারের দৃঢ় পরিবেষ্টনী ; তন্মধ্যে মহেশ্বরের জটাজালবদ্ধ চন্দ্রকলার ন্যায় অপূর্ব সুন্দর নগর শোভা পাইতেছে।

বসন্ত রজনীতে চন্দ্রবাষ্পাচ্ছন্ন দীপালোকিত নগরের সৌন্দর্য শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পথগুলি আঁকাবাঁকা, দুই পাশে পাষাণ নির্মিত হর্ম্য। মাঝে মাঝে প্রমোদকানন ; পথের সন্ধিস্থলে জলাধারের মধ্যবর্তী গোমুখ হইতে প্রস্রবণ ঝরিয়া পড়িতেছে। উল্কা-ধারিণী পাষাণ বনদেবীর মূর্তি রাজপথে আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। বহু নাগরিক-নাগরিকা বিচিত্র বেশ প্রসাধনে সজ্জিত হইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতেছে, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না নিষিক্ত বায়ু সেবন করিয়া দিবসের তাপ-গ্লানি দূর করিতেছে। প্রমোদ বন হইতে কখনও বংশীরব উঠিতেছে ; কোথাও লতা নিকুঞ্জ হইতে মৃদু জল্পিতপ্রণয় কূজন ও অস্ফুট কলহাস্য উত্থিত হইতেছে, কঙ্কণ মঞ্জীরের ঝঙ্কার কখনও কৌতুকে উল্লসিত হইয়া উঠিতেছে, কখনও আবেশে মদালস হইয়া পড়িতেছে। কপোতকূটে কপোত-মিথুনের অভাব নাই।

নগরীর একটি পথ দীপমালায় উজ্জ্বল। বিলাসিনী নাগরিকার ন্যায় রাত্রিকালেই এই পথের শোভা অধিক, কারণ প্রধানতঃ ইহা বিলাসের কেন্দ্র। পথের দুই পাশে অগণিত বিপণি, কোনও বিপণিতে কেবল সুরভিত তাম্বূল বিক্রয় হইতেছে, বিক্রেত্রী রক্তাধরা চঞ্চলাক্ষী যুবতী। ক্রেতার অপ্রতুল নাই, রূপশিখাকৃষ্ট নাগরিকগণ চারিদিকে ভিড় করিয়া আছে ; চপল পরিহাস, সরস ইঙ্গিত, লোল কটাক্ষের বিনিময় চলিতেছে। যে পসারিণী যত সুন্দরী ও রসিকা, তাহার পণ্য তত অধিক বিক্রয় হইতেছে।

বিপণির ফাঁকে ফাঁকে মদিরাগৃহ। পিপাসু নাগরিকগণ সেখানে গিয়া নিজ নিজ রুচি অনুসারে গৌড়ী মাধ্বী পান করিতেছে। আসবে যাহাদের রুচি নাই তাহারা কপিত্থ সুবাসিত তক্র বা যবাম্লরস সেবন করিয়া শরীর শীতল করিতেছে। মদিরাগৃহের অভ্যন্তরে বহু কক্ষ, কক্ষগুলি সুসজ্জিত,

তাহাতে আস্তরণের উপর বসিয়া ধনী বণিক-পুত্রগণ দ্যূতক্রীড়া করিতেছে। কোনও কক্ষে মৃদঙ্গ সপ্তস্বরা সহযোগে সঙ্গীতের চর্চা হইতেছে। মদিরাগৃহের কিঙ্করীগণ চষক ও ভৃঙ্গার হস্তে সকলকে আসব যোগাইতেছে।

নগর নারীদের গৃহদ্বারে পুষ্পমালা দুলিতেছে; অভ্যন্তর হইতে মৃদু রক্তাভ আলোকরশ্মি ও যন্ত্রের স্বপ্নমদির নিক্কণ পথচারীকে উন্মন করিয়া তুলিতেছে। পথে সুখান্বেষী নাগরিকের মন্থর যাতায়াত, কুসুমের মদমোহিত গন্ধ, প্রসাধন ও ভূষণাদির বৈচিত্র্য, ক্বচিৎ কৌতুক-বিগলিতা নারীর কণ্ঠ হইতে বিচ্ছুরিত হাস্য, ক্বচিৎ কলহের কর্কশ রূঢ়স্বর—এই সব মিলিয়া এক অপূর্ব সম্মোহন সৃষ্টি করিয়াছে।

বিলাস বিহ্বলতার আবর্ত হইতে দূরে নগরের আর একটি কেন্দ্র—রাজপুরী। পূর্বেই বলিয়াছি—নগর সর্বত্র সমভূমি নয়, কোথাও উচ্চ কোথাও নীচ। যে ভূমির উপর রাজপুরী অবস্থিত তাহা নগরীর মধ্যে সর্বোচ্চ, নগরীতে প্রবেশ করিয়া চক্ষু তুললেই সর্বাগ্রে রাজপুরীর ভীমকান্তি আয়তন চোখে পড়ে, মনে হয় কপোতকূট দুর্গের মধ্যস্থলে আর একটি দুর্গ সগর্বে মাথা তুলিয়া আছে।

প্রথমে প্রাকার বেষ্টন; স্থূল চতুষ্কোণ প্রস্তরে নির্মিত—প্রস্থে দ্বাদশ হস্ত, দৈর্ঘ্যে প্রায় অর্ধ ক্রোশ—বলয়ের ন্যায় চক্রাকারে পুরভূমিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। প্রাকারের অভ্যন্তরে সুড়ঙ্গ আছে; কিন্তু সে কথা পরে হইবে। নগরীর প্রধান পথ যেখানে আসিয়া প্রাকার স্পর্শ করিয়াছে সেইখানে উচ্চ তোরণদ্বার। ইহাই রাজপুরী হইতে আগম নিগমের একমাত্র পথ। শলাকা কণ্টকিত লৌহের বিশাল কবাট; দুই পাশে স্থূল বর্তুল তোরণ স্তম্ভ; তোরণ স্তম্ভের অভ্যন্তরে প্রতীহার গৃহ। শূলহস্ত প্রতীহার দিবারাত্র তোরণ পাহারা দিতেছে।

তোরণ অতিক্রম করিয়া সম্মুখেই সভাগৃহ। তাহার পশ্চাতে মন্ত্রগৃহ। অতঃপর দক্ষিণে বামে বহু বহু ভবন—কোষাগার আয়ুধগৃহ যন্ত্রভবন—

কাছাকাছি হইলেও প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র দণ্ডায়মান। মধ্যস্থলে রাজ অবরোধের মর্মরনির্মিত ত্রি-ভূমক প্রাসাদ—সাত কৌটার মধ্যস্থিত মৌক্তিক, সাতশত রাক্ষসীর বিনিদ্র সতর্কতা যেন নিরন্তর তাহাকে ঘিরিয়া আছে। দ্বারে দ্বারে যবনী প্রতীহারীর পাহারা।

এই ত্রিভূমক প্রাসাদের উন্মুক্ত ছাদে পুষ্পাকীর্ণ কোমল পক্ষ্মল আস্তরণের উপর অর্ধশয়ান হইয়া রাজকুমারী রট্টা যশোধরা প্রিয়সখী সুগোপার সহিত কথা কহিতেছিলেন। কথা এমন কিছু নয়, আকাশের দিকে চাহিয়া অলসকণ্ঠে দু'একটি তুচ্ছ উক্তি, তারপর নীরবতা, আবার দু'একটি তুচ্ছ কথা। এমনি ভাবে আলাপ চলিতেছিল। যেখানে মনের মধ্যে বিচ্ছেদ নাই, সেখানে অবিচ্ছেদ কথা বলার প্রয়োজন হয় না।

প্রপাপালিকা সুগোপার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় আছে। কুমারী রট্টা যশোধরাকেও তিনি দেখিয়াছেন, হয় তো চিনিতে পারেন নাই। যে কিশোর কার্তিকেয় বিদ্যুতের মত সুগোপার জলসত্রে দেখা দিয়াছিলেন, যাঁহার অশ্ব চুরি করিয়া চিত্রক পলায়ন করিয়াছিল, তিনি আর কেহ নহেন, মৃগয়াবেশধারিণী রাজনন্দিনী রট্টা। দুর্গ-দুহিতা পুরুষবেশে মৃগয়া করিতে ভালবাসিতেন।

কবি কালিদাস বলিয়াছেন, বল্কল পরিধান করিলে সুন্দরী তন্বীকে অধিক সুন্দর দেখায়। হয় তো দেখায়, আমরা কখনও পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। কিন্তু যোদ্ধবেশ ধারণ করিলে রূপসীর রূপ বর্ধিত হয় একথা স্বীকার করিতে পারিব না। ভাল দেখাইতে পারে, কিন্তু অধিক সুন্দর দেখায় না। আমরা বলিব, কুমারী রট্টার মত যিনি তন্বী ও সুন্দরী, যাঁহার বয়স আঠার বৎসর—তিনি অলকগুচ্ছ কুন্দকলি দ্বারা অনুবিদ্ধ করুন, লোধ্ররেণু দিয়া মুখের পাণ্ডুশ্রী আনয়ন করুন, চূড়াপাশে নব কুরুবক ধারণ করুন; কর্ণে শিরীষ পুষ্পের অবতংস দুলাইয়া দিন, হৃৎস্পন্দনের তালে যূথী-কঞ্চুক নৃত্য করিতে থাকুক, নীবিবন্ধে কর্ণিকার কাঞ্চী মূর্চ্ছিত হইয়া থাক—

লোভী পুরুষ তো দূরের কথা, অনসূয়া সখীরাও ফিরিয়া ফিরিয়া সে রূপ দেখিবে।

তেমনই, পুষ্পাভরণভূষিতা রট্টার পানে সখী সুগোপাও থাকিয়া থাকিয়া বিমুগ্ধ নেত্রে চাহিতেছিল। দুই সখীর মধ্যে গভীর ভালবাসা। রাজকন্যাও যখন সুগোপার পানে তাঁহার অলস নেত্র ফিরাইতেছিলেন, তখন তাঁহার হিমকরস্নিগ্ধ দৃষ্টি অকারণেই সখীকে প্রীতির রসে অভিষিক্ত করিয়া দিতেছিল। দুইজনে আশৈশব খেলার সাথী; যৌবনে এই প্রীতি আরও গাঢ় হইয়াছিল। সুগোপার স্বামী সংসার সবই ছিল, কিন্তু তাহার জীবন আবর্তিত হইত রট্টাকে কেন্দ্র করিয়া। আর, বিশাল রাজ অবরোধের মধ্যে একাকিনী কুমারী রট্টা—তিনিও এই বাল্য সখীকে একান্ত আপনার জানিয়া বুকে টানিয়া লইয়াছিলেন।

তবু, রাজকন্যার সহিত প্রপাপালিকার ভালবাসা, বিস্ময়কর মনে হইতে পারে। কিন্তু এতই কি বিস্ময়কর? রাজায় রাজায় কি প্রণয় হয়? রাজকুমারীর সহিত রাজকুমারীর প্রণয় হয়? হয় তো হয়, কিন্তু তাহা বড় দুর্লভ। যেখানে অবস্থার তারতম্য আছে সেইখানেই প্রকৃত ভালবাসা জন্মে। নির্ঝরের জল পর্বত শিখর হইতে গভীর খাদে ঝাঁপাইয়া পড়ে, উচ্চাভিলাষী ধূম নিম্ন হইতে ঊর্ধ্বে আকাশে উত্থিত হয়। ইহাই স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া রট্টার ধমনীতে হূণ রক্ত আভিজাত্যের প্রভেদ স্বীকার করিত না। হূণ বর্বর হোক, সে আভিজাত্যের উপাসক নয়, শক্তির উপাসক।

রট্টা একমুঠি মল্লিকা ফুল আস্তরণ হইতে তুলিয়া লইয়া আঘ্রাণ গ্রহণ করিলেন, তারপর চাঁদের দিকে চাহিয়া বলিলেন—'মধুঋতু তো শেষ হইতে চলিল; এবার ফুলও ফুরাইবে। সুগোপা, তখন তুই কি করিবি?'

রট্টার বাম কর্ণ হইতে শিরীষ পুষ্পের ঝুমকা খুলিয়া গিয়াছিল, সুগোপা

উঠিয়া সযত্নে সেটি পরাইয়া দিল। মুকুরের মত ললাট হইতে দু'একটি চূর্ণ কুন্তল সরাইয়া দিয়া বলিল—'ফুল যখন ফুরাইবে, তখন চন্দন দিয়া তোমাকে সাজাইব। চুলে স্নিগ্ধ স্নান-কষায় মাখিয়া কর্পূর সুবাসিত জলে ধারাযন্ত্রে তুমি স্নান করিবে, আমি তোমার মুখে চন্দনের তিলক, বুকে চন্দনের পত্রলেখা আঁকিয়া দিব; সিক্ত উশীরের পাখা দিয়া তোমাকে ব্যজন করিব। সখি, তবু কি তোমার দেহের তাপ জুড়াইবে না?' সুগোপার মুখে একটু চাপা হাসি।

হাসির গূঢ় ইঙ্গিত রট্টা বুঝিলেন, পুষ্পমুষ্টি সুগোপার গায় ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন—'তোর পাখার বাতাসে আমার দেহের তাপ জুড়াইবে কেন?'

সুগোপা বলিল—'যাঁহার পাখার বাতাসে অঙ্গ শীতল হইত তিনি তো আসিয়াছিলেন, তুমি যে হাসিয়াই তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলে।'

রট্টা ক্ষণকাল নীরব রহিলেন, তারপর হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—'সুগোপা, সত্য বল দেখি, গুর্জরের রাজকুমারের গলায় বরমালা দিলে তুই সুখী হইতিস?'

এইখানে পূর্বতন প্রসঙ্গ কিছু বলা প্রয়োজন।

ইদানীং মহারাজ রোট্ট ধর্মাদিত্য ঐহিক বিষয়ে কিছু অধিক অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজকার্যে তিনি বড় একটা হস্তক্ষেপ করিতেন না; কিন্তু কয়েক মাস পূর্বে একান্তমনে ধর্মচর্চা করিতে করিতে তিনি সহসা উদ্বিগ্ন হইয়া লক্ষ্য করিলেন যে তাঁহার কন্যার যৌবনকাল উপস্থিত হইয়াছে। এরূপ লক্ষ্য করিবার কারণ ঘটিয়াছিল।

রোট্ট যখন পঁচিশ বৎসর পূর্বে এই রাজ্য বিজয় করেন তখন তাঁহার এক সহকারী যোদ্ধা ছিল—তাহার নাম তুষ্‌ফান। তুষ্‌ফান তাহার বীর্য এবং বাহুবল দ্বারা রোট্টকে বহুপ্রকারের সাহায্য করিয়াছিল; এমন কি ভূতপূর্ব রাজাকে ধৃত করিয়া সে-ই স্বহস্তে তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছিল। তাই, রাজ্য করলীকৃত হইলে রোট্ট তুষ্ট হইয়া রাজ্যের সীমান্তস্থিত চষ্টন

নামক প্রধান গিরিদুর্গ তাহাকে অর্পণ করেন। পদমর্যাদায় রাজার পরেই তাহার স্থান নির্দিষ্ট হয়।

তাহার পর বহুবর্ষ অতীত হইয়াছে, তুষ্‌ফাণের মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পুত্র কিরাত এখন চষ্টন দুর্গের অধিপতি। কিরাত সুদর্শন যুবা—কিন্তু কুটিল ও নিষ্ঠুর বলিয়া তাহার কুখ্যাতি ছিল। লোকে বলিত, হূণ রক্তই তাহার দেহে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

এই কিরাত একদা নবযৌবনা তেজস্বিনী রট্টাকে দেখিয়া মজিল। অন্য কেহ হইলে হয় তো নিজ স্পর্ধায় ভীত হইয়া পলায়ন করিত, কিন্তু কিরাত নিজ দুর্গ ছাড়িয়া কপোতকূটে আসিয়া বসিল। রাজসভায় নিত্য যাতায়াতে কুমারীর সহিত প্রত্যহই তাহার সাক্ষাৎ হয়। সুমিষ্ট ভাষণে কিরাত যেমন পটু, আবার মৃগয়াদি পুরুষোচিত ক্রীড়ায় তেমনই দক্ষ। মৃগয়ায় সে রাজকুমারীর নিত্য পার্শ্বচর হইয়া উঠিল।

তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে রাজকুমারীর বাকি রহিল না। হূণকন্যা শিশুকাল হইতে অন্তঃপুরের নীড় ছাড়িয়া মুক্ত আকাশে বিচরণ করিতে অভ্যস্ত, তাই তাঁহার বুদ্ধিও একটি অনবগুণ্ঠিত স্বচ্ছতা লাভ করিয়াছিল। মৃগয়াকালে তিনি কিরাতের অব্যর্থ লক্ষ্যের প্রশংসা করিলেন, উদ্যান বাটিকায় তাহার সরস চাটু বচনে হাস্য করিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রশংসা-দৃষ্টি মোহমুক্ত হইয়াই রহিল, হাসিতে অধররাগ ভিন্ন অন্য কোনও রাগ-রক্তিমা ফুটিল না। কিরাত অনুভব করিল, রাজকন্যা সর্বদাই তাহাকে মনে মনে বিচার করিতেছেন, তুলাদণ্ডে ওজন করিতেছেন। তাহার দুর্দম অভীপ্সা আরও প্রবল ও ব্যক্ত হইয়া উঠিল।

নগরে এই কথা লইয়া লোফালুফি আরম্ভ হইল। সচিব ও সভাসদগণ পূর্বেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সর্বশেষে রাজাও লক্ষ্য করিলেন।

রাজা প্রথমে বিস্মিত হইলেন; তারপর সচিবদের ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন। উদ্ধতপ্রকৃতি কিরাতের প্রতি কেহই সন্তুষ্ট ছিলেন না;

তাঁহারা মত দিলেন, একজন সামন্তপুত্রের সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইতে পারে না, বিশেষতঃ যখন কুমারীই রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী। তাহাতে রাজবংশের মর্যাদার হানি হইবে। বরং নিজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অন্যান্য রাজবংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা কর্তব্য। মিত্র যদি সম্বন্ধী হয়, তাহা হইলে বিপৎকালে সাহায্যপ্রাপ্তি বিষয়ে কোনও সংশয় থাকে না।

সচিবদের মন্ত্রণাই মহারাজের মনঃপূত হইল। তিনি রাজসভায় কিরাতকে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া জানাইলেন যে, নিজ দুর্গাধিকার ত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল রাজধানীতে বিলাস ব্যসনে কালক্ষেপ করা তাহার পক্ষে অশোভন। কিরাত কিছুক্ষণ স্থির নেত্রে মহারাজের মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সভা ত্যাগ করিল। [illegible] পরে সে অশ্বপৃষ্ঠে কপোতকূট ছাড়িয়া নিজ দুর্গে ফিরিয়া গেল।

কিরাতকে বিদায় করিয়া মহারাজ প্রাপ্তযৌবনা কন্যার বিবাহের কথা চিন্তা করিতে বসিলেন। জীবন অনিত্য, তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে কন্যার বিবাহ না হইলে সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া [illegible]। মন্ত্রীদের সহিত আলোচনার পর স্থির হইল, মিত্র গুর্জররাজের দ্বিতীয় পুত্র কুমার ভট্টারক বারণ বর্মা মহা[illegible] বীরপুরুষ, তাঁহার নামে নিমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হোক, তিনি আসিয়া কিছুকাল বিটঙ্করাজ্যে অবস্থান করুন। তারপর রাজকন্যার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে উভয়ের মনোভাব বুঝিয়া যথাকর্তব্য নিরূপণ করা যাইবে।

সাড়ম্বর নিমন্ত্রণ লিপি যথাকালে প্রেরিত হইল। অবশ্য তাহাতে বিবাহের কোনও উল্লেখ রহিল না, কিন্তু মনোগত অভিপ্রায় গুর্জররাজ বুঝিলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে পরিষ্কার করিয়া কথা বলিবার রীতি কোনও কালেই ছিল না।

অনতিকাল পরে গুর্জরের বারণ বর্মা মহাসমারোহে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। রট্টার সহিত রাজসভায় তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিল। প্রথম দর্শনে রট্টা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কুমার ভট্টারক বারণ বর্মার মূর্তি বীরোচিত বটে, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় সমান; সম্মুখে উদর ও পশ্চাতে নিতম্ব রণভেরীর ন্যায় উচ্চ, মুখমণ্ডলে বিশাল গুম্ফ ও ভ্রূযুগল প্রায় তুল্য রোমশ। তাঁহাকে দেখিয়া গুর্জর-দেশীয় খ্যাতনামা হস্তীর কথা স্মরণ হয়। রট্টা ক্ষণকাল বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার পানে চাহিয়া থাকিয়া ছিন্ন বল্লরীর মত সভাস্থলেই হাসিয়া লুটাইয়া পড়িলেন।

বিবাহের প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ হইল। ক্ষুণ্ণ বারণ বর্মা পরদিনই স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন।

সুগোপা সখীসুলভ চপলতায় রট্টাকে এই ঘটনার ইঙ্গিত করিয়া পরিহাস করিয়াছিল। এখন রট্টার প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল—'আমার কথা ছাড়িয়া দাও, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের গলায় মালা দিলেও আমি সুখী হইব না। কিন্তু আমার কথা ভাবিলে তো চলিবে না।'

রট্টা বলিলেন—'তবে কাহার কথা ভাবিব?'

'নিজের কথা। এই যে দেবভোগ্য যৌবন, এ কি ফুলচন্দন দিয়া সাজাইয়া শুধু আমিই দেখিব? দেবতার ভোগে লাগিবে না?'

'আমার যৌবন আমি সঞ্চয় করিয়া রাখিব, কাহাকেও ভোগ করিতে দিব কেন?'

সুগোপা হাসিল।

'সখি, বিধি-প্রেরিত ভোক্তা যেদিন আসিবে সেদিন কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিবে না, তনু-মন সমস্তই তাঁর পায়ে সমর্পণ করিবে।'

'তুই না হয় মালাকরের পায়ে তনু-মন সমর্পণ করিয়াছিস, তাই বলিয়া কি সকলেরই একটি মালাকর চাই?'

'চাই বৈকি সখি, মালাকর নহিলে নারীর যৌবন নিকুঞ্জে ফুল ফুটাইবে কে?'

রট্টা আর কোন কথা না বলিয়া স্মিতমুখে আকাশের পানে চাহিলেন, চক্ষুদুটি তন্দ্রাচ্ছন্ন, যেন কোন্ অনাগত ভবিতব্যের স্বপ্ন দেখিতেছে। সুগোপা কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া শেষে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'মহারাজ যে কী করিতেছেন তিনিই জানেন। হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া চষ্টন দুর্গে গিয়া বসিয়া আছেন। এদিকে বসন্তঋতু নিঃশেষ হইয়া আসিল। কি জন্য গিয়াছেন তুমি কিছু জানো?'

রট্টা বলিলেন—'চষ্টনের দুর্গাধিপ কিরাত পত্র লিখিয়াছিল, কয়েকটি চৈনিক শ্রমণ বুদ্ধের পবিত্র বিহারভূমি দর্শন করিবার মানসে ভারতে আসিয়াছেন, তাঁহারা পাটলিপুত্র যাইবেন, পথে কয়েকদিনের জন্য চষ্টন দুর্গে বিশ্রাম করিতেছেন। তাই শুনিয়া মহারাজ অর্হৎ সন্দর্শনে গিয়াছেন।'

সুগোপা মাথা নাড়িয়া বলিল—'বিশ্বাস হয় না, কিরাতটা মহা ধূর্ত, ছল করিয়া মহারাজকে নিজ দুর্গে লইয়া গিয়াছে—নিশ্চয় কোনও দুরভিসন্ধি আছে। হয়তো নিভৃতে পাইয়া চাটুবাক্যে মহারাজকে দ্রবীভূত করিয়া তোমার পাণিপ্রার্থনা করিবে।'

'তুই কিরাতকে দেখিতে পারিস না।'

'তা পারি না। শুনিয়াছি এই বয়সেই সে ঘোর অত্যাচারী—অতিশয় দুর্জন।'

'শিকারে কিন্তু তার অব্যর্থ লক্ষ্য।'

'অব্যর্থ লক্ষ্য হইলেই সজ্জন হয় না। বাজপাখী কি সজ্জন?'

'কিরাত চমৎকার মিষ্ট কথা বলিতে পারে।'

'যে পুরুষ মিষ্ট কথা বলে, তাহাকে বিশ্বাস করিতে নাই।'

'তোর মালাকর বুঝি তোকে কেবলই গালি দেয়?'

সুগোপা দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল—'পরিহাস নয়। কিরাত তোমার পায়ের দিকে তাকাইবার যোগ্য নয়, কিন্তু সে তোমাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে! আমি জানি, তোমার জন্য সে পাগল।'

রট্টা অল্প হাসিলেন, তারপর গম্ভীর হইয়া বলিলেন—'শুধু আমার জন্য নয় সুগোপা, এই বিটঙ্ক রাজ্যটার জন্যও সে পাগল। কিন্তু ও কথা যাক। রাত্রি গভীর হইয়াছে, তুই এবার গৃহে যা।'

'তাই যাই, তুমিও ক্লান্ত হইয়াছ। একে সারাদিন বনে বনে মৃগয়া, তার উপর চোরের উৎপাত—জলসত্র হইতে এতটা পথ হাঁটিয়া আসিতে হইয়াছে। মানুষ ঘোড়া চুরি করে এমন কথা জন্মে শুনি নাই। আর কী স্পর্ধা—রাজকন্যার ঘোড়া চুরি! দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম লোকটা ভাল নয়।' নিজের লাঞ্ছনার কথা স্মরণ করিয়া সুগোপার রাগ একটু বাড়িল —'দুর্বৃত্ত বিদেশী তস্কর! এখন যদি তাহাকে একবার পাই—'

'কি করিস?'

'শূলে দিই।'

'আমিও। এখন যা, চোরের উপর রাগ করিয়া পতি-দেবতাকে আর কষ্ট দিস না। সে হয় তো হাঁ করিয়া তোর পথ চাহিয়া আছে, ভাবিতেছে তোকেও চোরে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।'

'মালাকরের সে ভয় নাই, তিনি জানেন আমাকে চুরি করিতে পারে এমন চোর জন্মায় নাই। তিনি এখন কোন শৌণ্ডিকালয়ে পড়িয়া অপ্সরী কিন্নরীর স্বপ্ন দেখিতেছেন। যাই, তাঁহাকে খুঁজিয়া লইয়া গৃহে ফিরিতে হইবে তো।'

'প্রত্যহই বুঝি তাই করিতে হয়?'

'হাঁ।' সুগোপা মৃদু হাসিল—'মালাকর লোকটি মন্দ নয়, আমাকে ভালও বাসে। কিন্তু মাদিরা-সুন্দরীর প্রতি প্রেম কিছু অধিক। যাই, সপত্নীগৃহ হইতে পতি-দেবতাকে উদ্ধার করিয়া নিজ গৃহে আনি গিয়া।'

হাসিতে হাসিতে সুগোপা বিদায় লইল। তখন মধ্য রাত্রি হইতে অধিক বিলম্ব নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মদিরা ভবন

রাজপুরী হইতে বাহির হইতে গিয়া সুগোপা দেখিল তোরণদ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এমন প্রায়ই ঘটে, সেজন্য সুগোপার গতিবিধি বাধাপ্রাপ্ত হয় না। সে প্রতীহারকে গুপ্তদ্বার খুলিয়া দিতে বলিল।

কোনও অজ্ঞাত কারণে প্রতীহারের মনে তখন কিঞ্চিৎ রস সঞ্চার হইয়াছিল; সে নিজের দ্বিধা-বিভক্ত চাপদাড়িতে মোচড় দিয়া একটা আদি-রসাশ্রিত রসিকতা করিয়া ফেলিল। সুগোপাও ঝাঁঝালো উত্তর দিল। সেকালে আদিরসটা গো-রক্ত ব্রহ্মরক্তের মত অমেধ্য বিবেচিত হইত না।

তোরণের কবাটে একটি চতুষ্কোণ দ্বার ছিল, বাহির হইতে চোখে পড়িত না। সুগোপার ধমক খাইয়া প্রতীহার তাহা খুলিয়া দিল, বলিল— 'ভাল কথা, দেব-দুহিতার ঘোড়াটা মন্দুরায় ফিরিয়া আসিয়াছে।'

সবিস্ময়ে সুগোপা বলিল—'সে কি! আর চোর?'

মুণ্ড নাড়িয়া প্রতীহার বলিল—'চোর ফিরিয়া আসে নাই।'

'তুমি নিপাত যাও।—দেবদুহিতাকে সংবাদ পাঠাইয়াছ?'

'যবনীর মুখে দেবদুহিতার নিকট সংবাদ গিয়াছে, এতক্ষণ তিনি পাইয়া থাকিবেন।'

সুগোপা অনিশ্চিত মনে ক্ষণেক চিন্তা করিল, তারপর সন্তর্পণে ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। প্রতীহার কৌতুকসহকারে বলিল—'এত রাত্রে কি চোরের সন্ধানে চলিলে?'

'হাঁ।'

প্রতীহার নিশ্বাস ফেলিল—'ভাগ্যবান চোর! দেখা হইলে তাহাকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিও।'

'তাই দিব। চোরের সংসর্গে রাত্রিবাস করিলে তোমার রস কমিতে পারে।' সুগোপা দ্বার উত্তীর্ণ হইল।

প্রতীহার ছাড়িবার পাত্র নয়, সে উত্তর দিবার জন্য দ্বার পথে মুখ বাড়াইল। কিন্তু সুগোপা তাহার মুখের উপর সজোরে কবাট ঠেলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে নগরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল।

•

সুগোপা যতক্ষণ মদিরা গৃহে পতি অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে সেই অবকাশে আমরা চিত্রকের নিকট ফিরিয়া যাই।

কপোতকূটে প্রবেশ করিয়া চিত্রক উৎসুক নেত্রে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে চলিল। নগরীর শোভা দেখিবার আগ্রহ তাহার বিশেষ ছিল না। প্রথমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইবে, প্রায় এক অহোরাত্র কিছু আহার হয় নাই। কটিবন্ধন দৃঢ় করিয়া জঠরাগ্নিকে দীর্ঘকাল ঠেকাইয়া রাখা যায় না, ক্লেশ যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা সহ্য করিতে হইয়াছে, কিন্তু দূত প্রসাদাৎ এখন আর ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিবার প্রয়োজন নাই।

পথে চলিতে চলিতে শীঘ্রই একটি মোদক ভাণ্ডার তাহার চোখে পড়িল। থরে থরে বহুবিধ পক্কান্ন সজ্জিত রহিয়াছে—পিষ্টক লড্ডুক ক্ষীর দধি কোনও বস্তুরই অভাব নাই। মেদমসৃণ-দেহ মোদক বসিয়া দীর্ঘ খর্জুর শাখা দ্বারা মক্ষিকা তাড়াইতেছে।

মোদকালয়ে বসিয়া চিত্রক উদরপূর্ণ করিয়া আহার করিল। একটি বালক পথে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিষ্টান্ন নিরীক্ষণ করিতেছিল, চিত্রক তাহাকে ডাকিয়া একটি লড্ডু দিল। উৎফুল্ল বালক লড্ডু খাইতে খাইতে প্রস্থান করিলে পর, সে জল পান করিয়া গাত্রোত্থান করিল; ভোজ্যের মূল্যস্বরূপ শশিশেখরের থলি হইতে একটি ক্ষুদ্র মুদ্রা লইয়া

মোদককে দিল, তারপর তৃপ্তি-মন্থর পদে আবার পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

গৃহদ্বারে তখন দুই একটি বর্ত্তি জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে; গৃহস্থের শুদ্ধান্তঃপুর হইতে ধূপ কালাগুরুর গন্ধ বাতাসে ভাসিতেছে, প্রদীপ-হস্তা পুরনারীগণ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া গৃহদেবতার অর্চনা করিতেছে। কচিৎ দেবমন্দির হইতে আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি উত্থিত হইতেছে। দিবাবসানের বৈরাগ্য-মুহূর্তে নগরী যেন ক্ষণকালের জন্য যোগিনীমূর্তি ধারণ করিয়াছে।

অপরিচিত নগরীর পথে বিপথে চিত্রক অনায়াস চরণে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। হাতে কোনও কাজ নাই, উদর পরিপূর্ণ—সুতরাং মনও নিরুদ্বেগ। যে-ব্যক্তি রাজপুরুষের ঘোড়া চুরি করিয়াছিল তাহাকে মাত্র তিনজন দেখিয়াছে, তাহারা চিত্রককে এই জনাকীর্ণ পুরীতে দেখিতে পাইবে সে সম্ভবনা কম। দেখিতে পাইলেও তাহার নূতন বেশে চিনিতে পারিবে না। অতএব নগর পরিদর্শনে বাধা নাই।

নগর পরিভ্রমণ করিয়া চিত্রক দেখিল, উজ্জয়িনী বা পাটলিপুত্রের ন্যায় বৃহদায়তন না হইলেও কপোতকূট বেশ পরিচ্ছন্ন ও সুদৃশ্য নগর। সে তাহার যাযাবর যোদ্ধজীবনে বহু স্থানীয় মহাস্থানীয় দেখিয়াছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র অসমতল পাষাণ নগরটি তাহার বড় ভাল লাগিল। সে ঈষৎ ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিল, এখানে দীর্ঘকাল থাকা চলিবে না, বেশী দিন থাকিলেই ধরা পড়িবার ভয়। এদিকে তিনজন তো আছেই, তাহা ছাড়া শশিশেখর যে বন হইতে বাহির হইয়া আসিবে না তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?

ক্রমে রাত্রি হইল; আকাশে চন্দ্র ও নিম্নে বহু দীপের জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। রাজভবন শীর্ষে দীপাবলি মণিমুকুটের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঘুরিতে ঘুরিতে চিত্রক একটি উদ্যানের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিল, কয়েকজন ভদ্র নাগরিক দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছে। সে একজনকে জিজ্ঞাসা করিল—'মহাশয়, ওটা কি?'

নাগরিক বলিল—'ওটা রাজপুরী।'

সপ্রশংস নেত্রে রাজপুরী নিরীক্ষণ করিয়া চিত্রক বলিল—'অপূর্ব প্রাসাদ। মগধের রাজপুরীও এমন সুরক্ষিত নয়। রাজা ঐ পুরীতে থাকেন?'

নাগরিক বলিল—'থাকেন বটে, কিন্তু বর্তমানে তিনি রাজপুরীতে নাই। তাই তো এরূপ অঘটন সম্ভব হইয়াছে।'

'অঘটন?'

'শুনেন নাই? রাজকুমারীর অশ্ব চুরি করিয়া এক গর্ভদাস তস্কর পলায়ন করিয়াছে।'

'রাজকুমারীর অশ্ব—?' প্রশ্নটা অনবধানে চিত্রকের মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিল।

'হাঁ। কুমারী মৃগয়ায় গিয়াছিলেন, জলসত্রে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। —আপনি কি বিদেশী?' বলিয়া নাগরিক সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে চিত্রকের মূল্যবান বেশভূষার পানে চাহিল।

'হাঁ। আমি মগধের অধিবাসী, কর্মসূত্রে আসিয়াছি।'

চিত্রক আর সেখানে দাঁড়াইল না।

আকস্মিক সংবাদে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইবে চিত্রকের প্রকৃতি সেরূপ নয়। কিন্তু এই সংবাদ পরিগ্রহ করিবার পর প্রায় প্রহরকাল সে বিক্ষিপ্ত চিত্তে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়াইল। সংবাদটা নগরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। কে জানিত যে ঐ অশ্বারোহীটা রাজকন্যা! রাজকন্যা পুরুষবেশে ঘোড়ায় চড়িয়া মৃগয়া করিয়া বেড়ায়! আশ্চর্য বটে। চিত্রক রাজকন্যার মুখাবয়ব স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু বিশেষ কিছু উদ্ধার করিতে পারিল না; তাহাকে দেখিয়া গর্বিত ও কিশোরবয়স্ক মনে হইয়াছিল এইটুকুই শুধু স্মরণ হইল।

রমণীর সম্পত্তি সে অপহরণ করিয়াছে, মনে হইতেই চিত্রক লজ্জা

অনুভব করিল। সে ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধা, পরদ্রব্য সম্বন্ধে তাহার মনে তিলমাত্র কুণ্ঠা নাই, সে জানে, এই বসুন্ধরা এবং ইহার যাবতীয় লোভনীয় বস্তু বীরভোগ্য। তবু, রমণী সম্বন্ধে তাহার মনে একটু দুর্ব্বলতা ছিল। জীবনে সে কখনও নারীর নিকট হইতে কোনও দ্রব্য কাড়িয়া লয় নাই, স্বেচ্ছায় তাহারা যাহা দিয়াছে তাহাই হাসিমুখে গ্রহণ করিয়াছে, তদতিরিক্ত নয়।

হয় তো ঐ পুরুষবেশীর রূপ ও ঐশ্বর্য্য তাহার মনে ঈর্ষার সঞ্চার করিয়াছিল, হয় তো প্রপাপালিকার সহিত যুবকের ঘনিষ্ঠতা তাহার পৌরুষকে আঘাত করিয়াছিল,—সুগোপার সহিত নিজের ব্যবহার স্মরণ করিয়াও তাহার মন সবিস্ময় ক্ষোভে ভরিয়া উঠিল। অবশ্য তাহার আচরণে অনেকখানি কৌতুক মিশ্রিত ছিল, তথাপি, কৌতুক কখন নিজ সীমা অতিক্রম করিয়া নিগ্রহে রূপান্তরিত হইয়াছিল তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। বুভুক্ষিত শ্রান্তিভগ্ন দেহে আশাহত অবস্থায় মানুষ যে কর্ম্ম করে, পরিপূর্ণ উদরে সুস্থ দেহে সে নিজেই তাহার কারণ খুঁজিয়া পায় না।

আকাশের পানে চাহিয়া চিত্রক হাসিল। জীবনকে সে বহুরূপে বহু অবস্থায় দেখিয়াছে, তাই পশ্চাত্তাপ ও অনুশোচনাকে সে নিরর্থক বলিয়া জানে। নিয়তির গতি অনুশোচনার দ্বারা লেশমাত্র ব্যতিক্রান্ত হয় না, অদৃষ্টই নিয়ন্তা। চিত্রকের মনে হইল, ভাগ্যদেবী তাহার চারিপাশে সূক্ষ্ম ভবিতব্যতার জাল বুনিতে আরম্ভ করিয়াছেন—এই জালে ক্ষুদ্র মীনের মত আবদ্ধ হইয়া সে কোন অদৃষ্ট তটে উৎক্ষিপ্ত হইবে কে জানে?

চন্দ্রের দিকে দৃষ্টি পড়িতে তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল। মধ্যগগনে চন্দ্র, রাত্রি গভীর হইতেছে। সচকিতে সে চারিদিকে চাহিল, দেখিল বৌদ্ধ চৈত্যের নিকটস্থ উচ্চ ভূমির উপর সে একাকী দাঁড়াইয়া আছে। এখানে পথ গৃহ-বিরল, লোক চলাচলও কম। দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া

দেখিল, একটি স্থান আলোকমালায় ঝলমল করিতেছে। বহু নাগরিকের মিলিত স্বরগুঞ্জন তাহার কর্ণে আসিল।

চিত্রক কিছুকাল যাবৎ ঈষৎ তৃষ্ণা অনুভব করিতেছিল, ঐ আলোক-দীপ্ত পথের দিকে চাহিয়া তাহার তৃষ্ণা আরও বাড়িয়া গেল। নগরে অবশ্য মদিরাগৃহ আছে, এ কথাটা এতক্ষণ তাহার মনে হয় নাই। রাত্রির জন্য একটা আশ্রয়ও খুঁজিয়া লইতে হইবে। সে আলোকলিপ্সু পতঙ্গের মত দ্রুত সেই দিকে চলিল।

রজনীর আনন্দধারা তখন অন্তঃস্রোতা হইয়া আসিয়াছে। পুষ্প-বিপণিতে পুষ্পসম্ভার প্রায় শূন্য, পসারিণীদের চক্ষে আলস্য; রাজপথে নাগরিকদের গতায়াত ও ব্যস্ত আগ্রহ মন্দীভূত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। নবীনা রাত্রির নবযৌবনসুলভ প্রগল্ভতা প্রগাঢ়যৌবনার রসঘন নিবিড় মাধুর্যে পরিণত হইয়াছে।

পুষ্পাসব গন্ধে আকৃষ্ট মধুমক্ষিকা যেমন কেবলমাত্র ঘ্রাণশক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রচ্ছন্ন ফুলকলিকার সন্নিধানে উপস্থিত হয়, চিত্রকও তেমনই পিপাসা-প্রণোদিত হইয়া একটি মদিরাগৃহের দ্বারে উপনীত হইল। মদিরাগৃহের ভিতরে উচ্চ চত্বরের উপর বসিয়া মুণ্ডিতশীর্ষ শৌণ্ডিক স্তূপীকৃত রজতমুদ্রা গণনা করিতেছিল, চিত্রক প্রবেশ করিয়া তাহার সম্মুখে একটী স্বর্ণদীনার অবহেলা ভরে ফেলিয়া দিল, বলিল—'পানীয় দাও।'

চমকিত শৌণ্ডিক যুক্তকরে সম্ভাষণ করিল—'আসুন মহাভাগ! কোন পানীয় দিয়া মহোদয়ের তৃপ্তিসাধন করিব? আসব সুরা বারুণী মদিরা—যে পানীয় ইচ্ছা আদেশ করুন।'

'তোমার শ্রেষ্ঠ মদিরা আনয়ন কর।'

'যথা আজ্ঞা।—মধুশ্রী!'

শৌণ্ডিক কিঙ্করীকে ডাক দিল। নূপুর কাঞ্চী বাজাইয়া একটি

তন্দ্রালসা কিঙ্করী আসিয়া দাঁড়াইল। শৌণ্ডিক বলিল—'আর্যকে সুঘটিত কক্ষে বসাও, শ্রেষ্ঠ মদিরা দিয়া তাঁহার সেবা কর।'

কিঙ্করী চিত্রককে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া বসাইল। কক্ষটি সুচারুরূপে সজ্জিত, কুট্টিমের উপর শুভ্র আস্তরণ, তদুপরি স্থূল উপাধান তাম্বূল করঙ্ক প্রভৃতি রহিয়াছে। চারি কোণে পিত্তলের দীপদণ্ডে বর্ত্তিকা জ্বলিতেছে। ধূপশলা হইতে চন্দনগন্ধী সূক্ষ্ম ধূম ক্ষীণ রেখায় উত্থিত হইতেছে। প্রাচীর গাত্রে সমুদ্র মন্থনের চিত্র, সুধাভাণ্ড লইয়া সুরাসুরের মধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব বাধিয়া গিয়াছে।

চিত্রক উপবিষ্ট হইলে কিঙ্করী নিঃশব্দ ক্ষিপ্রতার সহিত মদিরা-ভৃঙ্গার, চষক ও সুচিত্রিত স্থালীতে মৎস্যাণ্ড আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিল, তারপর আদেশ প্রত্যাশায় কৃতাঞ্জলিপুটে দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইল। চিত্রক এক চষক মদিরা ঢালিয়া এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিল, তারপর তৃপ্তির সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'সেবিকে, তুমি যাও, আমার আর কিছু প্রয়োজন নাই।'

মধুশ্রী সাবধানে কবাট ভেজাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। একাকী বসিয়া চিত্রক স্বাদু মৎস্যাণ্ড সহযোগে আরও কয়েক পাত্র মদিরা পান করিল। ক্রমে তাহার চক্ষু ঢুলু ঢুলু হইয়া আসিল, মস্তিষ্কের মধ্যে স্বপ্নসুন্দরীর মঞ্জীর বাজিতে লাগিল। সে উপাধানের উপর আলস্যভরে অঙ্গ প্রসারিত করিয়া দিল।

মদিরাজনিত মৃদু বিহ্বলতার মধ্যে চিন্তার ধারা আবছায়া হইয়া যায়, একটা অহেতুক স্ফূর্তি আলস্যের সহিত মিলিয়া মনকে হিন্দোলার মত দোল দিতে থাকে। চিত্রকের অবস্থা তখন সেইরূপ। সে নিজের অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ের উপর দৃষ্টিপাত করিল, তারপর অঙ্গুরীয় চোখের কাছে আনিয়া ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল। তখন বনের মধ্যে শশিশেখরের সহিত আলাপের কথা তাহার নূতন করিয়া মনে পড়িয়া গেল।

নিজ মনে মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে সে উঠিয়া বসিল; কটি হইতে থলিটি বাহির করিয়া তাহার মুখোদ্‌ঘাটন পূর্বক একটি একটি সামগ্রী বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল। স্বর্ণপ্রসূ থলির সমস্ত বৈভব এখনও পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই।

তিলক চন্দন দেখিয়া তাহার মুখের হাস্য প্রসার লাভ করিল; কঙ্কতিকাটি তুলিয়া ধরিয়া সে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। এলা লবঙ্গ মুখে দিয়া সকৌতুকে চিবাইল, সব শেষে জতুমুদ্রালাঞ্ছিত কুণ্ডলাকৃতি লিপি খুলিয়া গম্ভীরমুখে পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। মগধের লিপি, বিটঙ্করাজের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। পাঠ করিতে করিতে চিত্রক তাহাতে নিমগ্ন হইয়া গেল।

এই সময় দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া কে একজন ঘরের মধ্যে উঁকি মারিল; কাজলপরা একটি চোখ ও মুখের কিয়দংশ দেখা গেল মাত্র। চিত্রককে দেখিয়া কাজলপরা চোখ ক্রমশ বিস্ফারিত হইল, তারপর ধীরে ধীরে কবাট আবার বন্ধ হইয়া গেল। চিত্রক পত্রপাঠে নিবিষ্ট ছিল, কিছু দেখিল না; দেখিলেও বোধ করি চিনিতে পারিত না।

বলা বাহুল্য যে উঁকি মারিয়াছিল সে সুগোপা। পতি অন্বেষণে কয়েকটি মদিরাগৃহ ঘুরিয়া শেষে সে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাকে দেখিযাই শৌণ্ডিক হাসিমুখে বলিয়াছিল—'প্রপাপালিকে, তোমার মানুষটি তো আজ এখানে নাই।'

সুগোপা বলিয়াছিল—'তোমার কথায় বিশ্বাস নাই, আমি খুঁজিয়া দেখিব।'

'ভাল, তাই দেখ।'

তখন এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিতে খুঁজিতে একটি ঘরে উঁকি মারিয়া সহসা তাহার চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছিল। বেশভূষা অন্য প্রকার, কিন্তু সেই দুর্বৃত্ত অশ্বচোরই বটে।

কিছুক্ষণ সুগোপা দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর পা টিপিয়া শৌণ্ডিকের নিকট ফিরিয়া গেল। চুপি চুপি বলিল—'মণ্ডূক, নগরপালকে সংবাদ দাও।'

বিস্মিত মণ্ডূক বলিল—'সে কি। কি হইয়াছে?'

'চোর। যে চোর আজ কুমারী বট্টার অশ্ব চুরি করিয়াছিল সে ঐ প্রকোষ্ঠে বসিয়া মদ্যপান করিতেছে।'

মণ্ডূকের মুখে ভয়ের ছায়া পড়িল। দুষ্কৃতকারীকে মদিরাগৃহে আশ্রয় দিলে শৌণ্ডিককে কঠিন রাজদণ্ড ভোগ করিতে হয়। সে বলিল—'সর্বনাশ, আমি তো কিছু জানি না।'

'তাই বলিতেছি, যদি নিজের প্রাণ বাঁচাইতে চাও শীঘ্র নগরপালকে ডাকিয়া আন।'

'নগরপালকে এত রাত্রে কোথা পাইব? তিনি নিশ্চয় গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন, তাঁহার কাঁচা ঘুম ভাঙাইয়া কি নিজের পায়ে দড়ি দিব?'

সুগোপা চিন্তা করিল।

'তবে এক কাজ কর। দুইজন যামিক নগররক্ষী ডাকিয়া আন, তাহারা আজ রাত্রে চোরকে বাঁধিয়া রাখুক, কাল প্রাতে মহাপ্রতীহারের হস্তে সমর্পণ করিবে।'

'সে কথা ভাল' বলিয়া ব্যস্তসমস্ত মণ্ডূক বাহির হইয়া গেল।

অধিক দূর যাইতে হইল না। রাত্রিকালে যামিক রক্ষীরা পথে পথে বিচরণ করিয়া নগর পাহারা দিয়া থাকে। একটা তম্বুল বিপণির সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুইজন যামিকরক্ষী বোধ করি রাত্রিতে পাথেয় সংগ্রহ করিতেছিল, মণ্ডূকের কথায় উত্তেজিত হইয়া তাহার সঙ্গে চলিল।

সুগোপা অল্প কথায় ব্যাপার বুঝাইয়া দিল, তখন চারিজনে চিত্রকের প্রকোষ্ঠের দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। চিত্রক তখন লিপি পাঠ

শেষ করিয়া থলি কোমরে বাঁধিয়াছে, ভৃঙ্গার হইতে শেষ মদিরাটুকু ঢালিয়া পান করিতেছে। অস্ত্রধারী দুইজন পুরুষকে সম্মুখে দেখিয়া সে বলিল—'কি চাও?'

সুগোপা পিছন হইতে বলিল—'তোমাকে চাই।'

চিত্রক ত্বরিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তরবারি বাহির করিবার পূর্বেই রক্ষীরা তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে পাড়িয়া ফেলিল।

সুগোপা তখন সম্মুখে আসিয়া বলিল—'অশ্বচোর, আমাকে চিনিতে পার?'

চক্ষু সঙ্কুচিত করিয়া চিত্রক তাহার পানে চাহিল। অদৃষ্টের জাল গুটাইয়া আসিতেছে। সে অধরোষ্ঠ চাপিয়া বলিল—'প্রপাপালিকা!'

সুগোপা রক্ষীদের দিকে ফিরিয়া বলিল—'ইহাকে সাবধানে পাহারা দিও। অতি ধূর্ত চোর, সুবিধা পাইলেই পলাইবে।'

একজন রক্ষী বলিল—'সাবধানে কোথায় রাখিব? রাত্রে কারাগার তো বন্ধ আছে।'

হঠাৎ সুগোপার মনে পড়িয়া গেল। উদ্বেলিত হাসি চাপিয়া সে বলিল—'রাজপুরীর তোরণ-প্রহরীর কাছে লইয়া যাও। আমার নাম করিয়া বলিও, সে সমস্ত রাত্রি চোরকে পাহারা দিবে।'

সুগোপাকে নগরের সকলেই চিনিত। প্রপাপালিকা হইলে কি হয়, রাজকুমারীর সখী। রক্ষীরা দ্বিরুক্তি না করিয়া চোরকে বাঁধিয়া রাজপুরীর দিকে লইয়া চলিল।

ভাগ্যক্রমে চিত্রকের থলিটি রক্ষীরা কাড়িয়া লইল না। তাহারা সাধু-চরিত্র বলিয়াই হোক, অথবা যে চোর রাজকন্যার ঘোড়া চুরি করিয়াছে তাহার উপর বাটপাড়ি করিলে গোলযোগ হইতে পারে এই জন্যই হোক, চিত্রকের থলিতে তাহারা হস্তক্ষেপ করিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বন্দিনী

তোরণ প্রতীহারের নাসিকায় বিলক্ষণ আঘাত লাগিয়াছিল। সুগোপার প্রতি রসে-ভরা প্রীতির ভাব আর তাহার ছিল না। তদুপরি দুইটা বিকশিতদন্ত বামিক-রক্ষা যখন একটা চোরকে তাহার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া চলিয়া গেল তখন শুধু সুগোপা নয়, সমস্ত নারী জাতির উপর তাহার মন বিরক্ত হইয়া উঠিল। দেবদুহিতার সখী না হইয়া অন্য কোনও লোক হইলে কখনই সে চোরকে সারা রাত্রি আগুলিয়া থাকিবার ভার লইত না। শান্তির সময়, দেশে কোনও প্রকার উপদ্রব নাই; এ সময়ে রাজপুরীর তোরণ পাহারা দিতে হইলে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিবার প্রযোজন হয় না; দ্বারে ঠেস দিয়া চক্ষু মুদিত করিলেই প্রভাত হইয়া যায়। কিন্তু এখন এই অশ্বচোরটাকে লইয়া সে চক্ষু মুদিবে কি প্রকারে? চোর যদি পালায় তবে আর রক্ষা নাই। তবে কি চতুঃপ্রহর রাত্রি জাগিয়া এই বন্ধ্যাপুত্র চোরকে পাহারা দিতে হইবে? অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া প্রতীহার বলিল—'বাপু অশ্বচোর, তোমার সাজসজ্জা দেখিয়া তোমাকে শিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া মনে হইতেছে। তুমি এমন কুকর্ম করিতে গেলে কেন? রাজ-কুমারীর ঘোড়া চুরি করিলে কি জন্য?'

চোর উত্তর না দিয়া নির্বিকার মুখে আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। প্রতীহার পুনরায় বলিল—'আর যদি করিলেই, ধরা পড়িলে কেন? ধরা যদি পড়িলে, কল্য প্রাতে পড়িলে কি দোষ হইত?'

চোর এবারও কোনও উত্তর করিল না।

'তুমি তো কল্য প্রাতে নির্ঘাৎ শূলে চড়িবে। তবে আজ রাত্রে আমাকে কষ্ট দিয়া কী লাভ হইল?'

প্রতীহারের বিরক্তি ক্রমশ হতাশায় পর্যবসিত হইতেছিল এমন সময় তাহার পাশে একটি কৃষ্ণ ছায়া পড়িল। চমকিয়া প্রতীহার দেখিল, পুর-ভূমির জীবন্ত প্রেত গুহ নিঃশব্দে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এ আখ্যায়িকায় গুহের স্থান অতি অল্পই; তবু তাহার একটু পরিচয় আবশ্যক। সে হূণ, হূণ অভিযানের সময় আসিয়াছিল। রাজপুরীর যুদ্ধে তাহার মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগে, কপালের বাম ভাগে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ফলে, গুহের স্মৃতি ও বাকশক্তি চিরতরে লুপ্ত হইয়া যায়। তদবধি সে রাজপুরীর প্রাকার বেষ্টনীর মধ্যে আছে, কেহ তাহাকে কিছু বলে না। দিবা ভাগে সে কোথায় থাকে কেহ দেখিতে পায় না; রাত্রে পুরভূমির উপর শীর্ণ খর্ব ছায়ার মত ঘুরিয়া বেড়ায়। রাত্রির প্রহরীরা কদাচিৎ তাহাকে দেখিতে পায়, সে তোরণ স্তম্ভের পাশে বসিয়া আপন মনে হাসিতেছে, অথবা অতৃপ্ত প্রেত-যোনির মত অন্ধকার প্রাকারের উপর সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। প্রহরীরা সাগ্রহে তাহার সহিত কথা বলিবার চেষ্টা করে কিন্তু গুহ নীরব থাকে; তাহার লুপ্ত স্মৃতির মধ্যে কোন্ বিচিত্র রহস্য লুক্কায়িত আছে কেহ অনুমান করিতে পারে না।

গুহ আসিয়া কয়েকবার সন্তর্পণে চিত্রককে প্রদক্ষিণ করিল; মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া যেন আঘ্রাণ গ্রহণ করিল; পশ্চাতে গিয়া কি যেন দেখিল—তারপর নিঃশব্দে হাসিতে হাসিতে প্রতীহারীকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে ডাকিল।

চিত্রকের হস্তদ্বয় পশ্চাতে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ ছিল; প্রতীহার গিয়া দেখিল কোন্ অজ্ঞাত উপায়ে রজ্জুবন্ধন ঢিলা হইয়া গিয়াছে, টানিলেই হাত বাহির হইয়া আসিবে। প্রতীহার ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—'আরে শৃগালপুত্র চোর, তুই আমাকে ফাঁকি দিয়া পালাইতে চাস?' সে দৃঢ়ভাবে রজ্জু বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল।

গুহের গলার মধ্যে অব্যক্ত হাসির মত একটা শব্দ হইল। প্রতীহার তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—'গুহ, বড় রক্ষা করিয়াছ। এ চোর পালাইলে আমাকেই শূলে যাইতে হইত। এখন এই গর্ভ-কুষ্মাণ্ডটাকে বাঁধিয়া সারারাত্রি বসিয়া থাকি। আর বিশ্বাস নাই। একটা কূটকক্ষও যদি থাকিত, এই নষ্টবুদ্ধি তস্করটাকে তাহার মধ্যে বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম।'

গুহের চোখে যেন একটা ছায়া পড়িল, সে দাঁড়াইয়া নিজ অঙ্গুষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল।

প্রতীহারের মনে বহু অশান্তি সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে গুহকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—'গুহ, তোমাকে বলিতেছি, স্ত্রীজাতিকে কদাপি বিশ্বাস করিতে নাই। তাহাদের মত অবিশ্বাসিনী ক্লেশদায়িনী দুষ্টপ্রকৃতি—' উপযুক্ত বেগবান বিশেষণের অভাবে প্রতীহার থামিয়া গেল।

হয় তো নারীজাতির সম্বন্ধে প্রতীহারের উক্তিতে কিছু ছিল, গুহের চক্ষুর্দ্বয় সহসা অর্থপূর্ণ উত্তেজনায় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। সে সবেগে মস্তক আন্দোলন করিয়া প্রতীহারকে তাহার অনুসরণ করিবার সঙ্কেত করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল।

দুই তোরণ-স্তম্ভে দুইটি প্রতীহার কক্ষ আছে, পূর্বে বলা হইয়াছে। এই কক্ষ দুটির প্রবেশদ্বারে কবাট নাই, তাই প্রতীহারদের বিশ্রামের উপযোগী হইলেও বন্দীকে বন্ধ করিয়া রাখিবার সুবিধা নাই। ইহাদের মধ্যে একটি সর্বদা ব্যবহৃত হইত, অন্যটি প্রয়োজনের অভাবে শূন্য পড়িয়া থাকিত। গুহ সেই অব্যবহৃত কক্ষটির মুখ পর্যন্ত গিয়া আবার হাতছানি দিয়া প্রতীহারকে ডাকিল।

প্রতীহারের কৌতূহল হইল। কিন্তু চোরকে একাকী ফেলিয়া যাইতে পারে না। সে ক্ষণেক চিন্তা করিয়া চিত্রকের হস্তরজ্জু ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া চলিল।

স্তম্ভগৃহের মুখে উপস্থিত হইয়া প্রতীহার দেখিল, গুহ চকমকি ঠুকিয়া একটি ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বালিয়াছে। চকমকি প্রদীপ কোথা হইতে পাইল সেই জানে, হয় তো পূর্ব হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। প্রতীহার বুঝিল এই পরিত্যক্ত কক্ষটিতে গুহের যাতায়াত আছে।

দীর্ঘ অব্যবহারে ঘরটি অপরিচ্ছন্ন, কোণে ঊর্ণনাভের জাল। একটা চর্মচটিকা আলোকের আবির্ভাবে ত্রস্ত হইয়া মাথার উপর চক্রাকারে উড়িতে লাগিল।

প্রদীপ ধরিয়া গুহ কক্ষপ্রাচীরের কাছে গেল। অমসৃণ পাথরের দেয়াল, পাথরের উপর যেখানে যোড় লাগিয়াছে সেখানে কমঠ-পৃষ্ঠের ন্যায় চিহ্ন। গুহ প্রদীপ তুলিয়া ধরিয়া দেখিতে লাগিল, তারপর একটি স্থান অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া ধরিল। ধীরে ধীরে দেয়াল হইতে চতুষ্কোণ একটা অংশ সরিয়া গেল।

মহাবিস্ময়ে প্রতীহার দেখিল, একটি সুড়ঙ্গ পথ। ক্ষীণালোকে সুড়ঙ্গের বেশী দূর দেখা গেল না, কিন্তু সুড়ঙ্গ যে প্রাকারের ভিতর দিয়া বল্মীক-বিবরের ন্যায় বহুদূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। হূণেরা পুরী দখল করিয়াছিল বটে কিন্তু এই গুপ্ত সুড়ঙ্গের কথা জানিতে পারে নাই।

মিটিমিটি হাসিতে হাসিতে গুহ রন্ধ্র মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রতীহারকে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল। সুড়ঙ্গ অপরিসর নয়, দুইজন লোক পাশাপাশি চলিতে পারে। প্রতীহার চিত্রককে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

প্রায় ত্রিশ হস্ত যাইবার পর সম্মুখে গহ্বরের ন্যায় অন্ধকার একটা স্থান দেখা গেল; কয়েক ধাপ সোপান এই অন্ধ-কূপের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে, আর কিছু দেখা যায় না।

উত্তেজিত প্রতীহার বলিল—'এ তো দেখিতেছি একটা কূট-কক্ষ! আশ্চর্য! কেহ ইহার সন্ধান জানিত না। গুহ, তুমি কি প্রকারে জানিলে?'

গুহ ললাটের ক্ষত চিহ্নটার উপর হাত বুলাইয়া যেন স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু স্মৃতির দ্বার খুলিল না।

প্রতীহার বলিল—'ভালই হইল। আজ রাত্রে চোরটা এইখানেই থাক, কাল প্রাতে আবার বাহির করিয়া লইয়া যাইব।—কে ভাবিয়াছিল প্রাকারের ভিতরটা ফাঁপা! তাহার ভিতর সুড়ঙ্গ আছে, কূট কক্ষ আছে! যাহোক, গুহ, একথা তুমি জান আর আমি জানিলাম—আর কেহ জানিতে না পারে—'

প্রতীহারের মস্তকে নানাপ্রকার কল্পনা খেলা করিতেছিল ; কে বলিতে পারে, ভূগর্ভস্থ গুপ্ত কক্ষে হয়তো পূর্ববর্তী রাজাদের কত রত্ন—ঐশ্বর্য লুক্কায়িত আছে। 'চোরটা জানিতে পারিল বটে কিন্তু কাল ও শূলে যাইবে সুতরাং একপ্রকার নিশ্চিন্ত—' মনে মনে এই কথা ভাবিয়া প্রতীহার চিত্রককে সেই অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে ঠেলিয়া দিল, তারপর কবাটে অর্গল লাগাইয়া গুহের সহিত বাহিরে ফিরিয়া আসিল। মুক্ত আকাশের তলে আসিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ পূর্বক প্রতীহার গুহের দিকে ফিরিয়া দেখিল, অশরীরী ছায়ার ন্যায় গুহ কখন নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

* * * *

কূট কক্ষের দ্বার বাহির হইতে বন্ধ হইয়া গেলে চিত্রক দেখিল রন্ধ্রহীন অন্ধকারের মধ্যে সে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু কূট কক্ষের বায়ু সম্পূর্ণ নিশ্চল ও বদ্ধ নহে, কোনও অদৃশ্য পথে বায়ু চলাচল হইতেছে—শ্বাস রোধ হইয়া মরিবার ভয় নাই।

চিত্রকের হস্তদ্বয় রজ্জুদ্বারা পশ্চাতে আবদ্ধ ছিল, প্রতীহার খুব দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়াছিল। কিছুক্ষণ চেষ্টা করিবার পর সে বন্ধনের ভিতর হইতে হাত বাহির করিয়া লইল। সৈনিকের বিচিত্র জীবনে এই কৌশলটি সে আয়ত্ত করিয়াছিল।

তারপর অন্ধকারে অতি ধীরে সে সোপান অবতরণ করিতে লাগিল। পাঁচ ছয়টি ধাপ নামিবার পর পদদ্বারা অনুভব করিয়া বুঝিল সোপান শেষ হইয়া চত্বর আরম্ভ হইয়াছে।

এই চত্বর কতখানি বিস্তৃত তাহা জানিবার কৌতূহল চিত্রকের ছিল না, কূট কক্ষ হইতে পলায়নের পথ থাকা সম্ভব নয়, থাকিলেও এই অন্ধকারে তাহা আবিষ্কার করা অসাধ্য। চিত্রক শেষ সোপানের উপর বসিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল। তাহার মনে হইল সে জীবনের শেষ সোপানে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। তাহার হাসি আসিল। নিয়তির জালে সে ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য! তাহার অকিঞ্চিৎকর জীবনকে সমাপ্তির উপকূলে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য নিয়তির এত উদ্যোগ আয়োজন, এত ষড়যন্ত্র? সে যোদ্ধা, মৃত্যুর সহিত তাহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ। তবে আজ মৃত্যু সিধা পথে তীরের মুখে বা অসির ফলায় না আসিয়া এমন কুটিল পথে আসিল কেন? জ্ঞানের উন্মেষ হইতে নিজের জীবনের কাহিনী তাহার মনে পড়িল। মৃত্যু বহুবার তাহার সম্মুখে আসিয়াছে, আবার হাসিয়া অবজ্ঞাভরে ফিরিয়া গিয়াছে; কিন্তু এত আড়ম্বর করিয়া তো কখনও আসে নাই!

শৈশবের কথা তাহার ভাল করিয়া মনে পড়ে না। যখন তাহার অনুমান পাঁচ বৎসর বয়স তখন কোন্ এক নগরে একটা বিকলাঙ্গ লোকের সহিত সে বাস করিত। লোকটা বোধহয় অর্ধ-উন্মাদ ছিল, কখনও তাহাকে প্রহার করিত, কখনও বা আদর করিত। তাহার একটা শাণিত ছুরি ছিল, সেই ছুরি দিয়া সে চিত্রকের দেহ কাটিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিত, আবার জঙ্গল হইতে লতাপাতা আনিয়া সযত্নে বাঁধিয়া সেই ক্ষত আরোগ্য করিত। একদিন হঠাৎ পাগলটা কোথায় চলিয়া গেল, আর ফিরিয়া আসিল না।

অতঃপর কিছুদিনের ঘটনা চিত্রকের মনে নাই, কি করিয়া কোথায়

কাহার আশ্রয়ে কৈশোরের সীমান্তে উপনীত হইল তাহা তাহার স্মৃতি হইতে মুছিয়া গিয়াছে।

যৌবনের প্রারম্ভে সে এক যাযাবর বণিক সম্প্রদায়ের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহাদের সংসর্গে কিছু কিছু লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিল। সার্থবাহ বণিকেরা উষ্ট্র-পৃষ্ঠে পণ্য লইয়া দেশ দেশান্তরে বিচরণ করিয়া বেড়াইত, এক নগর হইতে অন্য নগরে যাইত। চিত্রক তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া বহু সমৃদ্ধ নগর দেখিয়াছিল। পুরুষপুর মথুরা বারাণসী পাটলিপুত্র তাম্রলিপ্তি উজ্জয়িনী কাঞ্চী—উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথের বিচিত্র শোভাশালিনী নানা নগরীর সহিত চিত্রকের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিয়াছিল।

বণিক সম্প্রদায় ধর্মে জৈন ছিল, তাহারা আমিষ আহার করিত না। অথচ মৎস্য মাংসের প্রতি চিত্রকের একটা প্রকৃতিগত আকর্ষণ ছিল, সে সুযোগ পাইলেই লুকাইয়া পশু মাংস আহার করিত। একদিন সে ধরা পড়িয়া গেল।

বণিক সম্প্রদায় তাহাকে বিদায় করিয়া দিল। চিত্রকের দেশ নাই, আত্মীয় নাই—জগতে সে সম্পূর্ণ একাকী। এই সময় হইতে তাহার যোদ্ধজীবনের আরম্ভ। তাহার দেহ স্বভাবতই বলিষ্ঠ, সে সহজে অস্ত্রচালনা করিতে শিখিল। জগতে যাহার কেহ নাই সে আত্মনির্ভর হইতে শেখে, চিত্রক বুদ্ধি ও বাহুবল সম্বল করিয়া জীবনযুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

আর্যাবর্তে তখন সর্বত্রই যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছে। চিত্রক যখন যে পক্ষে পাইল যুদ্ধ করিল, কোনও রাষ্ট্রের প্রতি তাহার মমত্ব নাই, যেখানে অর্থলাভের সম্ভাবনা দেখিল সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইল। এক পক্ষের পরাজয়ে যুদ্ধ থামিয়া গেলে আবার নূতন যুদ্ধের অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এইভাবে তাহার জীবনের শেষ দশবর্ষ কাটিয়াছে। সৌবীর দেশে একটা অন্তঃকলহজাত ক্ষুদ্র যুদ্ধ মিটিয়া গেলে সে আবার ভাগ্য অন্বেষণে

বাহির হইয়াছিল। সৌবীর যুদ্ধে সে বিশেষ লাভবান হইতে পারে নাই, উপরন্তু তাহার অশ্বটি মরিয়াছিল। সেখান হইতে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে সে গান্ধার অঞ্চলে সমর-সম্ভাবনার জনশ্রুতি শুনিয়া সেই পথে যাত্রা করিয়াছিল। গান্ধারের পথ কিন্তু সরল নয়, গিরি-সঙ্কট-কুটিল অজ্ঞাত দেশের পাকচক্রে পথ হারাইয়া অবশেষে নিঃস্ব অবস্থায় সে বিটঙ্ক রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। তারপর সুগোপার জলসত্র হইতে আজিকার এই ঘটনাবহুল দিবসটি বিসর্পিল গতিতে অগ্রসর হইয়া শেষে এই অন্ধকার কূট কক্ষে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে।

মুদিত চক্ষে চিত্রক নিজ জীবন-কথা চিন্তা করিতেছিল, চিন্তার সূত্র মাঝে মাঝে ছিন্ন হইয়া যাইতেছিল, আবার যুক্ত হইয়া আপন পথে চলিতেছিল। ক্লান্ত দেহ যতই নিদ্রার অতলে ডুবিয়া যাইতে চাহিতেছিল, আজিকার বহু ঘটনাবিদ্ধ মন ততই সচেতন থাকিবার চেষ্টা করিতেছিল।

নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যে এইরূপ দ্বন্দ্ব চলিতেছে, এমন সময় চিত্রকের চেতনা সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল কে যেন অতি লঘু করস্পর্শে তাহার মুখে হাত বুলাইয়া দিল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে সে কাহাকেও দেখিতে পাইল না, প্রথমে মনে হইল হয়তো চর্মচটিকার পাখার স্পর্শ, ইহারা সূচীভেদ্য অন্ধকারে নিঃশব্দে উড়িয়া বেড়ায়, স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা বাধাবন্ধ অনুভব করিয়া গতি পরিবর্তন করিতে পারে। হয়তো চর্মচটিকাই হইবে।

কিন্তু যদি চর্মচটিকা না হয়? যদি জীবন্ত কোনও প্রাণীই না হয়? চিত্রকের মেরুযষ্টির ভিতর দিয়া একটা শিহরণ বহিয়া গেল। সে অন্ধকারে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সতর্কভাবে বসিয়া রহিল। আবার তাহার মুখের উপর লঘু করাঙ্গুলির স্পর্শ হইল, যেন কেহ অঙ্গুলির দ্বারা তাহার মুখাবয়ব অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিতেছে; তাহার গণ্ডে তীক্ষ্ণ নখের আঁচড় লাগিল। চিত্রক প্রস্তুত ছিল, সে ক্ষিপ্র হস্ত সঞ্চালনে

অদৃশ্য স্পর্শকারীকে ধরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুই ধরিতে পারিল না। যে স্পর্শ করিয়াছিল সে সরিয়া গিয়াছে। চিত্রক তখন উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'কে? কে তুমি?'

কয়েক মুহূর্ত পরে তাহার সম্মুখের অন্ধকারে গভীর নিশ্বাস পতনের শব্দ হইল। চিত্রকের সর্বাঙ্গের রোম কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে কম্পিতস্বরে বলিল—'কে তুমি? যদি মানুষ হও উত্তর দাও।' কিছুক্ষণ নীরব। তারপর অদূরে অস্ফুট শব্দ হইতে লাগিল। চিত্রক উৎকর্ণ হইয়া শুনিল। মানুষের কণ্ঠস্বরই বটে, কিন্তু শব্দগুলির কোনও অর্থ হয় না। যেন স্বপ্নের ঘোরে কেহ অস্পষ্ট অর্থহীন আকুতি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। মনুষ্য বুঝিয়া চিত্রক আবার স্বস্থ হইল। সে বলিল—'শব্দ শুনিয়া মনে হইতেছে তুমি মানুষ। স্পষ্ট করিয়া বল, কে তুমি।'

দীর্ঘকাল আর কোনও শব্দ নাই। চিত্রকের মনে হইল, সে বুঝি কল্পনায় শব্দ শুনিয়াছিল, সমস্তই এই কুহকময় অন্ধকারের ছলনা। তাহার স্নায়ুপেশী আবার শক্ত হইতে লাগিল। এ কিরূপ মায়া? অলৌকিক মায়া?

'আমি বন্দিনী......বন্দিনী......'

না, মানুষের কণ্ঠস্বর—ছলনা নয়। কথাগুলি অতি দ্বিধাভরে কথিত হইলেও স্পষ্ট। বক্তা যেন আরও নিকটে আসিয়াছে।

চিত্রক বলিল—'বন্দিনী? তুমি নারী?'

'হাঁ।'

'নিশ্চিন্ত হইলাম। ভাবিয়াছিলাম তুমি প্রেতযোনি।'

'তুমি কে?'

চিত্রক হাসিল—'আমিও বন্দী। তুমি কতদিন বন্দী আছ?'

'কতদিন—জানিনা। এখানে দিন রাত্রি নাই, মাস বর্ষ নাই—' কণ্ঠস্বর মিলাইয়া গেল।

চিত্রক বলিল—'তুমি আমার কাছে এস। ভয় নাই, আমি তোমার অনিষ্ট করিব না।'

কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন হইল—'তুমি কি হূণ?'

'না, আমি আর্য।'

তখন অদৃশ্য রমণী কাছে আসিয়া চিত্রকের জানুর উপর হাত রাখিল, চিত্রক তাহার হস্ত স্পর্শ করিয়া দেখিল, কঙ্কালসার হস্ত, শীর্ণ অঙ্গুলির প্রান্তে দীর্ঘ নখ। তাহার জানুর উপর হস্তটি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। চিত্রক বলিল—'উপবিষ্ট হও। আমাকে ভয় করিও না, আমিও তোমারই মত অসহায়। মনে হয় দীর্ঘকাল বন্দিনী আছ। তুমি অন্ধকারে দেখিতে পাও?'

'অল্প।'

'তোমার বয়স কত?

এতক্ষণে রমণী যেন অনেকটা সাহস পাইয়াছে, সে সোপানের উপর উপবেশন করিল। যখন কথা কহিল তখন তাহার কথা আরও স্পষ্ট ও সুসংলগ্ন শুনাইল। যেন সে দীর্ঘকাল কথা না বলিয়া কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, আবার ক্রমশঃ সুসঙ্গত বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইতেছে।

রমণী বলিল—'আমার বয়স কত জানিনা। যখন বন্দিনী হই তখন কুড়ি বছর বয়স ছিল।'

'কে তোমাকে বন্দিনী করিয়াছিল?

'হূণ।'

'হূণ? কোন্ হূণ?'

রমণী থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিল—'একটা কদাকার খর্বকায় হূণ। রাজপুরী হূণেরা আক্রমণ করিয়াছিল। আমি ছিলাম রাজপুত্রের ধাত্রী······আমি রাজপুত্রকে স্তন্যপান করাইতেছিলাম এমন সময় হূণেরা রাজ-অবরোধে প্রবেশ করিল······তাহারা রাজপুত্রকে আমার কোল

হইতে কাড়িয়া লইয়া তলোয়ারের উপর লোফালুফি করিতে লাগিল......
একটা কদাকার হূণ আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিল......'

'সর্বনাশ! এ যে পঁচিশ বছর আগের কথা! তুমি পঁচিশ বছর বন্দিনী আছ?'

'পঁচিশ বছর?......তা জানিনা।......কদাকার হূণটা আমাকে টানিতে টানিতে তোরণের স্তম্ভ গৃহে লইয়া আসিল......নির্জন স্তম্ভগৃহে আমি তাহার হাত ছাড়াইবার অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু......স্তম্ভগৃহের দেয়ালে একটা গুপ্তদ্বার ছিল, কেমন করিয়া খুলিয়া গিয়াছিল ......হূণটা আমাকে এই অন্ধকারে ঠেলিয়া দিয়া গুপ্তদ্বার বন্ধ করিয়া দিল—'

'তারপর?'

'তারপর আর জানিনা......সেই অবধি এই রন্ধ্রের মধ্যে আছি। রন্ধ্র বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু বাহির হইবার পথ নাই......সেই হূণটা মাঝে মাঝে খাদ্য ফেলিয়া দিয়া যায়, তাহাই খাই ......হূণটা আমাকে অন্ধকারে দেখিতে পায় না তাই ধরিবার চেষ্টা করে না—'

চিত্রক পূর্বে মোঙের কাহিনীর কিছু অংশ শুনিয়াছিল, এখন রমণীর বৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে পঁচিশ বৎসর পূর্বের হূণ উৎপাতের চিত্র যেন অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইল। রমণীর জন্য তাহার অন্তরে সমবেদনার উদয় হইল, সে অন্ধকারে তাহার হস্তে হস্ত রাখিয়া বলিল—'হতভাগিনী! তোমার স্বজন কি কেহ ছিল?'

রমণী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

'স্বামী ছিল—একটি কন্যা ছিল—'

'হয়তো তাহারা বাঁচিয়া আছে। কাল প্রাতে আমি বাহির হইব। যদি প্রাণে বাঁচি তোমার উদ্ধারের চেষ্টা করিব। তোমার নাম কি?'

'পৃথা।'

'ভাল, পৃথা, আমি এবার একটু নিদ্রা দিব, রাত্রি বোধ হয় প্রভাত

হইতে চলিল। কাল প্রাতে সম্ভবত শূলেই চড়িতে হইবে ; কিন্তু একটা উপায় চিন্তা করিয়াছি, হয়তো রক্ষা পাইতেও পারি।'

'তুমি কে, তাহা তো বলিলে না।'

'আমি চোর। তুমি কি রাত্রে ঘুমাও না?'

'কখন্ ঘুমাই কখন্ জাগিয়া থাকি বুঝিতে পারি না। তুমি ঘুমাও, আমি জাগিয়া থাকিব।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মুক্তি

চোর ধরার উত্তেজনায় সুগোপার রাত্রে ঘুম হয় নাই। ভোর হইতে না হইতে সে রাজপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজকুমারী রট্টা তখনও শয্যা ত্যাগ করেন নাই ; শয়ন মন্দিরের দ্বারে যবনী প্রতীহারীর পাহারা। সুগোপা কিন্তু যবনীর নিষেধ মানিল না, শয্যাপাশে উপস্থিত হইয়া ডাকিল—'সখি ওঠ ওঠ, অশ্বচোর ধরা পড়িয়াছে।'

রাজকুমারীর চক্ষু দুটি খুলিয়া গেল ; যেন দুইটি খঞ্জন একসঙ্গে নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—'দূর হ' প্রেতিনী! কী সুন্দর স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, তুই ভাঙ্গিয়া দিলি।'

সুগোপা পালঙ্কের পাশে বসিয়া বলিল—'ওমা, কি স্বপ্ন দেখিলে? ভোরের স্বপ্ন সত্য হয়। বল বল শুনি।'

রট্টা বলিলেন—'কমল সরোবরে এক হস্তী ক্রীড়া করিতেছিল ; আমি তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে হস্তী আমাকে দেখিতে পাইল ; তখন সে সরোবরের মধ্যস্থল হইতে একটি রক্তকমল শুণ্ডে তুলিয়া আমার দিকে আসিতে লাগিল। আমি অঞ্জলি বাঁধিয়া হাত বাড়াইলাম ;

হস্তী তীরের নিকটে আসিয়া কমলটি আমার হাতে দিতে যাইবে, এমন সময় তুই ঘুম ভাঙ্গিয়া দিলি।'

সুগোপা বলিল—'ভাল স্বপ্ন। গ্রহাচার্য ঠাকুরের নিকট ইহার অর্থ জানিয়া লইতে হইবে। এখন ওঠ, চোর দেখিবে না?'

আলস্য ত্যাগের ভঙ্গিমায় দেহটি লীলায়িত করিয়া রট্টা উঠিলেন। চোর দেখিবার কৌতূহল নাই এমন মানুষ বিরল, তা তিনি রাজকন্যাই হোন আর মালাকর-বধূই হোন। তবু রট্টা পরিহাসচ্ছলে বলিলেন—'তোর চোর তুই দেখ না, আমি দেখিয়া কি করিব?'

সুগোপা বলিল—'ধন্য! চোর তোমার ঘোড়া চুরি করিল, তবে সে আমার চোর হইল কিরূপে?'

রট্টা বলিলেন 'তুই চোরের চিন্তায় রাত্রে ঘুমাইতে পারিস নাই, সাত সকালে আসিয়া আমার ঘুম ভাঙ্গাইলি। নিশ্চয় তোর চোর।'

সহাস্য মুখে রট্টা স্নানাগারের অভিমুখে চলিলেন। সুগোপাও রঙ্গ পরিহাস করিতে করিতে, গত রাত্রির চোর ধরার কাহিনী শুনাইতে শুনাইতে তাঁহার সঙ্গিনী হইল।

সূর্যোদয়ের দণ্ড দুই পরে রাজকীয় সভাগৃহে কিছু জনসমাগম হইয়াছিল। রাজার অনুপস্থিতিতে রাজসভার অধিবেশন হয় না, মন্ত্রিগণ স্ব স্ব গৃহে থাকিয়া রাজকার্য পরিচালনা করেন, তাই রাজসভা শূন্যই থাকে। কিন্তু আজ কোট্টপাল মহাশয় প্রাতেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে কয়েকটি সশস্ত্র অনুচর। তদ্ব্যতীত পুরীর কয়েকজন দৌবারিক ও প্রতীহার আছে। অবরোধের কঞ্চুকীও চোরের খবর পাইয়া আসিয়া জুটিয়াছে। মন্ত্রীরা বোধ করি চোর ধৃত হওয়ার সংবাদ এখনও পান নাই, তাই আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই।

রাজকুমারী রট্টা সভায় আসিলেন, সঙ্গে সখী সুগোপা। রট্টার পরিধানে হরিতালবর্ণ ক্ষৌমবস্ত্র, বক্ষে দূর্বাহরিৎ কঞ্চুলী, কেশ কুণ্ডলীর

মধ্যে শ্বেত কুরুবকের নব-মুকুল চন্দ্রকলার ন্যায় জাগিয়া আছে—যেন সাক্ষাৎ বসন্তের জয়শ্রী। রট্টা আসিয়া সিংহাসনের পাদপীঠে বসিলেন। সুগোপা তাঁর পায়ের কাছে বসিল।

অভিবাদন শেষ হইলে রট্টা চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন—'চোর কোথায়?'

কোট্টপালের ইঙ্গিত পাইয়া তাঁহার দুইজন অনুচর বাহিরে গেল; অল্পকাল পরে বদ্ধহস্ত চোরকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। তাহাদের পিছনে গত রাত্রির তোরণ-প্রতিহার ও যামিক-রক্ষিদ্বয়ও আসিল।

চোরকে সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড় করানো হইল।

রট্টা স্থিরদৃষ্টিতে চোরকে নিরীক্ষণ করিলেন। সুগোপা তাঁহার কানে কানে প্রশ্ন করিল—'চিনিতে পারিয়াছ?'

রট্টা বলিলেন—'হাঁ, চিনিয়াছি। কল্য জলসত্রে এই ব্যক্তিই আমার অশ্ব চুরি করিয়া পলাইয়াছিল। অশ্বচোর, তোমার কিছু বলিবার আছে?'

চিত্রক এতক্ষণ সংযতভাবে দাঁড়াইয়া রাজকন্যার পানে চাহিয়া ছিল। রাত্রে অন্ধকূপ বাসের ফলে তাহার বস্ত্রাদি কিছু বিস্রস্ত ও মলিন হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাহার হাবভাব দেখিয়া তাহাকে তস্কর বলিয়া মনে হয় না। বরং কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অকারণে অপদস্থ হইলে যেরূপ ভর্ৎসনাপূর্ণ গাম্ভীর্যের ভাব ধারণ করেন, তাহার মুখভাব সেইরূপ। সে একবার শান্ত অথচ অপ্রসন্ননেত্রে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—'এ আমি কোথায় আনীত হইয়াছি জানিতে পারি কি?'

কোট্টপাল চোরের ভাবভঙ্গী দেখিয়া উষ্ণ হইয়া উঠিলেন, কঠোরকণ্ঠে বলিলেন—'রাজসভায় আনীত হইয়াছ। তুমি রাজকন্যার অশ্ব চুরি করিয়াছিলে সেজন্য তোমার দণ্ড হইবে। এখন কুমারীর কথার উত্তর দাও; তোমার কিছু বলিবার আছে?'

চিত্রক তেমনই ধীরস্বরে বলিল—'আছে। ইহা কি দণ্ডাধিকরণ? বিচার-গৃহ?'

কোট্টপাল বলিলেন—'না। তোমার বিচার যথাসময় হইবে। এখন প্রশ্নের উত্তর দাও—কী জন্য অশ্ব চুরি করিয়াছিলে?'

চিত্রক কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে রট্টার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর গম্ভীর স্বরে বলিল—'আমি অশ্ব চুরি করি নাই, রাজকার্যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলাম মাত্র।'

সভাস্থ সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। চোর বলে কি? কোট্টপাল মহাশয়ের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; চোরের এমন ধৃষ্টতা? রট্টার চোখেও সবিস্ময় রোষের বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইয়া উঠিল; তিনি ঈষৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিলেন—'তুমি বিদেশী মনে হইতেছে। তোমার পরিচয় কি?'

চিত্রক রাজকুমারীর রোষ দৃষ্টির সম্মুখে কিছুমাত্র অবনমিত না হইয়া অকম্পিতস্বরে বলিল—'আমি মগধের দূত, পরম ভট্টারক পরমেশ্বর মহারাজ স্কন্দগুপ্তের সন্দেশবহ।'

সভাস্থ কাহারও মুখে আর কথা রহিল না; সকলে ফ্যালফ্যাল করিয়া ইতি-উতি চাহিতে লাগিল। মগধের দূত! স্কন্দগুপ্তের বার্তাবাহক! স্কন্দগুপ্তের নামে হৃৎকম্প উপস্থিত হইত না এমন মানুষ তখন আর্যাবর্তে অল্পই ছিল। সেই স্কন্দগুপ্তের দূতকে চোর বলিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে।

কোট্টপাল মহাশয় হতভম্ব। রাজকুমারী রট্টার চোখে চকিত জিজ্ঞাসা। সুগোপার মুখ শুষ্ক। সকলে চিত্রার্পিতবৎ নিশ্চল।

এই চিত্রার্পিত অবস্থা কতক্ষণ চলিত বলা যায় না; কিন্তু ভাগ্যক্রমে এই সময় রাজ্যের মহাসচিব চতুরানন ভট্ট দেখা দিলেন। চতুরানন বর্ণে ব্রাহ্মণ; চতুর স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি। তৎকালে ভারতভূমিতে বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বহু জাতীয় এবং বহু ধর্মীয় রাজা রাজত্ব করিতেন; উত্তরে শক হূণ ছিল,

দক্ষিণে দ্রাবিড় গুর্জর ছিল। কিন্তু মন্ত্রিত্ব করার বেলায় দেখা যাইত একটি ক্ষীণকায় উপবীতধারী ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর আসনটি অধিকার করিয়া আছেন।

সচিব চতুরানন সভায় প্রবেশ করিয়া কঞ্চুকী মহাশয়কে সংক্ষেপে দুই চারি প্রশ্ন করিয়া ব্যাপার বুঝিয়া লইলেন। তারপর সভার মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রথমে হস্ত তুলিয়া রাজকুমারীকে আশীর্ব্বাদপূর্বক তিনি বন্দীর দিকে ফিরিলেন। চতুরানন ভট্টের চোখের দৃষ্টি ক্ষিপ্র এবং মসৃণ, কোথাও বাধা পায় না। চিত্রকের আপাদমস্তক নিমেষ মধ্যে দেখিয়া লইয়া তিনি আদেশ দিলেন, 'হস্তবন্ধন খুলিয়া দাও।'

এতক্ষণ কে কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না, এখন যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। কোট্টপাল মহাশয় স্বয়ং চিত্রকের বন্ধন খুলিয়া দিলেন।

চতুরানন ভট্ট তখন স্মিতমুখে সুমিষ্ট স্বরে চিত্রককে সম্বোধন করিলেন—'আপনি মগধের রাজদূত?'

চিত্রক এই মসৃণ-চক্ষু মৃদুবাক্ প্রৌঢ়কে দেখিয়া মনে মনে সতর্ক হইয়াছিল, বলিল—'হাঁ। আপনি?'

চতুরানন বলিলেন—'আমি এ রাজ্যের সচিব। মহাশয়ের নাম? মহাশয়ের অভিজ্ঞান?'

মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরী তর্জনী হইতে উন্মোচন করিতে করিতে চিত্রক তড়িৎবৎ চিন্তা করিল, রাজলিপিতে ... ও আছে কি? যতদূর স্মরণ হয়—নাই। সে বলিল— ... না।'

চতুরানন একটু ভ্রূ তুলিলেন—' ... দৌত্য কার্যে সাধারণত ব্রাহ্মণ নিয়োগই বিধি।

চিত্রক বলিল—'হাঁ। এই দেখুন ...

অভিজ্ঞান দেখিয়া চতুরাননের চক্ষে সম্ভ্রম ফুটিয়া উঠিল। তিনি হস্তদ্বয় পরস্পর ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন—'দূত মহাশয়, আপনি স্বাগত। দেখিতেছি উভয় পক্ষেই একটু ভুল হইয়া গিয়াছে। আপনি না বলিয়া অশ্বটি গ্রহণ না করিলেই পারিতেন—রাজকুমারীর অশ্ব—'

চিত্রক স্মিত হাস্য করিয়া রট্টার পানে আয়ত নয়ন ফিরাইল, বলিল—'রাজকুমারীর অশ্ব তাহা আমি অনুমান করিতে পারি নাই।'

এই বাক্যের মধ্যে কতখানি প্রগল্ভতা এবং কতখানি আত্মসমর্থন ছিল তাহা ঠিক ধরা গেল না, কিন্তু রট্টা চিত্রকের চক্ষু হইতে চক্ষু সরাইয়া লইয়া মনে মনে ভাবিলেন, এই দূতের বাক্‌পটিমা আছে বটে, অল্প কথা বলিয়া অনেক কথার ইঙ্গিত করিতে পারে!

চতুরানন বলিলেন—'অবশ্য অবশ্য। তারপর গত রাত্রেও যদি আপনি নিজ পরিচয় দিতেন—'

চিত্রক বলিল—'কাহার কাছে পরিচয় দিব? যামিক রক্ষীর কাছে? তোরণ প্রতীহারের কাছে?'

চতুরানন চিত্রকের মুখের উপর পিচ্ছিল দৃষ্টি বুলাইয়া একটি নিশ্বাস ফেলিলেন—'যাক, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে—নির্বাণ দীপে কিম্ তৈলদানম্। এখন আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু তৎপূর্বে, আপনি যে রাজবার্তার বাহক তাহা কোথায়?'

চিত্রক বলিল—'সম্ভবত আমার থলিতে আছে, যদি না আপনার যামিক-রক্ষীরা ইতিপূর্বে উহা আত্মসাৎ করিয়া থাকে—'

যামিক-রক্ষীরা সভার পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত ছিল, তাহারা সবেগে সমস্ত আন্দোলন করিয়া এরূপ অবৈধ তস্করবৃত্তির অভিযোগ অস্বীকার করিল। চিত্রক তখন থলি খুলিয়া দেখিল, লিপি আছে। সে সযত্নে লিপি-কুণ্ডলী বাহির করিয়া একটু ইতস্তত করিল—'রাজলিপি কিন্তু রাজার হস্তে দেওয়াই বিধি।'

মন্ত্রী বলিলেন—'সে কথা যথার্থ। কিন্তু মহারাজ এখন রাজধানীতে উপস্থিত নাই—রাজকন্যাই তাঁহার প্রতিভূ। আপনি দেবদুহিতার হস্তে পত্র দিতে পারেন।'

চিত্রক তখন দুই পদ অগ্রসর হইয়া যুক্তহস্তে লিপি রাজকুমারীর হস্তে অর্পণ করিল।

পত্র লইয়া রট্টা ক্ষণকাল দ্বিধাভরে রহিলেন, তারপর ঈষৎ হাসিয়া লিপি-কুণ্ডলী মন্ত্রীর হাতে দিলেন। তাহার অর্থ—রাজনীতির বিধি তো পালিত হইয়াছে, এখন যাহার কর্ম সে করুক।

লিপি হস্তে লইয়া মন্ত্রী চতুরানন কিন্তু চমকিয়া উঠিলেন, 'একি! লিপির জতুমুদ্রা ভগ্ন দেখিতেছি!' তিনি তীক্ষ্ণ সন্দেহে চিত্রকের পানে চাহিলেন।

চিত্রক তখন কৌতুকের কণ্ঠে বলিল—'কাল রাত্রে আপনার ধার্মিক রক্ষীরা আমার সহিত কিঞ্চিৎ মল্লযুদ্ধ করিয়াছিল, হয়তো সেই সময় জতুমুদ্রা ভাঙিয়া থাকিবে।'

কথাটা অসত্য নয়, কিন্তু মন্ত্রীর সংশয় দূর হইল না। তিনি ধার্মিক রক্ষাদের পানে চাহিলেন, ধার্মিক রক্ষীরা মস্তক অবনত করিয়া স্বীকার করিল, মল্লযুদ্ধ একটা হইয়াছিল বটে।

চিত্রক মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল—'আমার দৌত্য শেষ হইয়াছে। এবার অনুমতি করুন আমি বিদায় হই।'

চতুরানন বলিলেন—'সে কি কথা। আপনি মগধের রাজদূত, এতদূর আসিয়াছেন, এখনি ফিরিয়া যাইবেন? ভাল কথা, আপনার সঙ্গী-সাথী কি কেহই নাই?'

চিত্রক নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'যখন যাত্রা করিয়াছিলাম তখন তিনজন সঙ্গী ছিল, পথে নানা দুর্ঘটনায় তাহাদের হারাইয়াছি—অশ্বও গিয়াছে। এদিকে পথ বড় জটিল ও বিপদসঙ্কুল।—যাক, এবার আজ্ঞা দিন।' বলিয়া রট্টার দিকে চক্ষু ফিরাইল।

রট্টা কিছু বলিবার পূর্বেই মন্ত্রী বলিয়া উঠিলেন—'কিন্তু এখনি আপনার দৌত্য শেষ হয় নাই, আপনি যাইবেন কি প্রকারে? পত্রের উত্তর—'

চিত্রক দৃঢ়স্বরে বলিল—'পত্রের উত্তর সম্বন্ধে আমার কোনও কর্তব্য নাই। আমি শ্রীমন্মহারাজের পত্র আপনাদের অর্পণ করিয়াছি, আমার দায়িত্ব শেষ হইযাছে।' বলিযা অনুমতির অপেক্ষায় আবার রট্টার পানে চাহিল।

এবার রট্টা কথা বলিলেন, ধীর প্রশান্ত স্বরে কহিলেন—'দূত মহাশয়, বিটঙ্করাজ্যে আসিয়া আপনার কিছু নিগ্রহ ভোগ হইয়াছে। নিগ্রহ অনিচ্ছাকৃত হইলেও আপনি ক্লেশ পাইয়াছেন। কিন্তু অতিথি-নিগ্রহ বিটঙ্ক দেশের স্বভাব নয়। আপনি কিছুদিন রাজ-আতিথ্য স্বীকার করিলে আমরা তৃপ্ত হইব।'

চিত্রক এতক্ষণ পলায়নের একটা ছিদ্র খুঁজিতেছিল। 'বটঙ্করাজ্য তাহার পক্ষে নিরাপদ নয়। সে বুঝিয়াছিল, কূটবুদ্ধি মন্ত্রী তাহার দৌত্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন নাই। উপরন্তু শশিশেখর যে-কোনও মুহূর্তে আসিযা হাজির হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় যত শীঘ্র এ রাজ্য ত্যাগ করা যায় ততই মঙ্গল। এতক্ষণ চিত্রক সেই চেষ্টাই করিতেছিল। কিন্তু এখন রাজকুমারী রট্টার কথা শুনিয়া সহসা তাহার মনের পরিবর্তন হইল। কুমারী রট্টার দিক্-আলোকরা রূপের ছটায়, তাঁহার প্রশান্ত গম্ভীর বাচন-ভঙ্গিমায় এমন কিছু ছিল যে চিত্রকের মন হইতে পলায়ন-স্পৃহা তিরোহিত হইয়া পৌরুষপূর্ণ হঠকারিতা জাগিয়া উঠিল। সে ভাবিল, বিপদের মুখে পলাইব কেন? দেখাই যাক না, চপলা ভাগ্যদূতী কোন পথে লইয়া যায়। জীবনের সকল পথের শেষেই তো মৃত্যু, তবে ভীরুর মতো পলাইব কেন?

সে যুক্তকরে শির নমিত করিয়া বলিল—'দেবদুহিতার যেরূপ আদেশ।'

রট্টার মুখের প্রসন্নতা আরও পরিস্ফুট হইল, তিনি মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'আর্য চতুর ভট্ট, দূত মহাশয়ের স্থান ব্যবস্থা করুন।'

চতুর ভট্ট এবার একটু বিপন্ন হইলেন। গত পঁচিশ বৎসরে বিটঙ্ক-রাজ্যে পররাষ্ট্রের কোনও দূত আসে নাই, তাই রাজ্যে দূতাবাসের কোনও পাকা ব্যবস্থা নাই। কদাচিৎ মিত্ররাজ্য হইতে রাজকীয় অতিথি আসিলে রাজপুরীর মধ্যে কোনও এক ভবনে তাঁহার স্থান হইয়াছে। কিন্তু এই দূতটিকে কোথায় রাখা যায়! মগধের দূতকে ভালভাবেই রাখিতে হয়, নগরের পান্থশালায় স্থান নির্দেশ করা চলে না। স্কন্দগুপ্তের পত্রে কী আছে তাহা এখনও দেখা হয় নাই, এতদিন পরে মগধ কি বিটঙ্করাজ্যের উপর একটা অধিকার দাবী করিতে চায় নাকি? সে যাহোক পরে দেখা যাইবে, এখন দূতটাকে কোথায় রাখা যায়? দূতের দূতীয়ালিতে কোথায় যেন একটা গলদ রহিয়াছে—বিদায় লইবার জন্য এত ব্যগ্র কেন? উহাকে সহজে দৃষ্টিবহির্ভূত করা হইবে না—

চক্ষু অর্ধমুদিত করিয়া চতুর ভট্ট চিন্তা করিলেন, তারপর নিম্নস্বরে কঞ্চুকীর সহিত আলাপ করিলেন। তাঁহার ভ্রূযুগলের বক্রতা অপনীত হইল। তিনি বলিলেন—'মগধের রাজদূতের জন্য যথোচিত সম্মানের স্থান নির্দিষ্ট হইবে, রাজপুরীর মধ্যেই তিনি অবস্থান করিবেন। সুবিধা হইয়াছে, মহারাজের সন্নিধাতা হর্ষ মহারাজের সঙ্গে চষ্টনদুর্গে গিয়াছে, হর্ষের স্থান শূন্য আছে। দূত মহোদয় সেই স্থানেই থাকিবেন।'

এই ব্যবস্থায় সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। রাজপুরীতে স্থান দিয়া মগধ-দূতকে সম্মান দেখানো হইল, অপিচ সন্নিধাতার অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট পর্যায়ে স্থান দিয়া অধিক সম্মান দেখানো হইল না। চতুর ভট্ট সুখী হইলেন, দূত রাজপুরীর প্রাকার মধ্যে রহিল, ইচ্ছা করিলেও পলাইতে পারিবে না।

কঞ্চুকীর দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন—'লক্ষ্মণ, তোমার উপর

দূতপ্রবরের সেবার ভার রহিল। এখন তাঁহাকে বিশ্রাম মন্দিরে লইয়া যাও।' বলিয়া অর্থপূর্ণ ভাবে কঞ্চুকীর পানে চাহিলেন।

লক্ষ্মণ কঞ্চুকী চতুর ভট্টের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়াছিল। সে চিত্রকের নিকটে আসিয়া বহু সমাদর সহকারে তাহাকে বিশ্রাম মন্দিরে আহ্বান করিল।

চিত্রক রাজকুমারীকে যুক্তকরে অভিবাদন করিয়া কঞ্চুকীর অনুবর্তন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সহসা একটা কথা স্মরণ হওয়ায় সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল—'দেবদুহিতাকে একটি সংবাদ জানাইতে ইচ্ছা করি। গত রাত্রে আমি যে অন্ধকূপে বন্দী ছিলাম সেখানে একটি স্ত্রীলোক বন্দিনী আছে।'

রট্টা নেত্র বিস্ফারিত করিয়া চাহিলেন—'স্ত্রীলোক!'

'হাঁ। বন্দিনীর নাম পৃথা।'

সুগোপা রট্টার পদমূলে বসিয়া শুনিতেছিল, সে চমকিয়া উঠিল—পৃথা!

চিত্রক বলিল—'হতভাগিনী পঁচিশ বৎসর ঐ কারাকূপে বন্দিনী আছে। যখন প্রথম হূণ অভিযান হয় তখন পৃথা পূর্বতন রাজপুরের ধাত্রী ছিল—এক হূণ যোদ্ধা তাহাকে বলাৎকার পূর্বক ঐ স্থানে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছিল—'

সুগোপা ছিন্নজ্যা ধনুর ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—'আমার মা! আমার মা—!'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাজপুরীতে

রাজপুরীর প্রাকার-বেষ্টনীর মধ্যে অনেকগুলি প্রাসাদ আছে; কোনটি সভাগৃহ, কোনটি কোষাগার, কোনটি মন্ত্রণাভবন; একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। রাজকন্যা যে প্রাসাদে বাস করেন তাহা অবরোধ; তাহার পাশে রাজার জন্য পৃথক ভবন। উভয় প্রাসাদের মধ্যে অলিন্দের সংযোগ: উভয় প্রাসাদ ত্রিভূমক।

রাজপ্রাসাদের নিম্নতলে এক পাশের কয়েকটি কক্ষ লইয়া সন্নিধাতা হর্যের বাসস্থান। রাজ বৈভবের তুলনায় ইহা অপকৃষ্ট হইলেও সাধারণ মানুষের পক্ষে ঐশ্বর্যের চূড়ান্ত। কঞ্চুকী লক্ষ্মণ চিত্রককে এইখানে আনিয়া অধিষ্ঠিত করিল।

চিত্রক হৃষ্ট মনে আসন পরিগ্রহ করিতে না করিতে কঞ্চুকীর ইঙ্গিতে কয়েকটা অসুরাকৃতি সম্বাহক আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং তাহাকে প্রায় উলঙ্গ করিয়া সর্বাঙ্গে সবেগে তৈলমর্দন করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। ইহা রাজকীয় সমাদরের প্রথম প্রবন্ধ।

অতঃপর চিত্রক শীতল জলে স্নান করিয়া নববস্ত্র পরিধান করিল; অঙ্গে চন্দন প্রলেপ দিয়া আহারে বসিল। প্রচুর পিষ্টক পৌলিক মোদক পরমান্নের আয়োজন, তদুপরি কঞ্চুকীর সবিনয় নির্বন্ধ। চিত্রক আকণ্ঠ ভরিয়া ভোজন করিল।

তারপর শরতের মেঘশুভ্র শয্যায় শয়ন। দুইজন নহাপিত আসিয়া অতি আরামদায়ক ভাবে হস্তপদ টিপিয়া দিতে লাগিল। এই আলস্যসুখ মুদিতচক্ষে উপভোগ করিতে করিতে, পুরুষ ভাগ্যের বিচিত্র ভুজঙ্গ-গতির কথা চিন্তা করিতে করিতে চিত্রক ঘুমাইয়া পড়িল।

ওদিকে সচিব চতুরানন ভট্ট মগধের লিপি পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার আশঙ্কা মিথ্যা হয় নাই, রাষ্ট্রনৈতিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন না করিয়া যতখানি রূঢ়তা প্রকাশ করা যাইতে পারে ততখানি রূঢ়তার সহিত লিপিতে বিটঙ্করাজ্যের উপর নির্দেশ প্রেরিত হইয়াছে—বিটঙ্করাজ অচিরাৎ মগধের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া বকেয়া রাজস্ব অর্পণ করুন, নচেৎ হূণহরিণকেশরী সম্রাট স্কন্দগুপ্ত স্বয়ং সসৈন্যে গান্ধার অভিমুখে যাইতেছেন, ইত্যাদি।

পত্র পাঠ করিয়া চতুর ভট্ট দীর্ঘকাল গভীর চিন্তায় মগ্ন রহিলেন তারপর অন্য সচিবদের ডাকিয়া মন্ত্রণায় বসিলেন। শ্যেনপক্ষীর সহিত চটকের প্রতিস্পর্ধিতা সম্ভব নয়, চটকের পক্ষে হিতকরও নয়। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে বাহুবলই সর্বস্ব নয়, কূটনীতিও আছে। স্কন্দগুপ্ত নূতন হূণ অভিযান প্রতিরোধ করিবার জন্য গান্ধারে আসিতেছেন, ঘোর যুদ্ধ বাধিবে, দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ চলিবে, শেষ পর্যন্ত ফলাফল কিরূপ দাঁড়াইবে কিছুই বলা যায় না। সুতরাং অবিলম্বে মগধের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া ছলছুতা দ্বারা যদি কালহরণ করা যায়, হয়তো অন্তে সুফল ফলিতে পারে। একদিকে হূণ, অন্য দিকে স্কন্দগুপ্ত, এ অবস্থায় যথাসাধ্য নিরপেক্ষতা অবলম্বনই যুক্তি।

সচিবগণ একমত হইয়া মনস্থ করিলেন, পত্রের উত্তর দানে যথাসম্ভব বিলম্ব করা হোক, দূতটাকে বলা যাক, মহারাজ কপোতকূটে যতদিন না ফিরেন ততদিন পত্রের উত্তর দান সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে মহারাজ রোট্টকে সব কথা জানাইয়া বার্তা প্রেরণ করা আবশ্যক। তিনি এখন চষ্টনদুর্গেই থাকুন, রাজধানীতে ফিরিবার কোনও তাড়া নাই। কিন্তু এত বড় গুরুতর সংবাদ তাঁহার গোচর করা সর্বাগ্রে কর্তব্য।

এইরূপ মনোনীত হইলে পর ত্বরিতগতি তুরঙ্গপৃষ্ঠে চষ্টনদুর্গে বার্তাবহ প্রেরিত হইল।

মন্ত্রগৃহে যখন এই সকল রাজকার্য চলিতেছিল, কুমারী রট্টা তখন নিজ ভবনে ছিলেন। আজ নানা কারণে তাঁহার মন কিছু উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল। প্রথমেই স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে জাগরণ; তারপর চৌর ঘটিত ব্যাপারের অদ্ভুত পরিসমাপ্তি। মগধের দূত···মগধ·····বিশ্ববিশ্রুত পাটলিপুত্র নগর····· দিগ্বিজয়ী বীর স্কন্দগুপ্ত······দূত নিজের কী নাম বলিয়াছিল? চিত্রক বর্মা! চিত্রক··· চিত্র ব্যাঘ্র··· ব্যাঘ্রের সহিত কোথাও যেন সাদৃশ্য আছে··· চোখের দৃষ্টি বড় নির্ভীক···

সর্বশেষে সুগোপার মাতার উদ্ধার। সুগোপার মাতা প্রাক্তন রাজপুত্রের ধাত্রী ছিল, কুমারী রট্টা তাহা জানিতেন। অভাগিনীর এই দুর্দশা হইয়াছিল? সকলের অজ্ঞাতে পঁচিশ বৎসর বন্দিনী ছিল! কেমন করিয়া বাঁচিয়া ছিল; কে তাহাকে আহার দিত? পৃথার দুরদৃষ্টের কথা ভাবিয়া রট্টার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িল। উঃ, পঁচিশ বৎসর পূর্বে হূণেরা কি বর্বরতাই না করিয়াছিল। রট্টা হূণ-দুহিতা, তবু—

সুগোপা মাতাকে উদ্ধার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে লইয়া গিয়াছিল। সুগোপা বড় কান্না কাঁদিয়াছিল, স্মরণ করিয়া রট্টার চোখেও জল আসিল। তাঁহার ইচ্ছা হইল সুগোপার গৃহে গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসেন। সুগোপার গৃহে তিনি বহুবার গিয়াছেন, এখন ইচ্ছা গিয়াছেন। কিন্তু আজ যাইতে তাঁহার সঙ্কোচ বোধ হইল। প্রিয়সখি সুগোপা মৃতকল্পা মাতাকে পাইয়া তুমুল হৃদয়াবেগের আবর্তে নিমজ্জিত হইয়াছে, এখন রট্টা তাহার কাছে যাইলে সে বিভ্রান্ত হইবে, বিব্রত হইবে—

মধ্যাহ্ন অতীত হইবার পর রট্টা গ্রহাচার্যকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গ্রহাচার্য আসিলেন; স্বপ্ন-কথা শুনিয়া তিনি প্রশ্নগণনার আঁক কষিলেন, দিক্‌নির্ণয় করিলেন, লগ্ন নির্ধারণ করিলেন। তারপর ফলাদেশ করিলেন— 'কল্যাণি, তোমার জীবনের এক মহা সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। কিন্তু শঙ্কিত

হইও না ; অন্তে ফল শুভ হইবে। এক দিঙ্‌নাগ-সদৃশ মহা-তেজস্বী পুরুষের সহিত তোমার পরিচয় ঘটিবে ; এই পুরুষসিংহ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। তোমার বিবাহের কালও আসন্ন। শুভমস্তু।' গ্রহবিপ্রের ভাব গতিক দেখিয়া মনে হইল তিনি সব কথা খুলিয়া বলিলেন না, কিছু চাপিয়া গেলেন।

তিনি বিদায় হইলে রট্টা দীর্ঘকাল করলগ্ন কপোলে বসিয়া রহিলেন, শেষে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিলেন—নিয়তির বিধান যখন অখণ্ডনীয় তখন চিন্তা করিয়া লাভ কি ?

ক্রমে অপরাহ্ণ হইল।

ওদিকে চিত্রক দীর্ঘ দিবানিদ্রার পর জাগিয়া উঠিযাছে। শরীর বেশ স্বচ্ছন্দ ; গত কয়েকদিনের নানা ক্লেশজনিত গ্লানি আর নাই। তাহার মনেরও শরীরের অনুপাতে প্রফুল্ল হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু চিত্রক অনুভব করিল, তাহার মন প্রফুল্ল না হইয়া বরং ক্রমশ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছে।

রাজপুরীর আদর আপ্যায়নে সে অভ্যস্ত নয ; উপরন্তু কঞ্চুকী লক্ষ্মণ যেন একটু অধিক পরিচর্যা করিতেছে। সে দণ্ডে দণ্ডে আসিয়া চিত্রকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সন্দেশ লইতেছে ; তদুপরি তাহার কয়েকটা অনুচর সর্বদাই চিত্রককে বেষ্টন করিয়া আছে। কেহ ব্যজন করিতেছে, কেহ শীতল তক্র বা ফলাম্লরস আনিয়া সম্মুখে ধরিতেছে, কেহ বা তাম্বুল দিতেছে। মুহূর্তের জন্যও সে একাকী থাকিতে পাইতেছে না। তাহার সন্দেহ হইল, এই সাডম্বর আপ্যায়নের অন্তরালে অদৃশ্য জাল তাহাকে ঘিরিয়া বহিয়াছে। সে মনে মনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। হঠতাবশে রাজকুমারী রট্টার নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিলেই বোধ হয় ভাল হইত।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে চিত্রক মনে মনে একটি সঙ্কল্প স্থির করিয়া গাত্রোত্থান করিল। উত্তরীয় স্কন্ধে লইতেই এক কিঙ্কর যোড়হস্তে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল—'কি প্রয়োজন আদেশ করুন আর্য—আণবেতু।'

চিত্রক বলিল—'বহির্ভাগে পরিভ্রমণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। বায়ু সেবনের প্রয়োজন।'

কিঙ্কর পশ্চাৎপদ হইয়া অন্তর্হিত হইল।

চিত্রক রাজভবনের বাহিরে পদার্পণ করিয়াছে, কোথা হইতে কঞ্চুকী আসিয়া হাসিমুখে তাহার সহিত যোগ দিল। 'সায়ংকালে বায়ু সেবনের ইচ্ছা হইয়াছে? ভাল ভাল, চলুন আপনাকে রাজপুরী দেখাই।' বলিয়া লক্ষ্মণ কঞ্চুকী লক্ষ্মণ ভ্রাতার মতই তাহার সহগামী হইল।

দুইজন পুরভূমির যত্রতত্র বিচরণ করিতে লাগিল। চিত্রক বুঝিল পুরীর বাহিরে যাইবার চেষ্টা বৃথা, সে পুরপ্রাকারের বাহিরে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কঞ্চুকী হয়তো বাধা দিবে না, কিন্তু নিজে সঙ্গে থাকিবে। সুতরাং বাহিরে যাইবার আগ্রহ প্রকাশ না করাই ভাল।

বিস্তৃত পুরভূমির স্থানে স্থানে বৃক্ষ-বাটিকা, লতা-মণ্ডপ। মানুষ বেশী নাই; যাহারা আছে তাহারা অধিকাংশই সশস্ত্র প্রতীহার কিম্বা রক্ষী, দুই চারিজন উদ্যানপালও আছে। তাহারা সকলে নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত।

ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে চিত্রক অনুভব করিল, কঞ্চুকী ছাড়াও অন্য কেহ তাহার উপর লক্ষ্য রাখিয়াছে, নিজে অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাকে অনুসরণ করিতেছে। চিত্রক চকিতে কয়েকবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, কিন্তু সন্ধ্যার মন্দালোকে বিশেষ কিছু ঠাহর করিতে পারিল না।

তারপর এক বৃক্ষ বাটিকার নিকটে চিত্রক তাহার অদৃশ্য অনুসরণকারীকে মুখোমুখি দেখিতে পাইল। এক বৃক্ষের অন্তরাল হইতে একজোড়া ভয়ঙ্কর চক্ষু তাহার দিকে চাহিয়া আছে, হিংসাবিকৃত মুখে জ্বলন্ত দুটা চক্ষু। চিত্রক চমকিয়া বলিয়া উঠিল—'ও কে?' সঙ্গে সঙ্গে মূর্তি ছায়ার ন্যায় মিলাইয়া গেল।

কঞ্চুকী বলিল—'ও গুহ। আপনাকে নূতন মানুষ দেখিয়া বোধ হয় কৌতূহলী হইয়াছে।'

চিত্রকের গত রাত্রের কথা মনে পড়িল: হাঁ, সেই বটে। কিন্তু গত রাত্রে গুহর চোখে এমন তীব্র দৃষ্টি ছিল না। চিত্রক কঞ্চুকীকে প্রশ্ন করিলে কঞ্চুকী সংক্ষেপে পাগল গুহর বৃত্তান্ত বলিল। তখন চিত্রক, অন্ধকূপে পৃথার নিকট যে কাহিনী শুনিয়াছিল তাহার সহিত মিলাইয়া প্রকৃত ঘটনা অনেকটা অনুমান করিয়া লইল। গুহই পৃথাকে হরণ করিয়া কূটরন্ধ্রে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, ইচ্ছা ছিল যুদ্ধ শেষ হইলে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে দখল করিবে, কিন্তু মস্তকে আঘাত পাইয়া তাহার স্মৃতি ভ্রংশ হয়। তবু সে সব কথা ভোলে নাই; কোন অর্ধ-বিভ্রান্ত বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া গোপনে পৃথাকে খাদ্য দিয়া যাইত। শতাব্দীর একপাদ ধরিয়া সে এই কাজ করিয়াছে। আশ্চর্য মস্তিষ্কের ক্রিয়া, আশ্চর্য জীবনের সহজাত সংস্কার!

ক্রমে দিবালোক মুছিয়া গিয়া চাঁদের আলো ফুটিয়া উঠিল। রাজপুরীর ভবনে ভবনে দীপমালা জ্বলিল।

প্রদোষের এই সন্ধিক্ষণে চারিদিকে চাহিয়া চিত্রকের মনে হইল সে এই নির্বান্ধব পুরীতে একান্ত একাকী, নিতান্ত অসহায়। কারাবন্দী হইবার পর অন্ধকার কারাকূপের মধ্যে তাহার যে অবস্থা হইয়াছিল, আজ রাজপুরীর দীপোদ্ভাসিত প্রাঙ্গণে সে অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই।

সহসা তাহার অন্তর অসহ্য অধীরতায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিল, সে যেন জল হইতে তীরে নিক্ষিপ্ত মীন। কিন্তু সে তাহার মনের অবস্থা সযত্নে গোপন করিয়া কঞ্চুকী সমভিব্যাহারে নিজ বাসভবনের দিকে ফিরিয়া চলিল।

* * * *

রাত্রির মধ্য যামে রাজপুরীর আলোকমালা নিবাপিত হইয়াছিল; শুক্লা চতুর্দশীর চন্দ্র পশ্চিমদিকে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। মাঝে মাঝে লঘু মেঘখণ্ড আসিয়া স্বচ্ছ আবরণে চন্দ্রকে ঢাকিয়া দিতেছিল।

রাজভবন সুপ্ত; কোথাও শব্দ নাই। চিত্রক আপন শয়নকক্ষে শয্যায় লম্বমান ছিল, ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। সে ঘুমায় নাই, কেবল চক্ষু মুদিত করিয়া শয্যায় পড়িয়া ছিল।

ঘরের এক কোণে স্তিমিত বর্তিকা অস্পষ্ট আলোক বিকীর্ণ করিতেছে, মুক্ত বাতায়ন পথে মৃদু বায়ুর সহিত জ্যোৎস্নার প্রতিভাস কক্ষে প্রবেশ করিতেছে। চিত্রক নিঃশব্দে পালঙ্ক হইতে নামিয়া বাতায়নের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। কোনও জনমানব নাই, চন্দ্রিকালিপ্ত পুরী নিথর দাঁড়াইয়া আছে।

চন্দ্রবিম্ব স্বচ্ছ মেঘে ঢাকা পড়িল, বহির্দৃশ্য আবছায়া হইয়া গেল। চিত্রক তখন বাতায়ন হইতে সরিয়া আসিয়া দ্বার পথে উঁকি মারিল। দ্বারের বাহিরে একটা কিঙ্কর বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছে, অন্য কেহ নাই। চিত্রক নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিল। প্রাচীন গাত্রে তাহার সকোষ অসি ঝুলিতেছিল, সে তাহা কোমরে বাঁধিল।

তারপর লঘু পদে বাতায়ন লঙ্ঘন করিয়া সে পুর ভূমিতে উত্তীর্ণ হইল। দীর্ঘনিশ্বাস টানিয়া ভাবিল, একটা বাধা উত্তীর্ণ হইয়াছি, আর একটা বাকি—পুরপ্রাকার। ইহা পার হইলেই মুক্তি।

অদূরে একটি লতা মণ্ডপের অন্তরাল হইতে দুইটি তীক্ষ্ণ চক্ষু যে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে তাহা সে জানিতে পারিল না।

চন্দ্রের মুখে আবার মেঘের আচ্ছাদন পড়িল। এই সুযোগে চিত্রক ত্বরিত পদে প্রাকারের দিকে চলিল। প্রাকারের ভিতর দিকে স্থানে স্থানে প্রাকারশীর্ষে উঠিবার সঙ্কীর্ণ সোপান আছে, তাহা সে সায়ংকালে লক্ষ্য করিয়াছিল।

প্রাকারশীর্ষে উঠিয়া চিত্রক বাহিরের দিকে উঁকি মারিল। প্রাকার বহির্ভূমি হইতে প্রায় পঞ্চদশ হস্ত উচ্চ, তাহার মসৃণ পাষাণ-গাত্র বাহিয়া নামিবার বা উঠিবার উপায় নাই। এক উপায়, বজ্রাঙ্গ-বলী পবনপুত্রকে

স্মরণ করিয়া নিম্নে লাফাইয়া পড়া ; কিন্তু তাহাতে যদি বা প্রাণ বাঁচে, হস্ত পদ রক্ষা পাইবে না ; অস্থি ভাঙ্গিবে। তখন পলায়নের চেষ্টা হাস্যকর প্রহসনে পরিণত হইবে।

তবে এখন কী কর্তব্য ? আবার চুপি চুপি গিয়া শয্যায় শুইয়া থাকা ? না, আরও চেষ্টা করিতে হইবে। বাহির হইবার একমাত্র পথ তোরণ দ্বার। তোরণ দ্বারে প্রতীহার আছে—তাহার চোখে ধূলা দিয়া বাহির হওয়া কি অসম্ভব ? কে বলিতে পারে, প্রতীহার হয়তো ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।—

চিত্রক প্রাকারের উপর দিয়া তোরণ দ্বারের অভিমুখে চলিল। সাবধানে চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল পশ্চাতে কেহ আসিতেছে। সে চকিতে ফিরিয়া চাহিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

তোরণ স্তম্ভের কাছে পৌঁছিয়া চিত্রক সন্তর্পণে নিম্নে দৃষ্টি প্রেরণ করিল ; দেখিল প্রতীহার দ্বারের লৌহ কবাটে পৃষ্ঠ রাখিয়া পদদ্বয় প্রসারণ পূর্বক ভূমিতে বসিয়া আছে; তাহার চিবুক বক্ষের উপর নত হইয়া পড়িয়াছে, ভল্লটি জানুর উপর স্থাপিত। প্রতীহার যে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

তাহাকে দেখিতে দেখিতে চিত্রকের নাসাপুট স্ফুরিত হইতে লাগিল, ললাটের টীকা ধীরে ধীরে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। দেহের স্নায়ুপেশী কঠিন করিয়া সে ক্ষণকাল চিন্তা করিল, তারপর নিঃশব্দে কোষ হইতে তরবারি বাহির করিল। ইহাই এখন একমাত্র উপায়। তোরণ দ্বারের গাত্রে যে ক্ষুদ্র কবাট আছে তাহা খুলিয়া সে বাহির হইবার চেষ্টা করিবে। প্রতীহারকে না জাগাইয়া যদি বাহির হইতে পারে ভাল, আর যদি প্রতীহার জাগিয়া ওঠে, তখন—

নিকটেই শীর্ণ সোপানশ্রেণী ; চিত্রক নীচে নামিল। তোরণস্তম্ভের গা ঘেঁষিয়া অতি সতর্ক পদসঞ্চারে নিদ্রিত প্রতীহারের দিকে অগ্রসর

হইল। এতক্ষণে সে প্রতীহারের মুখ দেখিতে পাইল; দেখিল গত রাত্রির সেই প্রতীহার।

ওষ্ঠাধর দৃঢ়বদ্ধ করিয়া চিত্রক আর এক পদ অগ্রসর হইল। কিন্তু আর তাহাকে অগ্রসর হইতে হইল না। এই সময় পশ্চাতে একটা গভীর গর্জনধ্বনি হইল; সঙ্গে সঙ্গে ভল্লুকের মতো একটা জীব তাহার স্কন্ধে লাফাইয়া পড়িয়া দুই বজ্রবাহু দিয়া তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল।

অতর্কিত আক্রমণে চিত্রক সম্মুখ দিকে পড়িয়া গেল। আক্রামকও সঙ্গে সঙ্গে পড়িল, কিন্তু তাহার বাহুবন্ধন শ্লথ হইল না। চিত্রকের শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। শত্রু পৃষ্ঠের উপর—চিত্রক তাহাকে দেখিতে পাইল না। অন্ধভাবে মাটিতে পড়িয়া সে অদৃশ্য আততায়ীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল; তাহার মুষ্টি হইতে তরবারি পড়িয়া গেল। দুই হাতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কিন্তু সে আততায়ীর নাগপাশ হইতে নিজ কণ্ঠ মুক্ত করিতে পারিল না।

এদিকে প্রতীহার আচম্বিতে ঘুম ভাঙিয়া দেখিল তাহার সম্মুখে গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। কিছু না বুঝিয়াই সে লাফাইয়া উঠিল এবং কটি হইতে একটা তূরী বাহির করিয়া তাহাতে ফুৎকার দিতে লাগিল। তূর্যের তারধ্বনিতে চারিদিক সচকিত হইয়া উঠিল।

চিত্রকের অবস্থা ততক্ষণে শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে; তাহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। কণ্ঠ মুক্ত করিবার চেষ্টা বৃথা। অন্ধভাবে চিত্রক মাটিতে হাত রাখিল, তরবারিটা তাহার হাতে ঠেকিল। মোহগ্রস্তভাবে তরবারি মুষ্টিতে লইয়া চিত্রক কোনও ক্রমে জানুর উপর উঠিল, তারপর তরবারি পিছন দিকে ফিরাইল; আততায়ী যেখানে তাহার পৃষ্ঠের উপর জড়াইয়া ধরিয়াছে সেইখানে তরবারির অগ্রভাগ রাখিয়া দুই হাতে আকর্ষণ করিল। তরবারি ধীরে ধীরে আততায়ীর পঞ্জর মধ্যে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ আততায়ী তদবস্থ রহিল; তারপর তাহার বাহুবন্ধন সহসা শিথিল হইল। সে চিত্রকের পৃষ্ঠ হইতে গড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

ফুস্‌ফুস্‌ ভরিয়া শ্বাসগ্রহণপূর্বক চিত্রক টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে তূর্যধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া কয়েকজন পুরবাসী ভৃত্য ছুটিয়া আসিয়াছিল এবং দণ্ডাদির দ্বারা চিত্রককে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু চিত্রক উঠিয়া দাঁড়াইলে তাহার মুখ দেখিয়া তাহারা নিরস্ত হইল।

তোরণ প্রতীহার ভল্ল অগ্রবর্তী করিয়া কাছে আসিয়া মহা বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—'আরে এ কি! এ যে কাল রাত্রির চোর—না না—মগধের দূত মহাশয়! এত রাত্রে এখানে কি করিতেছেন? ওটা কে?'

চিত্রক ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিল—'জানি না। আমাকে পিছন হইতে আচম্বিতে আক্রমণ করিয়াছিল—'

আততায়ীর অসিবিদ্ধ দেহটা অধোমুখ হইয়া পড়িয়া ছিল, একজন গিয়া তাহাকে উল্টাইয়া দিল। তখন চন্দ্রালোকে তাহার মুখ দেখিয়া সকলে স্তব্ধ হইয়া গেল—গুহ।

গুহ মরিয়াছে, তাহার দেহটা শিথিল জড়পিণ্ডে পরিণত হইয়াছে।

প্রতীহার বিস্ময়-সংহত কণ্ঠে বলিল—'কি আশ্চর্য—গুহ! গুহ আপনাকে আক্রমণ করিয়াছিল! কিন্তু সে বড় নিরীহ—কখনও কাহাকেও আক্রমণ করে নাই। আজ সহসা আপনাকে আক্রমণ করিল কেন?'

চিত্রক উত্তর দিল না, একদৃষ্টে গুহর মৃত-মুখের পানে চাহিয়া রহিল। গুহর মুখ শান্ত; যেন দীর্ঘ জাগরণের পর সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এই মানুষটাই ক্ষণেক পূর্বে হিংস্র ঋক্ষের ন্যায় তাহার কণ্ঠনালী চাপিয়া মারিবার উপক্রম করিয়াছিল তাহা বুঝিবার উপায় নাই। এই খর্ব ক্ষুদ্র দেহে এমন পাশবিক শক্তি ছিল তাহাও অনুমান করা যায় না।

প্রতীহার ওদিকে প্রশ্ন করিয়া চলিয়াছে—'কিন্তু গুহ আপনার প্রতি এমন মারাত্মক আক্রমণ করিল কেন? সে অবশ্য পাগল ছিল, কিন্তু কাহাকেও অকারণে আক্রমণ করা—'

চিত্রক বলিল—'অকারণ নয়। আমার প্রতি তাহার বিদ্বেষের কারণ বুঝিয়াছি। পৃথার মুক্তি। গুহ ভাবিয়াছিল, আমিই তাহার গুপ্তধন চুরি করিয়াছি।'

গুহর পাশে নতজানু হইয়া চিত্রক ধীরে ধীরে তাহার পঞ্জর হইতে তরবারি বাহির করিয়া লইল। মৃত্যুর পরপারে গুহ আবার তাহার লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়া পাইয়াছে কিনা কে জানে!

নবম পরিচ্ছেদ

তিলক বর্মা

পরদিন প্রাতঃকালে সচিব চতুর ভট্ট রাজভবনে চিত্রকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। স্বস্তিবাচন করিয়া বলিলেন—'কাল রাত্রে আপনি পুরভূমিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। আপনার দেখিতেছি মন্দ দশা চলিয়াছে; পদে পদে বিপন্ন হইতেছেন। গভীর রাত্রে অরক্ষিত অবস্থায় বাহির হওয়া নিরাপদ নয়; রাজপুরীর মধ্যেও বিপদ ঘটিতে পারে।'

কঞ্চুকী উপস্থিত ছিল; সে বলিল—'সেই কথাই তো আমিও বলিতেছি। কিন্তু দূত প্রবরের বয়স অল্প, মন চঞ্চল—' বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল।

চতুর ভট্ট জিজ্ঞাসা করিলেন—'রাত্রে কি নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল?'

প্রশ্নের অন্তর্নিহিত প্রকৃত প্রশ্নটি চিত্রক বুঝিতে পারিল; সচিব জানিতে চান কী জন্য রাত্রির মধ্যযামে সে একাকী বাহিরে গিয়াছিল। এই প্রশ্নের জন্য চিত্রক প্রস্তুত ছিল, সে মনে মনে একটি কাহিনী রচনা করিয়া রাখিয়াছিল, এখন তাহাই সচিবকে শুনাইল।

—গভীর রাত্রে চিত্রকের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। ঘুম ভাঙ্গিয়া সে দেখে, একটা লোক বাতায়ন পথে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তখন চিত্রক তরবারি লইয়া দুরভীষ্ট ব্যক্তির দিকে অগ্রসর হয়। চোর তাহাকে জাগ্রত দেখিয়া পলায়ন করে, চিত্রকও বাতায়ন উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে। কিছুদূর পশ্চাদ্ধাবন করিবার পর সে আর চোরকে দেখিতে পায়না। তখন ইতস্তত অন্বেষণ করিতে করিতে তোরণ সন্নিকটে উপস্থিত হইলে গুহ তাহাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে—ইত্যাদি।

কাহিনী অবিশ্বাস্য নয়। চতুর ভট্ট মন দিয়া শুনিলেন, মনে মনে ভাবিলেন, ইহা যদি মিথ্যা গল্প হয় তবে দূত মহাশয়ের উদ্ভাবনী শক্তি আছে বটে। মুখে বলিলেন—'যা হোক, আপনি যে উন্মাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন ইহাই ভাগ্য। আপনি মগধের মহামান্য দূত, আপনার কোনও অনিষ্ট হইলে আমাদের আর সান্ত্বনা থাকিত না।' কঞ্চুকীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'লক্ষ্মণ, দিবারাত্র দূত মহাশয়ের রক্ষার ব্যবস্থা কর। তিনি এখন কিছুদিন রাজ-অতিথিরূপে থাকিবেন, তাঁহার অনিষ্ট হইলে দায়িত্ব তোমার, স্মরণ রাখিও।'

চিত্রক উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল—'কিন্তু আমি শীঘ্রই চলিয়া যাইতে চাই। আতিথ্য রক্ষা তো হইয়াছে, এবার আমাকে বিদায় দিন।'

সচিব দৃঢ়ভাবে বলিলেন—'এত শীঘ্র যাওয়া অসম্ভব। চষ্টন দুর্গে মহারাজের নিকট মগধের লিপি প্রেরিত হইয়াছে, মহারাজ সম্ভবত আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিবেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার না করিয়া

আপনি চলিয়া যাইতে পারেন না।'—গাত্রোত্থান করিয়া চতুর ভট্ট নরম সুরে বলিলেন—'আপনি ব্যস্ত হইতেছেন কেন? রাজকার্য একদিনে হয়না। কিছুদিন বিশ্রাম করুন, আরাম উপভোগ করুন; তারপর বিটঙ্ক রাজ্যের দূত যখন পত্রের উত্তর লইয়া পাটলিপুত্রে যাইবে তখন আপনিও সঙ্গে ফিরিতে পারিবেন। সকল দিক দিয়া সুবিধা হইবে।'

সচিব প্রস্থান করিলেন। চিত্রক হতাশা-পূর্ণ হৃদয়ে বসিয়া রহিল। তাহার মনশ্চক্ষে কেবলই শশিশেখরের সগুম্ফ মুখ ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

দিনটা প্রায় নিষ্ক্রিয় ভাবেই কাটিল। কঞ্চুকী লক্ষ্মণ যদি বা এ পর্যন্ত চিত্রককে কদাচিৎ চক্ষের অন্তরাল করিতেছিল, এখন একেবারে জলোকার ন্যায় তাহার অঙ্গে জুড়িয়া গেল; স্নানে আহারে নিদ্রায় পলকের তরে তাহার সঙ্গ ছাড়িল না।

অপরাহ্ণের দিকে উভয়ে অক্ষক্রীড়ায় কাল হরণ করিতেছিল। বিনা পণের খেলা, তাই চিত্রকের বিশেষ মন লাগিতেছিল না; এমন সময় অবরোধ হইতে রাজকুমারীর স্বকীয়া এক দাসী আসিল। দাসী কৃতাঞ্জলি পুটে দাঁড়াইতেই কঞ্চুকী ঈষৎ বিস্ময়ে বলিল—'বিপাশা, তুমি এখানে কি চাও?'

বিপাশা বলিল—'আর্য, দেবদুহিতার আদেশে আসিয়াছি।'

কঞ্চুকী ত্বরিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'দেবদুহিতার কী আদেশ?'

বিপাশা বলিল—'দেবদুহিতা উশীর-গৃহে অবস্থান করিতেছেন, সঙ্গে সখী সুগোপা আছেন। দেবদুহিতা ইচ্ছা করিয়াছেন মগধের দূত মহোদয়ের সহিত কিছু বাক্যালাপ করিবেন। অনুমতি হইলে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারি।'

কঞ্চুকী বিপদে পড়িল। কোনও রাজদূতের সহিত অবরোধের মধ্যে সাক্ষাৎ করা রাজকন্যার পক্ষে শোভন নয়, নিয়মানুগও নয়। কিন্তু রাজকুমারী একে স্ত্রীজাতি, তায় হূণকন্যা; অবরোধের শাসন তিনি কোন

কালেই মানেন না। উপরন্তু, গণ্ডের উপর পিণ্ড, ঐ সুগোপা সখীটা আছে। সুগোপাকে কঞ্চুকী স্নেহের চক্ষে দেখে না। সুগোপার সহিত মিশিয়াই রাজকন্যার মর্যাদাজ্ঞান শিথিল হইয়াছে। কিন্তু উপায় কি? এদিকে অবরোধের শালীনতা রক্ষা করিতে হইবে; নহিলে কঞ্চুকীর কর্তব্যে ত্রুটি হয়। আবার দূত-প্রবরকেও একাকী ছাড়িয়া দেওয়া যায় না—

লক্ষ্মণ কঞ্চুকী চট্ করিয়া কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল; বিপাশাকে বলিল—'তুমি অগ্রবর্তিনী হও, আমি দূত মহাশয়কে লইয়া স্বয়ং যাইতেছি।'

কঞ্চুকী সঙ্গে থাকিলে অবরোধে পুরুষ প্রবেশের দোষ অনেকটা ক্ষালন হইবে, অধিকন্তু দূত মহাশয়ও চোখে চোখে থাকিবেন।

অবরোধের পশ্চিম প্রান্তে উশীর গৃহ। সারি সারি কয়েকটি কক্ষ; দ্বারে গবাক্ষে সিক্ত উশীরের জাল। গ্রীষ্মের তাপ বর্ধিত হইলে পুরস্ত্রীরা এই সকল শীতল কক্ষে আশ্রয় লইয়া থাকেন।

একটি কক্ষে শুভ্র মর্মর পট্টের উপর কুমারী রট্টা উপবিষ্টা ছিলেন, সুগোপা তাঁহার কাছে কুট্টিমের উপর তালবৃন্ত হাতে লইয়া বসিয়াছিল। কঞ্চুকী ও চিত্রক দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে সুগোপা তাড়াতাড়ি উঠিয়া একটি গৌড়দেশীয় মসৃণ পট্টিকা পাতিয়া দিল।

উভয়ে উপবিষ্ট হইলে রট্টা মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন। কঞ্চুকীকে চিত্রকের সঙ্গে দেখিয়া তিনি ব্যাপার বুঝিয়াছিলেন, কৌতুক-তরল কণ্ঠে বলিলেন—'এই অবরোধের প্রতি আর্য লক্ষ্মণের যেমন সতর্ক স্নেহ-মমতা, শিশু সন্তানের প্রতি মাতারও এমন দেখা যায় না।'

লক্ষ্মণ অতিশয় অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। চিত্রক রাজকুমারীর বাক্যে স্ফোটন দিয়া বলিল—'কঞ্চুকী মহাশয় আমার প্রতিও বড় স্নেহশীল, তিলার্ধের জন্যও চোখের আড়াল করেন না।'

বিড়ম্বিত কঞ্চুকী নতমুখে হেঁ হেঁ করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিল। তাহার উভয় সঙ্কট; কর্তব্য করিলে বাক্য যন্ত্রণা, না করিলে মুণ্ড লইয়া টানাটানি।

যাহোক, অতঃপর কুমারী রট্টা চিত্রককে বলিলেন—'দূত মহাশয়, আমার সখী আপনাকে কিছু কথা বলিতে চায়, তাই আপনাকে কষ্ট দিয়াছি। সুগোপা, এবার তোর কথা তুই বল্।'

সুগোপা কোলের উপর দুই যুক্ত হস্ত রাখিয়া নতচক্ষে বসিয়া ছিল, এখন ধীরে ধীরে বলিল—'আর্য, আমি আপনার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, প্রতিদানে আপনি আমার ইষ্ট করিয়াছেন। আপনার প্রসাদে আমার মাতাকে ফিরিয়া পাইয়াছি।'

চিত্রক অবহেলা ভরে হস্ত সঞ্চালন করিয়া এমন ভাব প্রকাশ করিল যে মনে হয় এই সব ইষ্টানিষ্ট চেষ্টা তাহার কাছে অকিঞ্চিৎকর। সুগোপা তখন বলিল—'আপনি উদার চরিত্র। তাই সাহস করিয়া আপনার নিকট একটি অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছি। আমার অভাগিনী জননী—' সুগোপার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল—'উদ্ধার পাইবার পর শয্যা লইয়াছেন। তাঁহার শরীর অতি দুর্বল, যে-কোনও মুহূর্তে প্রাণবায়ু বাহির হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার সংজ্ঞা সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। তাঁহার বড় সাধ আপনাকে একবার দেখিবেন, নিজমুখে কৃতজ্ঞতা জানাইবেন—'

চিত্রক বলিল—'কৃতজ্ঞতা জানাইবার কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু তিনি যদি আমাকে দেখিলে সুখী হন আমি নিশ্চয় দেখা করিব। কোথায় আছেন তিনি?'

সুগোপা বলিল—'আমার গৃহে। আমার কুটীর রাজপুরীর বাহিরে কিছু দূরে। যদি অনুগ্রহ করেন, এখনি লইয়া যাইতে পারি।'

চিত্রক উঠিয়া দাঁড়াইল—'চলুন। আমি প্রস্তুত।'

কঞ্চুকী ত্রস্তভাবে লাফাইয়া উঠিল—'আঁ।—রাজপুরীর বাহিরে! তা—তা—আমি সঙ্গে দুইজন রক্ষী দিতেছি—'

চিত্রক বলিল—'নিষ্প্রয়োজন। আমি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ।'

বিব্রত কঞ্চুকী বলিল—'কিন্তু তাহা কি করিয়া হইতে পারে! আর্য চতুর ভট্ট—অর্থাৎ—আপনার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমার উপর—'

চিত্রক রট্টার দিকে চাহিয়া করুণ হাসিল—'আমার উপর কঞ্চুকী মহাশয়ের বিশ্বাস নাই। তিনি বোধহয় এখনও আমাকে চোর বলিয়াই মনে করেন। তাঁহার সন্দেহ, ছাড়া পাইলেই আমি আবার ঘোড়া চুরি করিব।'

রট্টা ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চন করিলেন—'আর্য লক্ষ্মণ, রক্ষীর প্রয়োজন নাই। সুগোপা দূত মহাশয়কে লইয়া যাইবে, আবার পৌঁছাইয়া দিবে।'

পিণ্ড গলাধঃকরণ করিয়া কঞ্চুকী বলিল—'তা—তা—দেবদুহিতার যদি তাহাই অভিরুচি—'

চিত্রক মনে মনে ভাবিল—এই সুযোগ! সে আর রাজকুমারীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করিল না, রট্টার চোখে কি জানি কী সম্মোহন আছে, চোখাচোখি হইলে আবার হয়তো তাহার মনের গতি পরিবর্তিত হইবে। সে সুগোপার অনুসরণ করিয়া উষীর-গৃহ হইতে বাহির হইল।

রাজপুরীর তোরণ দ্বারের সম্মুখ দিয়া যে পথ গিয়াছে তাহা দক্ষিণ দিকে কিছুদূর গিয়া নিম্নাভিমুখে অবতরণ করিয়াছে, তারপর আরও খানিকদূর গিয়া একটি বাঁকের মুখে আসিয়া আবার নীচে নামিয়াছে। এই বাঁকের উপর সুগোপার কুটীর; ইহার পর হইতে রাজপুরুষ ও নাগরিক সাধারণের গৃহাদি আরম্ভ হইয়াছে।

সুগোপার কুটীর ক্ষুদ্র হইলেও সুদৃশ্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; চারিদিকে ফুলের বাগান। সুগোপার মালাকর স্বামী গৃহেই ছিল; সুগোপাকে আসিতে দেখিয়া সে ফুল-মাল্যাদি লইয়া বাহির হইল। বাজারে ফুল-মাল্য বিক্রয় করিয়া যাহা পাইবে তাহা লইয়া সে মদিরালয়ে প্রবেশ করিবে। লোকটি অতিশয় নীরব প্রকৃতির; আপন মনে উদ্যানের

পরিচর্যা করে, মালা গাঁথে, বিক্রয় করে, আর মদিরা সেবা করে। কাহারও সাতে পাঁচে নাই।

সুগোপা চিত্রককে মাতার নিকট লইয়া গেল। একটি ঈষদন্ধকার কক্ষে খট্টার উপর সযত্নবিন্যস্ত শয্যায় পৃথা শুইয়া আছে। তাহার দেহ যথাসম্ভব পরিষ্কৃত হইয়াছে, নখ কাটিয়া মাথায় তৈল সেক করা হইয়াছে। কিন্তু কেশের গ্রন্থিযুক্ত তাম্রাভ বর্ণ দূর হয় নাই। মুখের ও দেহের ত্বক দীর্ঘকাল আলোকের স্পর্শাভাবে হরিদ্রাভ বর্ণ ধারণ করিয়াছে।

পৃথা শয্যার সহিত যেন মিশিয়া গিয়াছিল; কোটরগত চক্ষু ঊর্ধ্বে নিবদ্ধ ছিল, চিত্রক নিঃশব্দে তাহার শয্যা-পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলে সে ধীরে ধীরে চক্ষু নামাইল। অনেকক্ষণ চিত্রকের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—'তুমিই সেই?'

সুগোপা শয্যাপার্শ্বে নতজানু হইয়া মাতার কপালে হস্ত রাখিল, স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল—'হাঁ মা, ইনিই সেই।'

আরও কিছুক্ষণ চিত্রককে দেখিয়া পৃথা বলিল—'তুমি হূণ নও—আর্য।'

চিত্রক হাসিয়া বলিল—'হাঁ আমি আর্য। যে হূণ তোমাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল সে মরিয়াছে।' বলিয়া সংক্ষেপে গুহের মৃত্যু বিবরণ বলিল।

শুনিয়া পৃথা বলিল—'এখন আর কী আসে যায়। আমার জীবন শেষ হইয়াছে।'

চিত্রক শয্যাপাশে বসিয়া সান্ত্বনার কণ্ঠে বলিল—'এরূপ কেন মনে করিতেছ? তোমার শরীর আবার সুস্থ হইবে। তোমার কন্যা আছে; তাহাকে লইয়া আবার তুমি সুখী হইবে। যাহা অতীত তাহা ভুলিয়া যাও।'

পৃথার মুখে আশা বা আনন্দের রেখাপাত হইল না। সে অনেকক্ষণ

চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—'আমার কথা থাক। তোমার কথা বল। তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়াছ, তোমার কথা শুনিতে চাই।—তোমাকে দেখিয়া মনে হইতেছে তুমি অপরিচিত নও—পূর্বে যেন দেখিয়াছি।'

চিত্রক লঘু হাস্যে বলিল—'তুমি তো অন্ধকারে দেখিতে পাও। সে-রাত্রে কূট-কক্ষে দেখিয়াছিলে—হয়তো সেই স্মৃতি মনে জাগিতেছে।'

'তাহাই হইবে। তোমার নাম কি?'

'চিত্রক বর্মা।'

পৃথা নীরবে তাহার ক্ষতরেখা চিহ্নিত অঙ্গে চক্ষু বুলাইল।

'মাতা পিতা জীবিত আছেন?'

মাতা পিতা! চিত্রক মনে মনে হাসিল, তাহার মাতা পিতা থাকিতে পারে ইহাই যেন অসম্ভব মনে হয়। বলিল—'না, জীবিত নাই।'

'তোমার বয়স অল্প মনে হয়—'

'নিতান্ত অল্প নয়, পঁচিশ ছাব্বিশ বছর।'

পৃথা কিয়ৎকাল চক্ষু মুদিত করিয়া রহিল, শেষে ধীরে ধীরে বলিল—'আমার তিলক বাঁচিয়া থাকিলে তোমার সমবয়স্ক হইত।'

'তিলক কে?'

'কুমার তিলক বর্মা। আমি তাহার ধাত্রী ছিলাম। সে আর সুগোপা এক দিনে জন্মিয়াছিল; আমার দুগ্ধ দু'জনকে ভাগ করিয়া দিতাম।'

সুগোপা নিম্নস্বরে বলিল—'মা, ও কথা আর মনে আনিও না।'

পৃথা চক্ষু নিমীলিত করিয়া বলিল—'তাহার কথা ভুলিতে পারি না। নবনীতের ন্যায় সুকুমার শিশু—সেই শিশুকে হূণেরা আমার বুক হইতে ছিঁড়িয়া লইল—তারপর—তারপর—'

অকালবৃদ্ধা পৃথার পাণ্ডুর গণ্ড বহিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রু ক্ষরিত হইতে লাগিল। সুগোপা চিত্রকের সহিত বিষণ্ণ দৃষ্টি বিনিময় করিল।

চিত্রক বলিল—'ক্ষত্রিয় শিশু যদি তরবারির আঘাতে মরিয়া থাকে তাহাতে আক্ষেপ করিবার কী আছে? ক্রীতদাস হইয়া বাঁচিয়া থাকার অপেক্ষা সে ভাল।'

পৃথা নিস্তেজ স্বরে বলিল—'রাজার ছেলে ক্রীতদাস হয় নাই সে ভাল। কিন্তু রাজজ্যোতিষী বলিয়াছিলেন, এ শিশু রাজটীকা লইয়া জন্মিয়াছে, রাজচক্রবর্তী হইবে। কই, তাহা তো হইল না! রাজজ্যোতিষীর কথা মিথ্যা হইল—'

চিত্রক মৃদুহাস্যে বলিল—'রাজজ্যোতিষীর কথা অমন মিথ্যা হয়। কিন্তু রাজটীকা লইয়া জন্মিয়াছে ইহার অর্থ কি?'

পৃথা ধীরে ধীরে বলিল—'আমি যেন চোখের উপর দেখিতে পাইতেছি। তাহার ভ্রূর মধ্যস্থলে জটুল ছিল; অন্য সময় দেখা যাইত না, কিন্তু সে কাঁদিলে বা ক্রুদ্ধ হইলে ঐ জটুল রক্তবর্ণ হইয়া ফুটিয়া উঠিত। মনে হইত যেন রক্ত চন্দনের তিলক। তাই তাহার নামকরণ হইয়াছিল—তিলক বর্মা।'

নিশ্বাসের ফুৎকারে ভস্মাবৃত অঙ্গার যেমন স্ফুরিত হইয়া উঠে, চিত্রকের ভ্রূমধ্যে তেমনি রক্তটীকা জ্বলিয়া উঠিল। সে ব্যায়ত চক্ষে চাহিয়া অর্ধবিরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—'কী বলিলে?'

পৃথা চক্ষু মেলিল। সম্মুখের চিত্রকের মুখ তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া আছে; সেই মুখে ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রবালের ন্যায় তিলক জ্বলিতেছে। পৃথার চক্ষু ক্রমে বিস্ফারিত হইতে লাগিল; তারপর সে চীৎকার করিয়া উঠিল—'তিলক! আমার তিলক বর্মা! পুত্র! পুত্র!'

পৃথা দুই কঙ্কালসার হস্তে চিত্রককে টানিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিতে চাহিল; কিন্তু এই প্রবল উত্তেজনায় তাহার দেহের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল; সহসা তাহার হস্ত শিথিল হইয়া চিত্রকের স্কন্ধ হইতে খসিয়া পড়িল। সে চক্ষু মুদিত করিয়া মৃতবৎ স্থির হইয়া রহিল।

সুগোপা কাঁদিয়া উঠিল। চিত্রক পৃথার বক্ষের উপর করতল রাখিয়া দেখিল অতি ক্ষীণ হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। সে সুগোপাকে বলিল—'এখনও বাঁচিয়া আছেন। যদি সম্ভব হয় শীঘ্র চিকিৎসক ডাকো।'

সুগোপা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রাজবৈদ্য রট্টার আদেশে পৃথার চিকিৎসার ভার লইয়াছিলেন। রাজবৈদ্যের বাসভবন নিকটেই; অল্পক্ষণের মধ্যে সুগোপা বৈদ্যকে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বৈদ্যরাজ ঈষৎ মুখ বিকৃত করিলেন, তারপর সূচিকাভরণ প্রয়োগ করিলেন।

সে রাত্রে চিত্রক রাজপুরীতে ফিরিয়া গেল না।

সন্দিগ্ধ কঞ্চুকী অলক্ষিতে দুইটি গুপ্ত-রক্ষী পাঠাইয়াছিল, তাহারা সারা রাত্রি সুগোপার কুটীরের বাহিরে পাহারা দিল।

গভীর রাত্রে পৃথা মোহাচ্ছন্ন ভাবে পড়িয়া ছিল। চিত্রক তাহার শয্যাপাশে দাঁড়াইয়া সুগোপার স্কন্ধের উপর হাত রাখিল—'সুগোপা, তুমি আমার ভগিনী, আমরা একই স্তনদুগ্ধ পান করিয়াছি।'

সুগোপা শুধু সজল নেত্রে চাহিয়া রহিল।

চিত্রক বলিল—'যে কথা আজ শুনিয়াছ তাহা কাহাকেও বলিও না। বলিলে আমার জীবন সংশয় হইতে পারে।'

সুগোপা ভগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—'এখন তুমি কী করিবে?'

চিত্রকের অধরে ম্রিয়মাণ হাসি দেখা দিল—'ভাবিয়াছিলাম পলায়ন করিব। কিন্তু এখন—কি করিব জানি না। তুমি একথা কাহাকেও বলিও না। হয়তো তোমার মাতা ভুল করিয়াছেন; রুগ্ন দেহে এরূপ ভ্রান্তি অসম্ভব নয়—।'

সুগোপা বলিল—'ভ্রান্তি নয়। আমার অন্তর্যামী বলিতেছেন, তুমি চিত্রক বর্মা।'

'তিলক বর্মা। শুনিতে বড় অদ্ভুত লাগে। কিন্তু সত্য হোক মিথ্যা হোক, তুমি শপথ কর এ কথা গোপন রাখিবে।'

'ভাল, গোপন রাখিব।'

'কাহাকেও বলিবে না?'

'না।'

পৃথার আর জ্ঞান হইল না। রাত্রি শেষে তাহার প্রাণবায়ু নির্গত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

নূতন পথে

সত্য যখন অপ্রত্যাশিত ভাবে মানুষের সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হয়, তখন তাহার রূপ যতই অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় হোক, তাহাকে সত্য বলিয়া চিনিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মধ্যে নিজেকে সহজে স্বাভাবিক রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার এমন একটি অসন্দিগ্ধ ভঙ্গী সত্যের আছে যে তাহাকে অস্বীকার করা একেবারেই অসম্ভব।

পৃথার মুখে চিত্রক যখন নিজের পরিচয় শুনিল তখন ক্ষণেকের তরেও তাহার মনে সন্দেহ বা অবিশ্বাস জন্মিল না। বরং তাহার অতীত জীবনের সমস্ত পূর্বসংযোগ, তাহার সর্বাঙ্গে অসি-রেখাঙ্ক, সমস্তই যেন এই নূতন পরিচয়ের সমর্থন করিল। কিন্তু তথাপি, চিরাভ্যস্ত দর্পণে নিজের মুখ দেখিতে গিয়া কেহ যদি একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত মুখ দেখিতে পায় তাহা হইলে সে যেমন চমকিয়া উঠে, চিত্রকও আদৌ নিজের প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিয়া বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহা ক্ষণেকের

জন্ম; পরক্ষণেই সে দৃঢ়বলে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়াছিল। তাহার মস্তিষ্ক রন্ধ্রে অযুত উন্মত্ত চিন্তা ঝাঁক বাঁধিয়া প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতি যোদ্ধার সবল সতর্কতার দ্বারা সে তাহার প্রতিরোধ করিয়াছিল। সঙ্কটকালে বুদ্ধিভ্রংশ হইলে সর্বনাশ।"

উপরন্তু এই বাহ্য সংযমের তলে তলে তাহার মনের মধ্যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। শৈশব হইতে যে বিচিত্র বাতাবরণের মধ্যে সে বর্ধিত হইয়াছে, বাঁচিয়া থাকার জৈব চেষ্টায় যে নিত্য ঘাত প্রতিঘাতের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহা তাহাকে একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র দান করিয়াছিল; এই চরিত্র কঠিন, স্বার্থপরায়ণ, নীতি-বিমুখ ও সুযোগসন্ধী—ইহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। এখন নিজের প্রকৃত পরিচয় জানিবার পর তাহার নিগূঢ় অন্তর্লোকে ধীরে ধীরে একটি পরিবর্তনের সূত্রপাত হইল; সে নিজেও জানিল না যে তাহার রক্তের প্রভাব—যাহা এতদিন আত্মপরিচয়ের অভাবে সুপ্ত ছিল—তাহা তাহার অর্জিত চরিত্রকে অলক্ষিতে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পৃথার মৃত্যুর পরদিন প্রাতঃকালে চিত্রক যখন রাজপুরীতে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার মুখের ভাব ক্লান্ত, ঈষৎ গম্ভীর, তাহার অন্তরে যে শীততন্দ্রাচ্ছন্ন বুভুক্ষু নাগ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা কেহ জানিতে পারিল না। চারিদিকে সূর্যকরোজ্জ্বল পুরভূমি, চূর্ণবিলেপিত ভবনগুলি ইতস্তত শুভ্র বুদ্বুদ্-বিম্বের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ইহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চিত্রক ভাবিতে লাগিল—আমার! আমার! এ সকলই আমার!

কিন্তু—একথা কাহাকেও বলিবার নয়। বলিলে লোকে হাসিবে, উন্মাদ বলিয়া ব্যঙ্গ করিবে। একজন সাক্ষী ছিল, সে মরিয়া গিয়াছে। সে যদি বাঁচিয়া থাকিত তাহাতেই বা কি হইত? তাহার কথাও কেহ বিশ্বাস করিত না, অসম্বদ্ধ প্রলাপ বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিত। কিম্বা যদি বিশ্বাস করিত, তাহা হইলে পরিস্থিতি আরও সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিত;

চিত্রককে বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিতে হইত না। বরং এই ভাল। শুধু সুগোপা জানিল, তাহাতে ক্ষতি নাই; সুগোপা-ভগিনী শপথ করিয়াছে কাহাকেও বলিবে না। কিছুদিন নিভৃতে চিন্তা করিবার অবসর পাওয়া যাইবে। তারপর—

এদিকে লক্ষ্মণ কঞ্চুকী গত রাত্রে দুশ্চিন্তায় নিদ্রা যায় নাই। কিন্তু আজ প্রভাতে চিত্রক যখন পলায়নের কোনও চেষ্টা না করিয়া স্বেচ্ছায় রাজপুরীতে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার মন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল; তাহার মনে হইল চতুর ভট্ট বৃথাই চিত্রককে সন্দেহ করিয়াছিলেন। সে দ্বিগুণ সমাদরের সহিত চিত্রকের সেবা করিতে লাগিল।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর চিত্রক বিশ্রামের জন্য শয্যাশ্রয় করিলে কঞ্চুকী লক্ষ্মণ বলিল—'আজ আপনাকে কিছু অধিক বিমনা দেখিতেছি। চিন্তার কোনও কারণ ঘটিয়াছে কি?'

চিত্রক বলিল—'জীবন-মৃত্যুর অচিন্তনীয় সম্ভাব্যতার কথা ভাবিতেছি। পৃথা পঁচিশ বৎসর অন্ধকূপে বন্দিনী থাকিয়াও মরিল না, যেমনি মুক্তি পাইল, সেবা-যত্ন পাইল, অমনি মরিয়া গেল। বিচিত্র নয়?'

লক্ষ্মণ বলিল—'সত্যই বিচিত্র। মানুষের ভাগ্যে কখন কী আছে কেহই বলিতে পারে না, আজ যে রাজা, কাল সে ভিক্ষুক। এই পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যে কতই যে দেখিলাম!' বলিয়া সে দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল।

চিত্রক কঞ্চুকীকে কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'কঞ্চুকী মহাশয়, আপনি কতকাল এই কার্য করিতেছেন?'

'কঞ্চুকীর কার্য? তা প্রায় বিশ বছর হইল। আমার পিতা আমার পূর্বে কঞ্চুকী ছিলেন—' লক্ষ্মণের স্বর নিম্ন হইল—'রাষ্ট্রবিপ্লবে তিনি হত হন। তারপর নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে কয়েক বছর গেল· ক্রমে বর্তমান মহারাজ আর্যভাবাপন্ন হইলেন। তদবধি আমি আছি।'

'পূর্বতন রাজার কী হইল ?'

'শুনিয়াছি বর্তমান মহারাজ তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন।'

'আর রাণী ?'

'রাণী বিষ ভক্ষণে দেহত্যাগ করেন। তাঁহাকে কেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই।'

উদ্‌গত নিশ্বাস চাপিয়া চিত্রক অবহেলাভরে প্রশ্ন করিল—'রাজপুত্রটাও নিশ্চয় মরিয়াছিল ?'

'সম্ভবত মরিয়াছিল। কিন্তু তাহার মৃতদেহ পাওয়া যায় নাই।'

চিত্রক আর অধিক প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না, তন্দ্রার ছলে জৃম্ভন ত্যাগ করিয়া চক্ষু মুদিত করিল।

দিনটা বিরস শূন্যতার মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে চিত্রক উত্তরীয় স্কন্ধে ফেলিয়া ভবন হইতে বাহির হইল। কঞ্চুকী আজ আর তাহার সঙ্গ লইবার চেষ্টা করিল না, শুধু জিজ্ঞাসা করিল—'পুরীর বাহিরে যাইবেন নাকি ?'

চিত্রক বলিল—'না, ভিতরেই একটু ঘুরিয়া বেড়াইব।'

সূর্য অস্ত গিয়াছে। প্রাসাদের বলভিতে কপোতগণ কলহ-কূজন করিয়া রাত্রির জন্য নিজ নিজ বিশ্রামস্থল সংগ্রহ করিতেছে। ক্রমে পূর্বদিগন্ত জ্যোতির্মণ্ডিত করিয়া চন্দ্রোদয় হইল।

পুরভূমি প্রায় জনশূন্য, কদাচিৎ দুই একজন কিঙ্কর-কিঙ্করী এক ভবন হইতে অন্য ভবনে যাতায়াত করিতেছে। চিত্রক অনায়াস-পদে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে একটি শীর্ণ সোপান অতিবাহিত করিয়া প্রাকারে উঠিল।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রাকারচক্র রৌপ্য নির্মিত অংগুলির ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাহার উপর উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে আসিয়া চিত্রক সহসা থামিয়া গেল।

অদূরে প্রাকার কুড্যের উপর একটি নারী বসিয়া আছে। জ্যোৎস্না-কুহেলির মধ্যে শুভ্রবসনা রমণীকে তুষারীভূত জ্যোৎস্নার মতই দেখাইতেছে। চিত্রকের চিনিতে বিলম্ব হইল না—কুমারী রট্টা যশোধরা।

রট্টা অন্য মনে চন্দ্রের পানে চাহিয়া আছেন। কোন্ বহির্মুখী বৃত্তির আকর্ষণে তিনি আজ প্রাসাদ-শীর্ষের ছাদে না গিয়া একাকিনী এই প্রাকারে আসিয়া বসিয়াছেন তাহা তিনি নিজেই জানেন, কিম্বা হয়তো তিনিও জানেন না। চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া তিনি কী ভাবিতেছেন তাহাও বোধকরি তাঁহার সচেতন মনের অগোচর।

নিশ্বাস রোধ করিয়া চিত্রক ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার ললাটে ধীরে ধীরে ভ্রূকুটি ফুটিয়া উঠিল, গুপ্ত স্পৃহার জ্বালাময় অসূয়া হৃদয় বিদ্ধ করিল। ঐ রাজনন্দিনী রট্টা—এই বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিশ্বরী। আর আমি—? এক ভাগ্যান্বেষী অসি-জীবী সৈনিক—

অধর দংশন করিয়া চিত্রক নিঃশব্দে ফিরিয়া যাইতেছিল, পিছন হইতে মৃদু কণ্ঠের আহ্বান আসিল—'আর্য চিত্রক এসো।'

চিত্রক ফিরিল। রাজকুমারীর কাছে গিয়া যুক্ত করে অভিবাদন করিল, গম্ভীর মুখে বলিল—'দেবদুহিতা এখানে আছেন আমি জানিতাম না। জানিলে আসিতাম না।'

রট্টা ঈষৎ হাসিলেন, বলিলেন—'কোনও হানি হয় নাই, বরং ভালই হইয়াছে। অবরোধে একাকিনী অতিষ্ঠ হইয়াছিলাম, তাই এখানে আসিয়া বসিয়াছি। আপনিও বসুন।'

চিত্রক বসিল না, কুড্যে বসিলে রাজকন্যার সহিত সমান আসনে বসা হয়, ভূমিতে বসিলে অত্যধিক দীনতা প্রকাশ করা হয়। সে কুড্যের উপর বাহু রাখিয়া দাঁড়াইল; বলিল—'আপনার সুগোপা সখী বোধ করি আজ আসিতে পারেন নাই।'

'সুগোপা আমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না—প্রভাতে একবার

মুহূর্তের জন্য আসিয়াছিল। আপনার কত কথা বলিল। সারারাত্রি জাগিয়া আপনি তাহাকে সাহায্য ও সাহচর্য দান করিয়াছিলেন। এমন কেহ করে না।'

'সুগোপা আর কিছু বলে নাই?'

রট্টা ঈষৎ বিস্ময়ে চক্ষু ফিরাইলেন—'আর কী বলিবে?'

'না, কিছু না—' প্রসঙ্গান্তর উত্থাপনের জন্য চিত্রক চন্দ্রের পানে চাহিয়া বলিল—'আজ বোধ হয় পৌর্ণমাসী।'

'হাঁ।' রট্টাও কিয়ৎকাল চাঁদের পানে চক্ষু তুলিয়া রহিলেন—'শুনিয়াছি আর্যাবর্তের অন্যত্র আজিকার দিনে উৎসব হয়—বসন্ত ঋতুর পূজা হয়। এখানে কিছু হয় না।'

'হয় না কেন?'

'ঠিক জানিনা। পূর্বে বোধহয় হইত, এখন হূণ অধিকারের পর বন্ধ হইয়াছে। হূণদের মধ্যে বসন্ত উৎসবের প্রথা নাই। তবে বুদ্ধ-পূর্ণিমার দিন উৎসবের প্রথা মহারাজ পুনঃপ্রবর্তিত করিয়াছেন।'

এই সকল অলস কথাবার্তার মধ্যে চিত্রক দেখিল, রট্টা প্রাকারের কুড্যের উপর এমন ভাবে বসিয়া আছেন যে তাঁহাকে একটু ঠেলিয়া দিলে কিম্বা আপনা হইতে ভারকেন্দ্র বিচলিত হইলে তিনি প্রাকারের বাহিরে বিশ হাত নীচে পড়িবেন, মৃত্যু অনিবার্য। চিত্রকের বুকের ভিতর দুষ্ট বাষ্পের মতো একটা অশান্ত উদ্বেগ পাক খাইতে লাগিল। তৃতীয় ব্যক্তি এখানে নাই, রট্টা যদি পড়িয়া যান কেহ কিছু সন্দেহ করিতে পারিবে না। যে বর্বর হূণ তাহার সর্বস্ব অপহরণ করিয়াছে, যাহার হস্তে তাহার পিতা নৃশংসভাবে হত হইয়াছিলেন, এই যুবতী তাহারই কন্যা—

চিত্রকের চোখে জ্যোৎস্নার শুভ্রতা লোহিতাভ হইয়া উঠিল।

রট্টার কিন্তু নিজের সঙ্কটময় অবস্থিতির প্রতি লক্ষ্য নাই; তিনি স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে কুড্যের উপর বসিয়া আছেন। চিত্রক সহসা যেন নিজেকে

ব্যঙ্গ করিয়াই হাসিয়া উঠিল। বলিল—'রাজকুমারি, আপনি কুড্য হইতে নামিয়া বসুন। ওখান হইতে নিম্নে পড়িলে প্রাণহানির সম্ভাবনা।'

রট্টা একবার অবহেলা ভরে নীচের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, বলিলেন—'ভয় নাই, আমি পড়িব না। কিন্তু আপনি হাসিলেন কেন?'

ক্ষোভে অধর দংশন করিয়া চিত্রক বলিল—'ক্ষমা করুন, আমি কৌতুকবশে হাসি নাই। আপনার নির্ভীক অপরিণামদর্শিতা—কিন্তু যাক। রাজনন্দিনি, যদি ধৃষ্টতা না হয়, একটি প্রশ্ন করিতে পারি?'

'কি প্রশ্ন?'

'আপনি হূণ-দুহিতা। আর্য জাতি অপেক্ষা হূণ জাতির প্রতি আপনার মনে নিশ্চয় পক্ষপাত আছে?'

কিছুক্ষণ নীরবে মনন করিয়া রট্টা ধীরে ধীরে বলিলেন—'আর্য—! হূণ—! আমার মাতা আর্য ছিলেন, পিতা হূণ। আমি তবে কোন্ জাতি? জানি না। সম্ভবত মনুষ্য জাতি।' রট্টা একটু হাসিলেন—'আর পক্ষপাত? দূত মহাশয়, এই আর্যভূমিতে যাহারা বাস করে তাহাদের সকলের প্রতি আমার পক্ষপাত আছে। কারণ তাহাদের ছাড়া অন্য মানুষ আমি দেখি নাই।'

'সকলকে আপনি সমান বিশ্বাস করিতে পারেন?'

'পারি। যে বিশ্বাসের যোগ্য সে আর্যই হোক আর হূণই হোক, বিশ্বাস করিতে পারি।' রট্টা লঘুপদে কুড্য হইতে অবতরণ করিলেন—'এবার আমি অন্তঃপুরে ফিরিব; নহিলে আর্য লক্ষ্মণ রুষ্ট হইবেন।'

চিত্রক বলিল—'চলুন আমি আপনার রক্ষী হইয়া যাইতেছি।'

'আসুন—' বলিয়া রট্টা যেন কোন্ গোপন কৌতুকে সুন্দর মুখ উদ্ভাসিত করিয়া হাসিলেন; চন্দ্রালোকে সেই হাসি তরঙ্গের মতো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

চিত্রক ঈষৎ সন্দিগ্ধভাবে বলিল—'হাসিলেন কেন?'

রট্টা এবার বঙ্কিম দৃষ্টিতে চটুলতা ভরিয়া তাহার পানে চাহিলেন; মুখ টিপিয়া বলিলেন—'ও কিছু নয়। স্ত্রীলোকের হাসি-কান্নার কি কোনও অর্থ আছে?—চলুন।'

* * * *

গভীর রাত্রে রট্টা শয্যা হইতে উঠিলেন। তাঁহার শয্যার শিয়রে প্রাচীরগাত্রে একটি কুটঙ্গক ছিল, তন্মধ্যে একটি মণিময় ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্তি থাকিত। সিংহল দ্বীপে রচিত নীলকান্তমণির অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ এই বুদ্ধমূর্তি মহারাজ রোট্ট-ধর্মাদিত্য কন্যাকে উপহার দিয়াছিলেন।

শয্যা হইতে উঠিয়া রট্টা একটি দীপ জ্বালিলেন। ধ্যানাসীন বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে দীপ রাখিয়া তিনি যুক্তকরে তদ্গতচিত্তে দীর্ঘকাল ঐ দিব্যমূর্তির পানে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার বান্ধুলি পুষ্পতুল্য অধর অল্প অল্প নড়িতে লাগিল। তাঁহার কুমারী হৃদয়ের কোন নিভৃত প্রার্থনা তথাগতের চরণে নিবেদিত হইল তাহা কেবল তথাগত জানিলেন।

তারপর দীপ নিভাইয়া রট্টা আবার শয়ন করিলেন।

* * * *

পরদিন অপরাহ্ণে চষ্টন দুর্গ হইতে বার্তাবহ ফিরিয়া আসিল। মহারাজ রোট্ট ধর্মাদিত্য পত্র দিয়াছেন। পত্র পাঠ করিয়া মন্ত্রী চতুরানন ভট্ট চিন্তিত মনে রট্টার কাছে গেলেন।

'মহারাজের শরীর ভাল নয়, তিনি আরও কিছুকাল চষ্টন দুর্গে থাকিবেন। কিন্তু কন্যাকে দেখিবার জন্য তাঁহার মন বড় উতলা হইয়াছে।'

রট্টা বলিলেন—'আমি পিতার কাছে যাইব।'

চতুরানন বলিলেন—'কিন্তু—যাওয়া উচিত কিনা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।'

'যাওয়া অনুচিত কেন?'

ইতস্তত করিয়া চতুরানন বলিলেন—'কিরাত লোক ভাল নয়। সে চষ্টন দুর্গের সর্বময় কর্তা, তাহার যদি কোনও কুবুদ্ধি থাকে—'

রট্টার মুখ রক্তবর্ণ হইল—'কিরূপ কুবুদ্ধি? আপনি কি সন্দেহ করেন, কিরাত পিতাকে নিজের কবলে পাইয়া এখন ছলনা দ্বারা আমাকেও কবলে আনিতে চায়?'

'কে বলিতে পারে? সাবধানের নাশ নাই।'

রট্টা সদর্পে বলিলেন—'আমি বিশ্বাস করি না। মহারাজের সহিত এরূপ ধৃষ্টতা করিবে কিরাতের এত সাহস নাই। আপনি ব্যবস্থা করুন, কাল প্রাতেই আমি চষ্টন দুর্গে যাইব। পিতৃদেবকে দেখিবার জন্য আমারও মন অস্থির হইয়াছে।'

'উত্তম।—মহারাজ মগধের দূতকেও চষ্টন দুর্গে আহ্বান করিয়াছেন।'

রট্টার চোখের উপর অদৃশ্য আবরণ নামিয়া আসিল। তিনি ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন—'ভাল। তিনিও আমার সঙ্গে যাইবেন। তাঁহাকে সংবাদ দিন।'

চতুর ভট্ট বলিলেন—'সঙ্গে একদল শরীর-রক্ষীও থাকিবে।—ভাল কথা, চষ্টন দুর্গের পথ দীর্ঘ ও ক্লেশদায়ক, পৌঁছিতে দুই দিন লাগিবে। মধ্যে এক রাত্রি পান্থশালায় কাটাইতে হইবে। দেবদুহিতার জন্য দোলার ব্যবস্থা করি?'

'না, আমি অশ্বপৃষ্ঠে যাইব।'

'দাসী কিঙ্করী কেহ সঙ্গে যাইবে না?'

'না।'

রট্টার নিকট হইতে চতুরানন চিত্রকের কাছে গেলেন। চিত্রক সমস্ত কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ অধোমুখে বসিয়া রহিল। তাহার বক্ষে যে অদৃশ্য তুষানল জ্বলিতেছিল তাহা সহসা লেলিহ শিখায় আলোড়িত হইয়া উঠিল

কিন্তু সে মনের ভাব গোপন করিয়া উদাস নিস্পৃহ স্বরে বলিল—'আমি এখন আপনাদের অধীন ; যাহা বলিবেন তাহাই করিব।'

পর দিবস প্রভাতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রট্টা এবং চিত্রক অশ্বারোহণে রাজপুরী হইতে বাহির হইল। এক সেনানী পাঁচজন সশস্ত্র আরোহী লইয়া সঙ্গে চলিল।

কপোতকূট নগর তখন জাগিয়া উঠিয়াছে। পথে পথে গৃহ ও বিপণির দ্বার খুলিয়াছে, নাগরিকগণ ইতস্তত যাতায়াত করিতেছে ; নাগরিকারা কলসী কক্ষে জল ভরিতে যাইতেছে ; কেহবা পূজার অর্ঘ্য লইয়া দেবায়তন অভিমুখে চলিয়াছে। পথের উপর বালকবৃন্দ দল বাঁধিয়া ক্রীড়া করিতেছে। বৈদেহক স্কন্ধে পণ্য লইয়া হাঁকিতেছে—অয়ে লাজা—!

পুরুষবেশা রট্টা যখন অশ্বক্ষুর ধ্বনিতে চারিদিক সচকিত করিয়া রক্ষীসহ রাজপথ দিয়া চলিলেন, তখন জনগণ সকলে পথপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সগর্বে উৎফুল্ল নেত্রে দেখিল।

পণ্য পাটকের ভিতর দিয়া যাইবার সময় রট্টা দেখিলেন, চতুষ্পথের উপর একটা কিম্ভূত-কিমাকার মানুষকে ঘিরিয়া ভিড় জমিয়াছে। লোকটা রোমশ রুক্ষকেশ স্থূলকায় ; অঙ্গে বস্ত্রাদি আছে কিনা ভিড়ের মধ্যে বুঝা যায় না। সে উচ্চকণ্ঠে সকলকে কী একটা কথা বলিতেছে, শুনিয়া সকলে হাসিতেছে ও রঙ্গ তামাসা করিতেছে।

রট্টা অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া একজন পথচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও কে? কী বলিতেছে?'

পথচারী রাজকন্যার সম্বোধনে কৃতার্থ হইয়া হাস্যমুখে বলিল—'ও একটা গড্ডল্—বলিতেছে ও নাকি কোথাকার রাজদূত!'

চিত্রক একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই চিনিয়াছিল—শশিশেখর! সে আর সেদিকে মুখ ফিরাইল না।

রট্টা আবার অশ্বচালনা করিলেন। ক্রমে তাঁহারা নগরের উত্তর দ্বারে উপস্থিত হইলেন।

এইখানে শশিশেখরের কথা শেষ করা যাক। সেইদিন সন্ধ্যাকালে নগরের কোট্টপাল মন্ত্রী চতুর ভট্টের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, বলিলেন—'একটা বিকৃতবুদ্ধি বিদেশী নগরে প্রবেশ করিয়াছে। সে বলে সে মগধের রাজদূত, কোনও এক তস্কর নাকি তাহার সর্বস্ব কাড়িয়া তাহাকে দিগম্বর করিয়া মৃগয়া কাননে ছাড়িয়া দিয়াছিল।—লোকটা লতাপাতা দিয়া কোনও ক্রমে লজ্জা নিবারণ করিয়াছে।'

চতুরানন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া শুনিলেন।

'তারপর?'

'নগররক্ষীরা তাহাকে আমার কাছে ধরিয়া আনিয়াছিল। দেখিলাম, লোকটার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। কখনও এক কথা বলে, কখনও অন্য কথা বলে, কখনও বুদবুদাক্ষ হইয়া ক্রন্দন করে। তাহাকে লইয়া কি করিব বুঝিতে না পারিয়া কোৎ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি।'

চতুর ভট্ট বলিলেন—'বেশ করিয়াছ। গর্ভদাসটা একদিন আগে আসিতে পারিল না! এখন আর উপায় নাই। আপাতত কিছুদিন লপ্সিকা ভক্ষণ করুক, তারপর দেখা যাইবে।'

অতঃপর এ কাহিনীর সহিত শশিশেখরের আর কোনও সম্বন্ধ নাই। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই আখ্যায়িকা শেষ হইবার পূর্বেই সে মুক্তি পাইয়াছিল এবং ভবিষ্যতে আর কখনও দেশ পর্যটনে বাহির হইবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বন্ধনহীন গ্রন্থি

উত্তরাস্থ নগরদ্বার অতিক্রম করিয়া রট্টা দলবলসহ বাহিরে আসিলেন। এখান হইতে রাজপথ মৃগয়া-কানন বেষ্টন করিয়া ভুজঙ্গ-প্রয়াত ছন্দে আঁকিয়া বাঁকিয়া, কখনও উচ্চে উঠিয়া কখনও নিম্নে নামিয়া যেন নিরুদ্দেশের অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। প্রভাতের নবীন সূর্যালোকে এই দৃশ্য চিত্রাঙ্কিতবৎ মনোরম দেখাইতেছে।

এই নৈসর্গিক দৃশ্যের উপর ক্ষণেক দৃষ্টি বুলাইয়া রট্টা অশ্ব স্থগিত করিলেন; সেনানীকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন—'নকুল, তুমি বন্দীদের লইয়া আগে যাও; আমরা মন্থর গমনে তোমাদের পশ্চাতে যাইব।'

নকুল ঈষৎ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল—'কিন্তু—' রট্টা বলিলেন—'সঙ্গে আর্য চিত্রক বর্মা থাকিবেন, আমার অন্য রক্ষীর প্রয়োজন নাই। তোমরা যাও, দ্রুত অশ্ব চালাইলে দ্বিপ্রহরের মধ্যে পান্থশালায় পৌঁছিতে পারিবে। সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজন করিয়া চষ্টনদুর্গের পথে যাত্রা করিও।'

এখানে নকুল আবার বাধা দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু রট্টা বাধা অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়া চলিলেন—'রাত্রি এক প্রহরের মধ্যে চষ্টনদুর্গে পৌঁছিবে। মহারাজকে বলিও আমি কাল আসিব। মহারাজ অসুস্থ, আমি আসিতেছি জানিলে সুখী হইবেন।'

ইহার পরও নকুল আপত্তি করিতে যাইতেছিল কিন্তু রট্টা তাহার মুখের পানে চাহিয়া এমন মধুর হাস্য করিলেন যে নকুলের জ্ঞান বুদ্ধি স্তম্ভিত হইল। সে সম্মোহিতের ন্যায় 'দেবদুহিতার যেরূপ আজ্ঞা' বলিয়া সঙ্গীদের লইয়া দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া দিল। মন্ত্রী চতুর ভট্টের আদেশ

যদি বা উপেক্ষা করা যায়, রাজনন্দিনীর সহাস্য নির্বন্ধের প্রতিবাদ অসম্ভব।

রক্ষীর দল ও তাহাদের অশ্বক্ষুরধ্বনি ক্রমশ দূর হইতে আরও দূরে মিলাইয়া গেল। রট্টাও আয়াসহীন মন্দগতিতে অশ্ব চালনা করিলেন। চিত্রক তাঁহার পাশে রহিল।

রট্টার মুখ উৎফুল্ল, চক্ষু চঞ্চল। তিনি কখনও উজ্জ্বল নিষ্কলুষ আকাশের পানে চক্ষু উৎক্ষিপ্ত করিতেছেন, কখনও মৃগয়া-কাননের অভ্যন্তরে কৌতূহলী দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছেন, অশ্বের কণ্ঠ-কিঙ্কিণী পদক্ষেপের তালে তালে শিঞ্জনধ্বনি করিয়া তাঁহার কর্ণে অমৃত-বৃষ্টি করিতেছে।

চিত্রকের মুখ কিন্তু গম্ভীর, ভ্রূ কুঞ্চিত। সে তাহার অশ্বের নিভৃতোর্ধ্ব কর্ণের পানে চাহিয়া বসিয়া আছে। ভাবিতেছে, নিয়তি বারবার তাহাকে প্রতিহিংসার সুযোগ দিতেছে। অদৃষ্টের এ কোন্ ইঙ্গিত? প্রতিশোধের সুযোগ হাতে পাইয়া সে ছাড়িয়া দিবে? হিংসার উত্তরে প্রতিহিংসা লওয়া ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম। তবে কেন সে লইবে না?

চারিদিক নির্জন, কোথাও জনমানব নাই। কদাচিৎ দুই একটা শশক পথপার্শ্ব হইতে সন্তর্পণে উঠিয়া আসিতেছে, আবার অশ্বক্ষুর শব্দে ভীত হইয়া প্লুত গতিতে পলায়ন করিতেছে। পথের উপর দীর্ঘ প্রলম্বিত তরুছায়া ক্রমে হ্রস্ব হইয়া আসিতেছে।

দুইটি অশ্ব পাশাপাশি চলিয়াছে। সুগোপার জলসত্র পিছনে পড়িয়া রহিল। সুগোপা আজ আসে নাই। প্রপা শূন্য।

রট্টা এতক্ষণ চিত্রকের পানে পূর্ণভাবে দৃষ্টিপাত করেন নাই, মনের মধ্যে ঈষৎ সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিলেন। আশা করিয়াছিলেন চিত্রক নিজেই বাক্যালাপ আরম্ভ করিবে। কিন্তু চিত্রক যখন কথা কহিল না

তখন তিনি সযত্নে মনকে সম্বৃত করিয়া চিত্রকের পানে স্মিতমুখ ফিরাইলেন। বলিলেন—'আর্য চিত্রক, আপনি নীরব কেন? সুন্দরী প্রকৃতির এই নবীন শোভা কি আপনাকে আনন্দ দিতে পারিতেছে না?'

চিত্রক রট্টার পানে চক্ষু ফিরাইল। ক্ষণেকের জন্য তাহার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল। কী অপূর্ব রূপবতী এই রাজকন্যা। একটি দেহের মধ্যে কাঠিন্য ও কোমলতা, দৃঢ়তা ও সরসভাব কি অপরূপ সমাবেশ। চিত্রক পূর্বেও একবার রাজকন্যাকে পুরুষবেশে দেখিয়াছে, কিন্তু আজিকার পুরুষবেশ যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন। বেশভূষার পৌরুষ দেহের অনবদ্য নারীত্বকে অলঙ্কৃত করিয়াছে, আবৃত করিতে পারে নাই। পুষ্পবৃন্তের ন্যায় কটিদেশ ঊর্ধ্বে ক্রমশ পরিসর হইয়া যেন কেশর কুসুমের শোভায় বিকশিত হইয়াছে, আপীন বক্ষের উপর দৃঢ়পিনদ্ধ সুবর্ণ জালিক যৌবনের উন্মাদনাকে স্বর্ণ শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সর্বোপরি তীক্ষ্ণ-মধুর মুখখানি। এ মুখ কেবল রক্ত মাংসের সমাবেশে সুন্দর নয়, শুধুই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুষ্ঠু সমর্পণ নয়, মনে হয় মুখের অন্তরালে মানুষটিও বড় সুন্দর, তাই তাহার সৌন্দর্যের নিরুদ্ধ ছটা মুখেও প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

চিত্রকের অশান্ত মন কিন্তু শান্ত হইল না, বরং আরও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। কেন এই রাজকন্যা তাহার সহিত এত মিষ্ট এত সদয় ব্যবহার করিতেছে? ইহা অপেক্ষা যদি নিজ পদগৌরবে গর্বিত হইয়া তাহাকে তুচ্ছজ্ঞান করিত সেও ভাল হইত। রাজকন্যা তাহার সত্য পরিচয় জানে না বলিয়াই এমন স্নিগ্ধ ব্যবহার করিতেছে। যদি জানিত তাহা হইলে কী করিত?

চিত্রক যখন কথা কহিল তখন তাহার কণ্ঠে এই প্রশ্নেরই প্রচ্ছন্ন প্রতিধ্বনি হইল, সে রট্টার দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া ধাবমান অশ্বের নিষ্কম্প চামর শিখার উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া গম্ভীর মুখে বলিল—'রক্ষীদের আগে যাইতে দিয়া আপনি ভাল করেন নাই।'

ভ্রূ বঙ্কিম করিয়া রট্টা বলিলেন—'তাহাতে কী দোষ হইয়াছে?'

চিত্রক বলিয়া উঠিল—'আপনি আমার কতটুকু জানেন? আমি যদি তস্কর দুর্বৃত্ত হই, আপনার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করি, কে আপনাকে রক্ষা করিবে? জানি, দেবদুহিতা বীর্যবতী, আত্মরক্ষায় সমর্থা; তবু তিনি নারী। অজ্ঞাতকুলশীলকে অধিক বিশ্বাস করিতে নাই।'

অধরোষ্ঠ সঙ্কুচিত করিয়া রট্টা সম্মুখ দিকে চাহিলেন; তাঁহার মুকুলিত মুখের হাসিটি ফুটি ফুটি করিয়া ফুটিল না। ক্ষণেক পরে চিত্রকের পানে দৃষ্টি না ফিরাইয়াই তিনি মৃদু-কণ্ঠে বলিলেন—'আপনি কি অজ্ঞাতকুলশীল?'

চিত্রক চকিতে তাঁহার পানে চাহিল।

রট্টা বলিয়া চলিলেন—'আসমুদ্র আর্যভূমির একচ্ছত্র অধীশ্বর স্কন্দগুপ্তের দূতকে অজ্ঞাতকুলশীল বলিলে কি স্কন্দগুপ্তের অবমাননা করা হয় না? কিন্তু এ সকল বৃথা তর্ক। আপনি যদি তস্কর দুর্বৃত্ত হইতেন তাহা হইলে এখনি যে কথা বলিলেন তাহা বলিতে পারিতেন কি? তস্কর কি নিজের বিরুদ্ধে অন্যকে সাবধান করিয়া দেয়?'

বলিয়া রট্টা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। চিত্রকের ইচ্ছা হইল, সে রট্টাকে নিজের পূর্ণ পরিচয় জানাইয়া দিয়া তাহার মুখভাব নিরীক্ষণ করে। ঐ হাসিটি তখন কি অগ্নিদগ্ধ ফুলের মতই শুকাইয়া যাইবে না? অকুণ্ঠ বিশ্বাস-ভরা চোখে ত্রাস ফুটিয়া উঠিবে না?

কিন্তু চিত্রকের মনের ইচ্ছা বাক্যে পরিণত হইল না। তৎপরিবর্তে অধর প্রান্তে একটি ক্ষীণ নিপীড়িত হাসি ফুটিয়া উঠিল।

রট্টা বলিলেন—'ও কথা থাক।—আর্য চিত্রক, আপনি নিশ্চয় অনেক দেশ দেখিয়াছেন? অনেক যুদ্ধ করিয়াছেন?'

চিত্রক সতর্কভাবে বলিল—'হাঁ। দূতীয়ালি আমার জীবনে এই প্রথম।'

রট্টা বলিলেন—'আপনি গল্প বলুন, আমার বড় শুনিবার ইচ্ছা হইতেছে।'

'কী গল্প বলিব?'

'আপনার যাহা ইচ্ছা। যুদ্ধের গল্প, দেশবিদেশের গল্প। পাটলিপুত্র কি খুব সুন্দর নগর?'

'অতি সুন্দর নগর। এমন নগর আর্যাবর্তে নাই।'

'কপোতকূট অপেক্ষাও সুন্দর?'

চিত্রক হাসিল, রট্টার এই বালিকা-সুলভ সরলতা তাহার বড় মিষ্ট লাগিল। সে একটু ঘুরাইয়া বলিল—'কপোতকূটও সুন্দর নগর। কিন্তু কপোতকূট আকারে ক্ষুদ্র, পাটলিপুত্র বৃহৎ, ময়ূরের সঙ্গে কি পারাবতের তুলনা হয়?'

'আর স্কন্দগুপ্ত? তিনি কিরূপ মানুষ?'

'আমি সামান্য দূত, স্কন্দগুপ্তের নিকটে কখনও যাই নাই। দূর হইতে দেখিয়াছি, অতি সুন্দর পুরুষ। আর শুনিয়াছি, তিনি ভাবুক —অদৃষ্টবাদী—'

রট্টা রমণীসুলভ প্রশ্ন করিলেন—'তাঁহার কয়টি মহিষী?'

চিত্রক বলিল—'স্কন্দ কুমারব্রতধারী, বিবাহ করেন নাই।'

রট্টা বিস্ফারিত নেত্রে বলিলেন—'আশ্চর্য!'

চিত্রক নিজের কথা ভাবিতে ভাবিতে বলিল—'আশ্চর্য বটে। কিন্তু এরূপ আশ্চর্য ঘটনা পৃথিবীতে অনেক ঘটিয়া থাকে। আমার যোদ্ধ-জীবনে আমি অনেক দেখিয়াছি।'

'তবে সেই সব কাহিনী বলুন। আমি শুনিব।'

রট্টার আগ্রহ দেখিয়া চিত্রক একটু হাসিল। অজানিত ভাবে তাহার মনের তিক্ততা দূর হইতেছিল। মনের মধ্যে অনেক বিরুদ্ধ ভাবনা জমা হইলে মানুষ হৃদয়-ভার লাঘব করিতে চাহে, আত্মকথা

বলিবার সুযোগ পাইলে সুখী হয়। চিত্রক ধীরে ধীরে নিজ জীবনের অনেক কাহিনী বলিতে লাগিল। কেবল আত্ম-পরিচয়টি গোপন করিয়া আর সব সত্য কথা বলিল। যুদ্ধের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, নানা দেশের নানা মানুষের অদ্ভুত আচার ব্যবহার, তাহাদের বেশবাস কথাবার্তা—

এদিকে ঘোড়া দুইটি চলিয়াছে, পথেরও বিরাম নাই। উপত্যকায় ছায়াশীতল হইয়া, অধিত্যকায় রবিতপ্ত হইয়া কদাচিৎ গিরি নির্ঝরিণীর জলে অঙ্গ ডুবাইয়া পথ চলিয়াছে। কিন্তু পথের দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। রট্টা তন্ময় হইয়া গল্প শুনিতেছেন।

যে গল্প বলে এবং যে গল্প শোনে তাহাদের মধ্যে ক্রমশ মনোগত ঐক্য স্থাপিত হয়, দুইটি মন এক সুরে বাঁধা হইয়া যায়। চিত্রক গল্প বলিতে বলিতে কদাচিৎ সচেতন হইয়া ভাবিতেছিল—কী আশ্চর্য মনে হইতেছে আমি একান্ত আপনার জনকে আমার জীবন কথা শুনাইতেছি! আর রট্টা—তিনি বোধহয় কিছুই ভাবিতেছিলেন না, শুধু এই কথকের সত্তার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন।

দীর্ঘকাল নানা কাহিনী বলিবার পর চিত্রক যেন চমকিয়া সজাগ হইয়া উঠিল, অপ্রতিভ ভাবে বলিল—'আর না, নিজের কথা অনেক বলিয়াছি।'

রট্টা বলিলেন—'আরও বলুন।'

চিত্রক হাসিল, একটু পরিহাস করিয়া বলিল—'রাজকন্যাদের কি ক্ষুধা তৃষ্ণার বালাই নাই? ওদিকে বেলা কত হইয়াছে তাহার সংবাদ রাখেন কি?'

রট্টা চকিতে ঊর্ধ্বে চাহিলেন। সূর্য মধ্য গগনে। কখন কোন দিক দিয়া সময় কাটিয়া গিয়াছে তিনি জানিতে পারেন নাই।

রট্টা বলিলেন—'ছি ছি, এত গল্প বলিয়া নিশ্চয় আপনার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে।'

চিত্রক বলিল—'তা হইয়াছে। আপনার ?'

রট্টা সলজ্জে হাসিলেন—'আমারও। এতক্ষণ জানিতে পারি নাই। কিন্তু উপায় কি ? সঙ্গে তো খাদ্যদ্রব্য নাই।'

'উপায় আছে। ঐ দেখুন—' বলিয়া চিত্রক পার্শ্বের দিকে অঙ্গুলি তুলিয়া দেখাইল।

পাশাপাশি দুই শ্রেণী পাহাড়ের মাঝখানে অপরিসর উপত্যকা, পথটি তাহার উপর দিয়া গিয়াছে। বাম পার্শ্বের পাহাড়ে কিছু উচ্চে পাষাণগাত্রে সারি সারি কয়েকটি চতুষ্কোণ রন্ধ্র দেখা যায়; পাথর কাটিয়া মানুষের বাসস্থান রচিত হইয়াছে। চিত্রকের অঙ্গুলি নির্দেশ অনুসরণ করিয়া রট্টা দেখিলেন—একটি দেবায়তন; সম্ভবতঃ বুদ্ধের সংঘ। এখানে যে মনুষ্য বাস করে তাহার প্রমাণ, একটি গবাক্ষ হইতে পীতবর্ণ বস্ত্র লম্বিত হইয়া অলস বাতাসে দুলিতেছে।

চিত্রক বলিল—'যখন বস্ত্র আছে তখন মানুষ অবশ্য আছে; মানুষ থাকিলেই খাদ্য থাকিবে। সুতরাং আর বিলম্ব না করিয়া ঐ দিকে যাওয়াই কর্তব্য।'

রট্টা হাসিয়া সম্মতি দিলেন। কিন্তু ঘোড়ার পিঠে ওখানে ওঠা যাইবে না। ঘোড়া দুটিকে একটি শষ্পাকীর্ণ স্থানে ছাড়িয়া দিয়া উভয়ে পাহাড়ের চড়াই ধরিলেন।

স্থানটি উচ্চ হইলেও দুরধিগম্য নয়; উপরন্তু মনুষ্যপদচিহ্নিত একটি ক্ষীণ পথরেখা আছে। শিলাবন্ধুর অসমতল পর্বতগাত্র বাহিয়া চিত্রক অগ্রে চলিল; রট্টা তাহার পশ্চাতে রহিলেন।

অর্ধদণ্ড পরে উপরে উঠিয়া রট্টা দেখিলেন, সংঘই বটে; পাষাণে উৎকীর্ণ কয়েকটি কক্ষ, সম্মুখে সমতল চত্বর। চত্বরের মধ্যস্থলে তথাগতের শিলামূর্তি। উপত্যকা হইতে যে গবাক্ষগুলি দেখা গিয়াছিল তাহা সংঘের পশ্চাৎভাগ।

বট্টা প্রথমে বুদ্ধের ধ্যানাসীন মূর্তির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। চিত্রকও পাশে দাঁড়াইল।

বট্টা যোড়হস্তে ভক্তিনম্র কণ্ঠে বলিলেন—'নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স।' যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়া বট্টা চিত্রককে বলিলেন—'আপনিও ভগবানকে প্রণাম করুন। বলুন, নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স—।'

বট্টার অনুসরণ করিয়া চিত্রক ভগবান তথাগতকে প্রণতি জানাইল, তারপর ঈষৎ বিস্ময়ে বট্টার দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—'আপনি এ মন্ত্র কোথায় শিখিলেন?'

বট্টা বলিলেন—'আমার পিতার কাছে।'

প্রাঙ্গণে এতক্ষণ অন্য কেহ ছিল না, এখন প্রকোষ্ঠের ভিতর হইতে একটি পীতবেশধারী শ্রমণ বাহির হইয়া আসিলেন। মুণ্ডিত মস্তক, শীর্ণ কলেবর, মুখে প্রসন্ন বৈরাগ্য। সহাস্যে দুই হস্ত তুলিয়া বলিলেন—'আরোগ্য।'

বট্টা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিলেন—'আর্য, আমরা দুইজন ক্ষুধার্ত পান্থ, তব প্রসাদ ভিক্ষা করি।'

ভিক্ষু বলিলেন—'বট্টা যশোধরা, বুদ্ধ তোমার প্রতি প্রসন্ন। এস, তোমরা ভিতরে এস।

ভিক্ষু তাঁহাকে চিনিয়াছেন দেখিয়া বট্টার মুখ আনন্দে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—'আর্য আমাকে চিনলেন কি করিয়া? পূর্বে কি দেখিয়াছেন?'

ভিক্ষু বলিলেন—'দেখি নাই, তোমার বেশভূষা হইতে অনুমান করিয়াছি। মহারাজ ধর্মাদিত্যের কাছে যাইতেছ?'

'আজ্ঞা। ইনি আমার সহচর, মগধের রাজদূত।'

ভিক্ষু একবার চিত্রকের প্রতি স্মিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কিছু বলিলেন না।

অতঃপর সংঘচ্ছায়ার প্রবেশ করিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালন পূর্বক পথিক দুইজন একটি প্রকোষ্ঠে বসিলেন। ভিক্ষু তাহাদের জন্য খাদ্য আনিয়া দিলেন, কিছু দ্বিদল সিদ্ধ, কিছু সিক্ত চিপিটক, কয়েকটি শুষ্ক দ্রাক্ষাফল ও খর্জুর। ক্ষুধার সময়, উভয়ে পরম তৃপ্তির সহিত তাহাই অমৃতজ্ঞানে আহার করিতে লাগিলেন।

আহারের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কথোপকথন হইতে লাগিল।

রট্টা জিজ্ঞাসা করিলেন—'দেব, এখানে আপনারা কয়জন আছেন? আর কাহাকেও দেখিতেছি না।'

ভিক্ষু বলিলেন—'আমরা চারিজন আছি। দুইজন বক্ষে জল ভরিতে গিয়াছেন। একজন পীড়িত।'

রট্টা মুখ তুলিলেন—'পীড়িত? কী পীড়া?'

ভিক্ষু ঈষৎ হাসিলেন—'সংসার—পীড়া। সংঘে থাকিলেও মারের হস্ত হইতে নিস্তার নাই।'

চিত্রক প্রশ্ন করিল—'আপনারা এখানে নিঃসঙ্গ থাকেন? দিবারাত্র কি করেন?'

ভিক্ষু বলিলেন—'সংসার ভুলিবার চেষ্টা করি।'

আহারান্তে আচমন করিয়া রট্টা আবার আসিয়া বসিলেন, বলিলেন—'আর্য, কিছু উপদেশ দিন।'

ভিক্ষু হাসিলেন—'আমি আর কী উপদেশ দিব? সহস্র বৎসর পূর্বে শাক্যমুনির শ্রীমুখ হইতে যে বাণী নিঃসৃত হইয়াছিল তাহাই শুন।—'মন হইতে প্রবৃত্তির উৎপত্তি, মন যদি প্রসন্ন নিষ্কলুষ থাকে, সুখ ছায়ার মতো তোমার পিছনে থাকিবে।'

রট্টা প্রণাম করিয়া বলিলেন—'আমি ধন্য।'—ভিক্ষুর পদপ্রান্তে একটি স্বর্ণ দীনার রাখিয়া বলিলেন—'সংঘের অর্ঘ্য।'

ভিক্ষু বলিলেন—'স্বর্ণে প্রয়োজন নাই। কল্যাণি, যদি সংঘকে দান

করিতে ইচ্ছা কর, এক আঢ়ক গোধুম দিও। দীর্ঘকাল আমরা গোধূম দেখি নাই। যে শ্রমণটি অসুস্থ তিনি গোধূমের জন্য কিছু কাতর হইয়াছেন।' বলিয়া মৃদু হাসিলেন।

'সত্বর পাঠাইব'—বলিয়া রট্টা গাত্রোত্থান করিলেন।

চিত্রক দণ্ডায়মান ছিল; সে শুষ্কস্বরে বলিল—'মহাশয়, আমাকেও কিছু উপদেশ করুন।'

ভিক্ষু প্রশান্ত চক্ষু তাহার পানে তুলিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন—'শাক্যমুনির উপদেশ শ্রবণ কর: "সে আমাকে গালি দিয়াছে, আমাকে প্রহার করিয়াছে, নিঃস্ব করিয়াছে"—এই কথা যে চিন্তা করে তাহার ক্রোধ কখনও শান্ত হয় না। বৈরভাব কেবল অবৈরভাব দ্বারা শান্ত হয়, ইহাই চিরন্তন ধর্ম।'

* * * *

দুই অশ্বারোহী আবার চলিয়াছেন। সূর্য তাহাদের বামে ঢলিয়া পড়িয়াছে। তির্যক অংশু তেমন তীক্ষ্ণ নয়।

উভয়ে নিজ নিজ অন্তরে নিমগ্ন, বাক্যালাপ অধিক হইতেছে না। চিত্রক গল্প বলিবার কালে রট্টার প্রতি যে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা অনুভব করিয়াছিল, তাহা আবার সংশয়ের কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

ভিক্ষু যে-কথা বলিলেন তাহার অর্থ কি? বৈরভাবের পরিবর্তে বৈরভাব পোষণ করাই স্বাভাবিক, অবৈরভাব কি করিয়া পোষণ করা যায়? ইহা ভিক্ষুর ধর্ম হইতে পারে, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম কদাচ নয়। প্রতিহিংসা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। শুধু তাহাই নয়, ইহা চিত্রকের প্রকৃতিগত স্বধর্ম। ইহা তাহার ধাতু।

অথচ—এত সুযোগ পাইয়াও সে রট্টার উপর প্রতিহিংসা সাধন করিতে পারিতেছে না কেন? রট্টা সুন্দরী যৌবনবতী নারী—এই জন্য?

সুন্দরী নারীর মোহে সে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম বিস্মৃত হইবে? পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবে না?

সহসা মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় একটি চিন্তা চিত্রকের মনে খেলিয়া গেল। সে উচ্চকিত হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে আকাশের পানে চাহিল। কোন্ মূঢ়তার জালে তাহার মন এতক্ষণ জড়াইয়া ছিল? এ কথা তাহার মনে উদয় হয় নাই কেন?

সে মনে মনে বলিল—আমি ক্ষত্রিয়, বৈরতা আমার স্বধর্ম, কিন্তু বট্টার সহিত বৈরতা করিব কেন? সে আমার অনিষ্ট করে নাই। তাহার পিতার অপরাধে তাহাকে দণ্ড দেওয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম নয়! যদি প্রতিশোধ লইতে হয় তাহার পিতার উপর লইব।

দারুণ সমস্যার সমাধান হইলে হৃদয় লঘু হয়। মুহূর্তে চিত্রকের অন্তরের কুজ্ঝটিকা কাটিয়া গিয়া আনন্দের দিব্য জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। সে উৎফুল্ল নেত্রে বট্টার পানে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

চকিতে স্মিত নেত্র তুলিয়া বট্টা বলিলেন—'কি হইল?'

চিত্রক বলিল—'ভিক্ষু বলিয়াছিলেন, সুখ ছায়ার মতো আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। ঐ দেখুন সেই ছায়া!'

বট্টা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, সঞ্চরমান অশ্বারূঢ় ছায়া নাচিতে নাচিতে তাঁহার সঙ্গে চলিয়াছে।

উভয়ে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন।

চারিদিকে বিস্তীর্ণ তরঙ্গায়িত উপত্যকা। পাহাড় দূরে সরিয়া গিয়াছে। দূর হইতে তাঁহাদের হাসির গদগদ প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিল। যেন মিলন মুহূর্তের সলজ্জ চুপিচুপি হাসি। কানে কানে হাসি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পান্থশালা

চিত্রক ও রাজকুমারী রট্টা যখন পান্থশালায় উপনীত হইলেন তখন সূর্যাস্ত হইতে আর দণ্ড দুই বাকি আছে।

দুইটি পথের সন্ধিস্থলে পান্থশালাটি অবস্থিত। যে পথ চষ্টন দুর্গের সহিত কপোতকূটের সংযোগ স্থাপন করিয়াছে, এই স্থানে সেই পথ হইতে একটি শাখা বাহির হইয়া অগ্নি-কোণে আর্যাবর্তের দিকে চলিয়া গিয়াছে, দ্বিধা-ভিন্ন পথের মধ্যস্থলে প্রস্তর প্রাকারবেষ্টিত এই পান্থশালা।

স্থানটি মনোরম। উত্তর ও পূর্বদিকে ঘন পর্বতের শ্রেণী; পশ্চিমদিকে বহুদূর পর্যন্ত উন্মুক্ত উপত্যকা। এই উপত্যকার মধ্য দিয়া একটি উপল-কুটিলা ক্ষুদ্র নদী বহিয়া গিয়াছে; মনে হয় পূর্বদিকের পর্বতকন্দর হইতে নির্গত এক রজতবর্ণ নাগ শ্লথগতিতে অস্তাচলের পানে কোন নূতন বিবরের সন্ধানে চলিয়াছে।

পান্থশালাটি আয়তনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও দুর্গের আকারে নির্মিত, উচ্চ পাষাণ-প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। জনালয় হইতে দূরে অবস্থিত পথপার্শ্বে পান্থশালা নির্মাণ করিতে হইলে বেশ দৃঢ় করিয়া নির্মাণ করিতে হয়। একে তো এ অঞ্চলে খণ্ড যুদ্ধাদি লাগিয়াই আছে, তদুপরি উত্তর-পশ্চিমের গিরিসঙ্কট মধ্যে যে সকল বন্য জাতি বাস করে তাহারা বড়ই দুর্দম প্রকৃতি। তাহারা মেষ পালনের অবকাশকালে দল বাঁধিয়া দস্যুতা করে। পথে অরক্ষিত যাত্রিদল পাইলে লুটপাট করে; সুযোগ পাইলে পান্থশালাকেও অব্যাহতি দেয় না। তাই দিবাভাগে পান্থশালার লৌহ-কণ্টকযুক্ত দ্বার খোলা থাকিলেও সূর্যাস্তের সঙ্গে উহা

বন্ধ হইয়া যায়। তখন আর কাহারও প্রবেশাধিকার থাকে না; চিরাগত যাত্রীরা দ্বারের বাহিরে রাত্রি যাপন করে।

চিত্রক ও রট্টা পান্থশালার তোরণমুখে উপস্থিত হইলে পান্থপাল ছুটিয়া আসিয়া যোড়হস্তে অভ্যর্থনা করিল—'আসুন, কুমার ভট্টারিকা, আপনার পদার্পণে আমার স্থান পবিত্র হইল। —দূত মহাশয়, আপনিও স্বাগত। আমি ভাগ্যবান, অদ্য আজ—' বলা বাহুল্য, পান্থপাল পূর্বেই নকুল প্রমুখাৎ সংবাদ পাইয়াছিল যে ইঁহারা আসিতেছেন।

চিত্রক ও রট্টা অশ্ব হইতে অবরোহণ করিলেন। পান্থপাল ব্যস্ত হইয়া ডাকিল—'ওরে কে আছিস—কঙ্ক ভ়ঙ্ভ—শীঘ্র কাম্বোজ দুটিকে মন্দুরায় লইয়া যা, যব-শক্তু, শালি-প্রিয়ঙ্গু দিয়া সেবা কর।'

দুইজন কিঙ্কর আসিয়া অশ্ব দুটির বল্গা ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেল। রট্টা জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমার রক্ষীরা কি চলিয়া গিয়াছে?'

পান্থপাল বলিল—'আজ্ঞা হাঁ। নকুল মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল না কিন্তু কুমার ভট্টারিকার আদেশ অলঙ্ঘনীয়। তাঁহারা দ্বিপ্রহরেই চলিয়া গিয়াছেন।'

পান্থপাল মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, স্থূলকায় কিন্তু নিরেট। বচনবিন্যাসে বেশ পটু। চিত্রক তাহাকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল 'এখানে দেবদুহিতা রাত্রিযাপন করিলে ভয়ের কোনও কারণ নাই?'

'ভয়! আমার পান্থশালার দ্বার বন্ধ হইলে মূষিকেরও সাধ্য নাই ভিতরে প্রবেশ করে।'' পান্থপাল কণ্ঠস্বর হ্রস্ব করিয়া বলিল—'তবে ভিতরে কয়েকটি পান্থ আছে। তাহারা বিদেশী বণিক, পারস্যদেশ হইতে আসিতেছে; মগধে যাইবে—'

'তাহারা কি বিশ্বাসযোগ্য নয়?'

'বিশ্বাসের অযোগ্য বলিতে পারি না। ইহারা বহু বৎসর ধরিয়া এই পথে গতায়াত করিতেছে। মেষরোমের আস্তরণ গাত্রাবরণ প্রভৃতি লইয়া

আর্যাবর্তেব বিভিন্ন প্রান্তে বাণিজ্য কবিযা বেড়ায়। তবে উহারা অগ্নি-উপাসক, ম্লেচ্ছ। সাবধানেব নাশ নাই।'

'কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন কর্তব্য?'

পান্থপাল বলিল—'ইনি দেবদুহিতা একথা প্রকাশ না কবিলেই চলিবে। ইনি আসিতেছেন তাহা আমি ভিন্ন আর কেহ জানেনা।'

চিত্রক দেখিল পান্থপাল লোকটি চতুব ও প্রত্যুৎপন্নমতি, সে বলিল—'ভাল।—পান্থপাল, তোমাব নাম কি?'

পান্থপাল সবিনযে বলিল—'দেবদ্বিজেব কৃপায় এ দাসেব নাম জম্বুকম্বু। কিন্তু আযভাষা সকলেব মুখে উচ্চাবণ হয না, কেহ কেহ জম্বুক বলিযা ডাকে।'

চিত্রক হাসিযা বলিল—'ভাল। জম্বুক, আমাদেব ভিতবে লইযা চল। আমবা শ্রান্ত হইযাছি।'

জম্বুক বলিল—'আসুন মহাভাগ, আসুন দেবি—। আপনাদেব জন্য শ্রেষ্ঠ দুটি কক্ষ সজ্জিত কবিযা বাখিযাছি। এদিকে স্নিগ্ধ অম্লসীধু প্রস্তুত আছে, অনুমতি হইলেই—'

চিত্রক ও বট্টা প্রাকাবেব অভ্যন্তবে প্রবেশ কবিলেন। সূর্য তখনও অস্ত যায় নাই, কিন্তু জম্বুকেব আদেশে দুইজন দ্বাবী দ্বাব বন্ধ কবিযা ইন্দ্রকীলক আঁটিয়া দিল। কাল সূর্যোদয় পর্যন্ত আব কেহ প্রবেশ কবিতে পাবিবে না।

বট্টা পূর্বে কখনও পান্থশালা দেখেন নাই, তিনি পবম কৌতূহলের সহিত চাবিদিকে দৃষ্টি ফিবাইযা দেখিতে দেখিতে চলিলেন। প্রাচীর দ্বাবা পবিবৃত স্থানটি চতুষ্কোণ, তিনটি প্রাচীবেব গাযে সাবি সাবি প্রকোষ্ঠ, প্রকোষ্ঠগুলিব সম্মুখে একটানা অপ্রশস্ত অলিন্দ। মধ্যস্থলে শিলাপট্টাবৃত সুপবিসব উন্মুক্ত অঙ্গন। অঙ্গনেব কেন্দ্রস্থলে চক্রাকৃতি বৃহৎ জলকুণ্ড।

অঙ্গনের এক কোণে কয়েকটি উষ্ট্র ও গর্দভ রহিয়াছে, তাহারা পারসিক বণিকদের পণ্যবাহক। পারসিকেরা নিকটেই আস্তরণ বিছাইয়া বসিয়া আছে এবং নিজেদের মধ্যে বস্রালাপ করিতেছে। তাহাদের মুখমণ্ডল শ্মশ্রু-মণ্ডিত, বর্ণ পক্ক দাড়িম্বের ন্যায়, চক্ষু ও কেশ ঘনকৃষ্ণ।

রট্টা যখন চিত্রক ও জম্বুকের সহিত তাহাদের নিকট দিয়া চলিয়া গেলেন তখন তাহারা একবার চক্ষু তুলিয়া দেখিল, তারপর আবার পরস্পর বাক্যালাপ করিতে লাগিল। ইহারা নিতান্ত নিরীহ বণিক, ছদ্মবেশী দস্যু তস্কর নয়, কিন্তু চিত্রকের মন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। নারী লইয়া পথ চলা যে কিরূপ উদ্বেগজনক কাজ এ অভিজ্ঞতা পূর্বে তাহার ছিল না।

চিত্রক নিম্নস্বরে জম্বুককে প্রশ্ন করিল—'ইহারা কয়জন?'

জম্বুক বলিল—'পাঁচজন।'

'সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র আছে?'

'আছে। অস্ত্র না লইয়া এদেশে কেহ পথ চলে না।'

'তোমার ভৃত্য অনুচর কয়জন?'

'আমরা পুরুষ আট জন আছি।'

'স্ত্রীলোকও আছে নাকি?'

জম্বুক প্রাঙ্গণের বিপরীত প্রান্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—'আমাদের চারিজন অন্তঃপুরিকা আছে।'

চিত্রক অনেকটা আশ্বস্ত হইল।

অঙ্গনের অন্য প্রান্তে চারিজন নারী বসিয়া গৃহকর্ম করিতেছিল। রট্টা সেখানে গিয়া স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। চত্বরের কিয়দংশ পরিষ্কৃত করিয়া নারীগণ নৈশ ভোজনের আয়োজন করিতেছে। একজন যবট্ট ঘুরাইয়া গোধূম চূর্ণ করিতেছে, নবচূর্ণিত গোধূম হইতে

রোটিকা প্রস্তুত হইবে। দ্বিতীয়া শাক বাছিতেছে, তৃতীয়া প্রস্তর উদূখলে সুগন্ধি বেশার কুট্টন করিতেছে, চতুর্থী মেষমাংস ছুরিকা দিয়া কাটিয়া কাটিয়া পৃথক করিয়া রাখিতেছে। তাহারা মাঝে মাঝে সম্ভ্রম কৌতূহলপূর্ণ চক্ষু তুলিয়া এই পুরুষবেশিনী সুন্দরীকে দেখিল, কিন্তু তাহাদের ক্ষিপ্র নিপুণ হস্তের কার্য শিথিল হইল না।

রট্টা কিছুক্ষণ ইহাদের মসৃণ কর্মদক্ষতা নিরীক্ষণ করিলেন। তারপর একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া জম্বুকের দিকে ফিরিলেন—'জম্বুক, তোমাকে একটি কাজ করিতে হইবে।'

জম্বুক তৎক্ষণাৎ বদ্ধপাণি হইল—'আজ্ঞা করুন।'

'কপোতকূটের পথে পর্বতের উপর একটি বৌদ্ধবিহার আছে জান কি?'

'আজ্ঞা জানি। চিত্রকূট বিহার।'

'সেখানে ভিক্ষুদের জন্য দুই আঢক উত্তম গোধূম পাঠাইতে হইবে।'

'আজ্ঞা পাঠাইব। কল্য প্রাতেই [illegible] গোধূম পাঠাইয়া দিব। ভিক্ষুরা মধ্যাহ্নের পূর্বেই পাইবেন।'

'[illegible]। আশীর্বাদ।'

* * * *

চিত্রক ও রট্টার জন্য যে দুটি কক্ষ নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা আকার ও আয়তনে অন্যান্য কক্ষের মতই, কিন্তু মেঝের কুট্টিমে উষ্ট্ররোমের আস্তরণ বিস্তৃত হইয়াছিল, তদুপরি কোমল শয্যা। কোণে পিত্তলের দীপদণ্ডে বর্তি জ্বলিতেছে। রাজকুমারীর পক্ষে ইহা তুচ্ছ আয়োজন, কিন্তু দেখিয়া রট্টা প্রীত হইলেন।

[illegible] সংযোগে কিছু খাদ্যের মণ্ড ভক্ষণ করিয়া উভয়ে আপাতত ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি করিলেন। রাত্রির আহার বাকি রহিল।

আহারান্তে চিত্রক গাত্রোত্থান করিয়া রট্টাকে বলিল—'আপনি

এখন কিয়ৎকাল বিশ্রাম করুন।' বলিয়া রট্টার কক্ষের দ্বার ভেজাইয়া দিয়া বাহিরে আসিল।

আকাশে তখন নক্ষত্র ফুটিয়াছে, রাত্রি অন্ধকার, এখনও চন্দ্রোদয় হয় নাই। পান্থশালার প্রাঙ্গণের স্থানে স্থানে অগ্নি জ্বলিতেছে। ওদিকে পারসিকেরা অঙ্গার কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া শূল্য মাংস করিতেছে, দগ্ধ মাংসের রেশার-মিশ্র সুগন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে লুব্ধ করিয়া তুলিতেছে।

চিত্রক বলিল—'হিন্দু-পলাণ্ডু-ভোজী ম্লেচ্ছগুলা রাঁধে ভাল। জম্বুক, রাত্রে আমাদের ভোজনের কি ব্যবস্থা?'

জম্বুক ভোজ্য বস্তুর দীর্ঘ তালিকা দিল। প্রথমেই মিষ্টান্নঃ মধু পিষ্টক লড্ডুক ও ক্ষীর, তারপর শাক ঘৃত-তণ্ডুল মুদগ-সূপ, ময়ূর-ডিম্ব, সর্বশেষে রোটিকা পুরোডাশ ও তিন প্রকার অবদংশ সহ উখ্য মাংস শূল্য মাংস ও দধি।

চিত্রক সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—'উত্তম। দেবদুহিতার কষ্ট না হয়। আর শুন, শূল্য মাংস আমি রন্ধন করিব।'

জম্বুক চক্ষু বিস্ফারিত করিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিল—'যেরূপ আপনার অভিরুচি।'

চিত্রক কক্ষের সম্মুখে অঙ্গনের উপর একটা স্থান নির্দেশ করিয়া বলিল—'এইখানে অঙ্গার চুল্লী রচনা কর।'

জম্বুকের আদেশে ভৃত্য আসিয়া অঙ্গারচুল্লী রচনায় প্রবৃত্ত হইল। এই অবকাশে ইতস্তত পাদচারণা করিতে করিতে চিত্রক লক্ষ্য করিল, কক্ষশ্রেণী যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে একটি বংশনির্মিত নিঃশ্রেণি বক্রভাবে ছাদসংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহার মন আবার সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। ছাদে উঠিবার সিঁড়ি কেন? উপরে যদি কেহ লুকাইয়া থাকে? চিত্রক জম্বুককে সিঁড়ি দেখাইয়া বলিল—'ছাদে কী আছে?'

জম্বুক বলিল—'শুষ্ক জ্বালানি কাষ্ঠ আছে। আর কিছু নাই।'

চিত্রকের সন্দেহ ঘুচিল না; সে স্বচক্ষে দেখিবার জন্য নিঃশ্রেণি বাহিয়া ছাদে উঠিয়া গেল। জম্বুককে বলিল—'তুমিও এস।'

ছাদের উপর সত্যই জ্বালানি কাষ্ঠ ভিন্ন আর কিছু নাই। চিত্রক নক্ষত্রালোকে ত্রিভুজ ছাদের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। ছাদের উপর মন্দ মন্দ শীতল বায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল: চারিদিক শব্দহীন, অন্ধকার; কেবল গিরিনদীর বুকে নক্ষত্র খচিত আকাশের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে।

চিত্রক নামিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় বাহিরের অন্ধকার হইতে এক উৎকট অট্ট-কোলাহল উত্থিত হইয়া চিত্রককে চমকিত করিয়া দিল। একদল শৃগাল নিকটেই কোথাও বসিয়া যাম ঘোষণা করিতেছে।

তাহাদের সম্মিলিত ক্রোশন ক্রমে শান্ত হইলে চিত্রক হাসিয়া উঠিল, বলিল—'এখানে জম্বুকের অভাব নাই দেখিতেছি।'

জম্বুক হাসিল, বলিল—'পৃথিবীতে জম্বুকের অভাব কোথায়? তবে রুষকম্ব বড় অধিক নাই মহাশয়।'

চিত্রক বলিল—'সেকথা সত্য। তুমি উত্তম পান্থপাল।'

এই সময় পশ্চিম দিগন্তের পানে দৃষ্টি পড়িতে চিত্রক দেখিল, বহুদূরে চক্রবাল রেখার নিকট যেন পাহাড়ে আগুন লাগিয়াছে; আগুন দেখা যাইতেছে না, কেবল তাহার উৎসারিত প্রভা দিগন্তকে রঞ্জিত করিয়াছে।

অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া চিত্রক জিজ্ঞাসা করিল—'উহা কি? পাহাড়ের জঙ্গলে কি আগুন লাগিয়াছে?'

জম্বুক বলিল—'বোধহয় না। কয়েকদিন ধরিয়া দেখিতেছি, একই স্থানে আছে। পাহাড়ের আগুন হইলে দক্ষিণে বামে ব্যাপ্ত হইত।'

'তবে কী? ওদিকে কি কোনও নগর আছে? কিন্তু নগর

থাকিলেও রাত্রে এত আলো জ্বলিবে কেন? ইহা তো দীপোৎসবের সময় নয়।'

'ওদিকে নগর নাই। তবে—'

'তবে?'

জম্বুক বলিল—'পান্থশালায় অনেক লোক আসে যায়, অনেক কথা শুনিতে পাই। শুনিয়াছি, হূণ আবার আসিতেছে। যদি কথা সত্য হয়, আবার দেশ লণ্ডভণ্ড হইবে।' বলিয়া জম্বুক নিশ্বাস ফেলিল।

চিত্রক বলিল—'তোমার কি মনে হয় হূণেরা ঐখানে স্কন্ধাবার ফেলিয়াছে?'

জম্বুক বলিল—'না, তাহা মনে হয় না। হূণেরা এত কাছে আসিলে লুটপাট করিত, অত্যাচার করিত। কিন্তু এদিকে হূণ দেখি নাই।'

'তবে কী হইতে পারে?'

'জনশ্রুতি শুনিয়াছি, সম্রাট স্কন্দগুপ্ত সসৈন্যে হূণের গতিরোধ করিতে আসিয়াছেন।'

চিত্রক বিস্মিত হইয়া বলিল—'স্কন্দগুপ্ত স্বয়ং।'

জম্বুক বলিল—'এইরূপ শুনিয়াছি। সত্য মিথ্যা বলিতে পারি না। কেন, আপনি কিছু জানেন না?'

চিত্রক চকিতে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল—'না, আমি কিছু জানি না। যুদ্ধ সম্ভাবনার পূর্বেই আমি পাটলিপুত্র ছাড়িয়াছি।'

চিত্রক ও জম্বুক নীচে নামিয়া আসিল।

ভৃত্য ইতিমধ্যে অঙ্গার প্রস্তুত করিয়া শূল্য মাংসের উপকরণাদি আনিয়া রাখিয়াছে। চিত্রক তাহা দেখিয়া প্রথমে গিয়া রট্টার রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইল। কাণ পাতিয়া শুনিল, কিন্তু কিছু শুনিতে পাইল না। তখন সে দ্বার ঈষৎ ঠেলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিল। দীপের স্নিগ্ধ আলোকে রট্টা শয্যায় শুইয়া আছেন, একটি বাহু চক্ষুর উপর

স্তব্ধ। বোধহয় নিদ্রাবেশ হইয়াছে। এই নিভৃত দৃশ্য দেখিয়া চিত্রকের মন এক অপূর্ব সম্মোহে পূর্ণ হইয়া উঠিল; মৃগমদ-সৌরভের ন্যায় মাদক-মধুর রসোচ্ছ্বাসে হৃৎকুম্ভ কণ্ঠ পর্যন্ত ভরিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। মনে মনে বলিল—ঘুমাও, রাজকুমারী, ঘুমাও।

* * * *

চাঁদ উঠিয়াছে। কৃষ্ণা চতুর্থীর চন্দ্র পূর্বাচলের মাথায় উঠিয়া ক্লান্ত হাসি হাসিতেছে। পান্থশালার অঙ্গন শূন্য, পারসিকেরা নিজ প্রকোষ্ঠে দ্বার বন্ধ করিয়াছে। অঙ্গন স্তিমিত জ্যোৎস্নায় পাণ্ডুর।

চিত্রক রট্টার দ্বারে করাঘাত করিয়া ডাকিল—দেবি উঠুন উঠুন, আহার প্রস্তুত।'

দ্বার খুলিয়া রট্টা হাসিমুখে সম্মুখে দাঁড়াইলেন, ঈষৎ জড়িত কণ্ঠে বলিলে,—'ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।'

সম্মুখেই অলিন্দে আহারের আসন হইয়াছিল, দুইটি আসন মুখোমুখি; মধ্যে বহু কটোর এবং স্থালীতে খাদ্য সম্ভার। পাশে দুইটি দীপ জ্বলিতেছে। উভয়ে আহারে বসিলেন; জম্বুক দাঁড়াইয়া তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল।

আহারের সঙ্গে সঙ্গে দুই চারিটি কথা হইতেছে। জম্বুক মাঝে মাঝে চিত্তবিনোদনের জন্য কৌতুকজনক উপাখ্যান বলিতেছে। রাজকন্যা হাসিতেছেন; তাঁহার মুখে তৃপ্তি, চোখে নিরুদ্বেগ প্রশান্তি। চিত্রক নিজ হৃদয় মধ্যে একটি আন্দোলন অনুভব করিতেছে, যেন সাগর-তরঙ্গে তাহার হৃদয় দুলিতেছে ফুলিতেছে, উঠিতেছে নামিতেছে—

রট্টা বলিলেন—'কাল পিতার দর্শন পাইব ভাবিয়া বড় আনন্দ হইতেছে।'

চিত্রকের মনের উপর ছায়া পড়িল। রট্টার পিতা···তাহার সহিত চিত্রকের একটা বোঝাপড়া আছে···কিন্তু সে চিন্তা এখন নয়···

চিত্রক বলিল—'একটা জনরব শুনিলাম।—পরমভট্টারক স্কন্দগুপ্ত নাকি চতুরঙ্গ সেনা লইয়া এদেশে আসিয়াছেন।'

রট্টা চকিত চক্ষু তুলিলেন—'স্কন্দগুপ্ত !'

চিত্রক নির্লিপ্তস্বরে বলিল—'হাঁ। হূণ আবার আসিতেছে, তাই মহারাজ তাহাদের গতিরোধ করিবার জন্য স্বয়ং আসিয়াছেন।'

রট্টা কিয়ৎকাল নতমুখে রহিলেন, তারপর মুখ তুলিয়া বলিলেন – 'আপনি সম্ভবত প্রভুর সহিত মিলিত হইতে চাহেন ?'

চিত্রক বলিল—'সে পরের কথা। আগে আপনাকে চষ্টনদুর্গে পৌঁছাইয়া দিয়া তবে অন্য কাজ।'

রট্টা তাহার মুখের উপর ছায়া-নিবিড় চক্ষুদুটি স্থাপন করিয়া স্নিগ্ধ হাসিলেন।

আহার সমাপ্ত হইলে রট্টা জম্বুককে বলিলেন—'তোমার সেবায় আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। অন্ন ব্যঞ্জন অতি মুখরোচক হইয়াছে। দেখ, আর্য চিত্রক কিছুই ফেলিয়া রাখেন নাই।'

জম্বুক করতল যুক্ত করিয়া সবিনয়ে হাস্য করিল। চিত্রক মৃদু হাসিয়া রট্টাকে জিজ্ঞাসা করিল—'কোন্ ব্যঞ্জন সবাপেক্ষা মুখরোচক লাগিল ?'

রট্টা বলিলেন—'শূল্য মাংস। এরূপ সুস্বাদু রন্ধন রাজ-পাচকও পারে না।'

চিত্রক মিটিমিটি হাসিতে লাগিল, রট্টা তাহা দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইলেন, বলিলেন—'শূল্য মাংস কে রাঁধিয়াছে ?'

জম্বুক তর্জনী দেখাইয়া বলিল—'ইনি !'

অবাক হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া রট্টা হাসিয়া উঠিলেন—'আপনার তো অনেক বিদ্যা ! এ বিদ্যা কোথায় শিখিলেন ?'

চিত্রক বলিল—'আমার সকল বিদ্যা যেখানে শিখিয়াছি সেইখানে।'

'সে কোথায় ?'

'যুদ্ধক্ষেত্রে।'

চিত্রকের মন কল্পনায় স্কন্দগুপ্তের স্কন্ধাবারের দিকে উড়িয়া গেল। ঐ যেখানে দিগন্তের কাছে আলোর আভা দেখা গিয়াছিল সেখানে ক্রোশের পর ক্রোশ বস্ত্র-শিবির তালপত্রের ছাউনি পড়িয়াছে; শিবিরের ফাঁকে ফাঁকে সৈনিকেরা আগুন জ্বালিয়াছে; কেহ যবচূর্ণ মাখিয়া দুই হস্তে স্থূল রোটিকা গড়িতেছে; কেহ ভল্লাগ্রে মাংস গ্রথিত করিয়া আগুনে শূল্য পক্ব করিতেছে—চীৎকার গান বাগ্‌যুদ্ধ···নির্ভয় নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রা···অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই···আছে কেবল নিরঙ্কুশ বর্তমান

রট্টা চিত্রকের মুখের উপর চিন্তার ক্রীড়া লক্ষ্য করিতেছিলেন, মৃদু হাসিয়া বলিলেন—'যুদ্ধক্ষেত্রের স্বপ্ন দেখিতেছেন?'

চিত্রক ঈষৎ চমকিয়া বলিল—'হাঁ। আপনি কি অন্তর্যামিনী?'

রট্টা রহস্যময় হাসিলেন।

* * * *

রাত্রি গভীর হইয়াছে। চন্দ্র প্রায় মধ্যাকাশে।

কুমারী রট্টা আপন কক্ষে শয্যাশ্রয়ে ঘুমাইয়া ছিলেন, একটি নিশ্বাস ফেলিয়া জাগিয়া উঠিলেন। ঘরের কোণে দীপ জ্বলিতেছে; জ্বলিয়া জ্বলিয়া শিখাটি ক্রমে ক্ষুদ্র বর্তুলবৎ আকার ধারণ করিয়াছে। তাহার বিন্দুপ্রমাণ আলোকে ঘরের বিশেষ কিছু দেখা যাইতেছে না। শয্যায় উঠিয়া বসিয়া রট্টা কিয়ৎকাল ঐ আলোকবিন্দুর পানে চাহিয়া রহিলেন; তারপর উঠিয়া নিঃশব্দে দ্বারের অর্গল মোচন করিলেন।

দ্বার ঈষৎ বিভক্ত করিয়া দেখিলেন, তাঁহার কক্ষের সম্মুখে দ্বারের দিকে পিছন করিয়া অলিন্দের একটি স্তম্ভে পৃষ্ঠ রাখিয়া চিত্রক বসিয়া আছে। পদদ্বয় প্রসারিত, জানুর উপর মুক্ত তরবারি। তাহার ঊর্ধ্বোত্থিত মুখের উপর চাঁদের আলো পড়িয়াছে—চক্ষু স্বপ্নাতুর—

দীর্ঘকাল এক দৃষ্টিতে দেখিয়া রট্টা আবার ধীরে ধীরে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন; ফিরিয়া আসিয়া অধোমুখে শয্যায় বক্ষ চাপিয়া শয়ন করিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া উপাধান সিক্ত করিয়া দিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চৈন পবিব্রাজক

সূর্যোদয়ের সঙ্গে পান্থশালার দ্বাব খুলিল।

পারসিক সার্থবাহ ইতিপূর্বেই উষ্ট্র গর্দভের পৃষ্ঠে পণ্যভার চাপাইয়া প্রস্তুত ছিল, তাহারা পান্থশালার শুল্ক চুকাইয়া দিযা বাহির হইযা পড়িল। তাহারা সাবা আর্যাবর্ত পবিভ্রমণ কবিবে, পথপার্শ্বে আলস্যবশে বিলম্ব করিলে চলিবে না।

চিত্রক রাত্রে ঘুমায় নাই, কিন্তু সেজন্য তাহার শবীরে তিলমাত্র ক্লান্তিবোধ ছিল না। সে দেখিল, পান্থশালা শূন্য হইয়া গিযাছে, কিন্তু রট্টার কক্ষদ্বার এখনও রুদ্ধ। রাজকুমারীর এখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই। চিত্রক মনে মনে গত রাত্রির অলীক ভয় ভাবনার কথা চিন্তা কবিতে করিতে প্রাচীর বেষ্টনের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

নবীন রবিকরে উপত্যকা ঝলমল করিতেছে, তৃণ-প্রান্তে তখনও শিশিরবিন্দু শুকায় নাই। হিমার্দ্র মন্থর বায়ু শরীর পুলকিত করিতেছে। চিত্রক উৎফুল্ল নেত্রে চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। আজ তাহার চোখে প্রকৃতির রঙ্ বদলাইয়া গিয়াছে।

চারিদিক দেখিতে দেখিতে তাহার চোখে পড়িল, কাল রাত্রে যেখানে

সে আগুনের প্রভা দেখিয়াছিল সেইখানে আকাশ ও দিগন্তের সঙ্গমস্থলে অনেক পক্ষী উড়িতেছে; আর কোনও দিকে অমন ঝাঁক বাঁধিয়া পক্ষী উড়িতেছে না। পক্ষীগুলিকে আকাশের পটে সঞ্চরমান কৃষ্ণবিন্দুর ন্যায় দেখাইতেছে।

চিত্রক অনেকক্ষণ স্থিরনেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। এই সময় রট্টা বাহিরে আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইলেন। চিত্রক সহাস্য হৃদ্যতার সহিত তাঁহাকে সম্ভাষণ করিল—

'রাত্রে সুনিদ্রা হইয়াছিল?'

রট্টা তাহার মুখ হইতে দৃষ্টি সরাইয়া নিম্নে নদীর পানে চাহিলেন, বলিলেন—'হাঁ। আপনার?'

চিত্রক অম্লানবদনে বলিল—'আমারও। খুব ঘুমাইয়াছি।'

রট্টা নদীর পানে চাহিয়া রহিলেন। আজ তাঁহার মনের ভাব অন্য প্রকার; একটু চাপা, একটু অন্তর্মুখী। চিত্রকের মনোভাব কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। সে অন্তরে এক অপূর্ব প্রীতি-প্রগল্ভ উদ্দীপনা অনুভব করিতেছে; কোনও অজ্ঞাত উপায়ে এই রাজকুমারীর উপর তাহার যেন স্বত্বপূর্ণ অধিকার জন্মিয়াছে। যাহার জন্য জাগিয়া রাত কাটাইতে হয় তাহার প্রতি সম্ভবত এইরূপ অধিকার-বোধ জন্মে।

সে জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি কি যাত্রার জন্য প্রস্তুত?'

রট্টা বলিলেন—'আমি প্রস্তুত। কিন্তু দু'দণ্ড পরে যাত্রা করিলেও ক্ষতি নাই'—বলিয়া গিরিক্রোড়স্থ নির্জন পান্থশালাটির প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিলেন।

চিত্রক হাসিয়া উঠিল, বলিল—'সত্য বলুন, এই পান্থশালার প্রতি আপনার মমতা জন্মিয়াছে!'

রট্টা স্মিতমুখে বলিলেন—'তা জন্মিয়াছে।—ফিরিবার পথে আবার এখানে রাত্রিযাপন করিব।' মনে মনে ভাবিলেন,

ফিরিবার সময় সঙ্গে অনেক লোক থাকিবে···এমন রাত্রি আর হইবে কি?

দুই একটি অন্য কথার পর চিত্রক পশ্চিম দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিল—'দেখুন তো, কিছু দেখিতে পাইতেছেন?'

রট্টা চক্ষের উপর করতলের অন্তরাল রাখিয়া কিছুক্ষণ দেখিলেন—'অনেক পাখী উড়িতেছে। কী পাখী?'

চিত্রক বলিল—'চিল্ল শকুন—'

রট্টা চকিতে চিত্রকের পানে চাহিলেন। কিন্তু এই সময় তাঁহাদের মনোযোগ অন্য দিকে আকৃষ্ট হইল।

পান্থশালার সম্মুখে ও দুই পাশে পথের তিনটি শাখা এতক্ষণ শূন্য পড়িয়া ছিল; পারসিক সার্থবাহ অনেক পূর্বেই গিরিসঙ্কটের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল; এখন উত্তর দিক হইতে কয়েকটি মানুষ আসিতেছে দেখা গেল। তাহাদের সহিত উষ্ট্র গর্দভ নাই, কেবল কয়েকটি মানুষ অদ্ভুত বেশভূষা পরিয়া পৃষ্ঠে ঝোলা বহিয়া পদব্রজে আসিতেছে।

চিত্রক বিস্মিত হইল। প্রাতঃকালে পান্থশালায় যাত্রী আসে না, কোথা হইতে আসিবে? নিকটে কোথাও জনালয় নাই। তবে ইহারা কে?

যাত্রিগণ আরও কাছে আসিলে চিত্রক দেখিল, ইহাদের বেশভূষাই শুধু অদ্ভুত নয়, আকৃতিও অদ্ভুত। ক্ষুদ্রাকৃতি মানুষগুলি: মুখ বর্তুলাকার, হনু উচ্চ, চক্ষু তির্যক। চিত্রক অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছে, কিন্তু এরূপ আকৃতির মানুষ কখনও দেখে নাই।

পান্থশালার সম্মুখে আসিয়া পথিকদল দাঁড়াইল। চারিজন পথিক, তন্মধ্যে একজন বৃদ্ধ। মুখে অতি সামান্য শুক্ল শ্মশ্রুগুম্ফ আছে, দেহ কৃশ ও শ্রমসহিষ্ণু; মুখের ভাব দৃঢ়তাব্যঞ্জক। ইনিই এই দলের নেতা সন্দেহ নাই। চিত্রক ও রট্টা পরম কৌতূহলের সহিত ইহাদের দর্শন করিতেছিলেন,

বৃদ্ধও কিছুক্ষণ তাহাদের নিরীক্ষণ করিয়া সাগ্রহে অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং তাঁহাদের সম্ভাষণ করিলেন।

চিত্রক ও রট্টা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর মধুর ও মন্দ্র, কিন্তু তাঁহার ভাষা চিত্রক বুঝি বুঝি করিয়াও বুঝিতে পারিল না। যেন পরিচিত ভাষা, অথচ উচ্চারণের বিকৃতির জন্য ধরা যাইতেছে না।

চিত্রক রট্টাকে হ্রস্বকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কিছু বুঝিতে পারিলেন?'

রট্টা বলিলেন—'না। ইহারা বোধ হয় চীনদেশীয়।'

চিত্রক তখন বৃদ্ধকে প্রশ্ন করিল—'আপনারা কে? কি চান?'

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, কিন্তু এবারও চিত্রক কিছু বুঝিল না। সে মাথা চুলকাইয়া শেষে জম্বুককে ডাকিল, বলিল—'তোমার নূতন অতিথি আসিয়াছে। ইহারা কে?'

জম্বুক নবাগতদের দেখিয়াই বলিল—'ইঁহারা চৈনিক পরিব্রাজক। এইরূপ পথিক মাঝে মাঝে এই পথে আসেন।'

'ইহাদের ভাষা তুমি বুঝিতে পার?'

'পারি। ইহারা পালি ভাষায় কথা বলেন।'

'ভাল। জিজ্ঞাসা কর আমাদের নিকট কী চান?'

জম্বুক বৃদ্ধকে প্রশ্ন করিল এবং তাঁহার উত্তর শুনিয়া বলিল—'ভিক্ষু জানিতে চান ইনি রাজকন্যা রট্টা যশোধরা কিনা।'

চিত্রক সন্দেহপূর্ণ নেত্রে ভিক্ষুকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'এ প্রশ্নের উত্তর পরে দিব, অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে বল।'

অতঃপর জম্বুকের মধ্যস্থতায় ভিক্ষুর সহিত চিত্রকের নিম্নরূপ প্রশ্নোত্তর হইল।

চিত্রক: আপনি কে? কোথা হইতে আসিতেছেন?

ভিক্ষু : আমার নাম টৌ-ইঙ্। আমরা চীনদেশ হইতে আসিতেছি। ইহারা আমার শিষ্য।

চিত্রক : চীনদেশ কত দূর ?

ভিক্ষু : দুই বৎসরের পথ।

চিত্রক : কোথায় যাইবেন ?

ভিক্ষু : কুশীনগর যাইব। লোকজ্যেষ্ঠ বুদ্ধ যেখানে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন সেই পবিত্র স্থানে দেহরক্ষা করিব এই আশা লইয়া চলিয়াছি। এখন বুদ্ধের ইচ্ছা।

চিত্রক : এই জন্য এতদূর পথ আসিয়াছেন ? অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই ?

ভিক্ষু : অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই।

চিত্রক : ক্ষমা করুন। আপনারা প্রাতঃকালে এখানে আসিলেন কি করিয়া ?

ভিক্ষু : আমরা অহিংসাধর্মী বৌদ্ধ, অস্ত্রধারণ করা আমাদের নিষেধ। কিন্তু এ পথে দস্যু তস্কর আছে ; তাই আমরা রাত্রিকালে পথ চলি, দিবাভাগে বিশ্রাম করি। কাল রাত্রে চন্দ্রোদয় হইলে যাত্রা করিয়াছিলাম।

চিত্রক : কোথা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন ?

ভিক্ষু : চষ্টন দুর্গ হইতে।

রট্টা এতক্ষণ নীরবে শুনিতেছিলেন ; এখন চষ্টন দুর্গের নাম শুনিয়া সাগ্রহে অগ্রসর হইয়া আসিলেন—‘চষ্টন দুর্গ ! তবে আমার পিতার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল !’

ভিক্ষু হাসিলেন ; বলিলেন—‘আমি অনুমান করিয়াছিলাম তুমিই রাজকন্যা রট্টা যশোধরা।···আমি তোমার পিতার নিকট হইতে কিছু বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম কপোতকূট যাইতে

হইবে; ভালই হইল, পথেই তোমার দেখা পাইলাম। এখানে আমার কর্তব্য শেষ করিয়া নিজ কর্মে যাইব।'

রট্টা: পিতা কী বার্তা পাঠাইয়াছেন?

ভিক্ষু: ধর্মাদিত্যের বার্তা সকলের নিকট প্রকাশ্য নয়। কিন্তু যখন দ্বিভাষীর প্রমুখাৎ কথা বলিতে হইতেছে তখন গোপন রাখা অসম্ভব। ভরসা করি ইহাতে ক্ষতি হইবে না।

রট্টার মুখে শঙ্কার ছায়া পড়িয়াছিল, তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—'না, ক্ষতি হইবে না, আপনি বলুন।'

ভিক্ষু: ধর্মাদিত্য তোমাকে এই বার্তা পাঠাইয়াছেন—তুমি কদাপি চষ্টন দুর্গে আসিও না, আসিলে ঘোর বিপদ ঘটিবে।

রট্টা স্থির বিস্ফারিত নেত্রে ভিক্ষুর পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর স্খলিত স্বরে বলিলেন—'বিপদ ঘটিবে! কিরূপ বিপদ?'

ভিক্ষু: যাত্রার পূর্বে ক্ষণেকের জন্য ধর্মাদিত্যের সহিত বিরলে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। দুর্গাধিপতি কিরাত অতিশয় দুষ্ট। সে ছলনা দ্বারা তোমাকে চষ্টন দুর্গে লইয়া গিয়া বলপূর্বক বিবাহ করিতে চায়। ধর্মাদিত্যকে সে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

রট্টা: পিতাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে!

ভিক্ষু: কারাগারে বন্দী করে নাই। কিন্তু তাঁহার দুর্গ ত্যাগ করিবার অধিকার নাই, পত্র লিখিবারও অধিকার নাই। কপোতকূটে যে পত্র গিয়াছিল তাহা ধর্মাদিত্য স্বেচ্ছায় লেখেন নাই।

দীর্ঘ নীরবতার পর রট্টা চিত্রকের দিকে ফিরিলেন। তাঁহার মুখ রক্তহীন, কিন্তু চক্ষে চাপা আগুন। রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—'কিরাতের যে এতদূর স্পর্ধা হইবে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। এখন কর্তব্য কি?'

চিত্রক কিছুকাল নীরব থাকিয়া ভিক্ষুককে জিজ্ঞাসা করিল—'মহারাজ কি কোনও অনুজ্ঞা দিয়াছেন?'

ভিক্ষু: না। তিনি কেবল রট্টা যশোধরাকে চষ্টন দুর্গে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু তোমাদের কর্তব্য এই দুর্জনের হস্ত হইতে ধর্মাদিত্যকে উদ্ধার করা। কিরাত মিষ্ট কথায় ধর্মাদিত্যকে মুক্তি দিবে না। তাহার কূট অভিপ্রায় ব্যর্থ হইয়াছে জানিলে সে আরও ক্রুদ্ধ হইবে; হয় তো ধর্মাদিত্যের অনিষ্ট করিতে পারে—

রট্টা ব্যাকুল নেত্রে চিত্রকের পানে চাহিলেন। চিত্রক শান্তস্বরে বলিল—'আপনি অধীর হইবেন না, বিপদের সময় বুদ্ধি স্থির রাখিতে হয়। মহাশয়, আপনারা পথশ্রমে পীড়িত, এখন বিশ্রাম করুন। জম্বুক, তুমি ইঁহাদের পরিচর্যা কর।'

* * * *

যে ব্যাপারে যুদ্ধ বিগ্রহের গন্ধ আছে তাহাতে চিত্রক কখনও বুদ্ধিভ্রষ্ট হয় না; যুদ্ধের প্রাক্কালে প্রবীণ সেনাপতির ন্যায় সে সমস্ত দায়িত্ব ভার নিজ হস্তে তুলিয়া লইল।

রট্টার হাত ধরিয়া সে তাঁহাকে কক্ষে আসিয়া বসাইল। রট্টার করতল তুষারের মত শীতল, অধর ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। নারী বাহিরে যতই পৌরুষের অভিনয় করুন, অন্তরে তিনি অবলা।

চিত্রক তাঁহার সম্মুখে বসিল এবং ধীরভাবে তাঁহাকে দুই চারিটি প্রশ্ন করিয়া কিরাত ও চষ্টন দুর্গ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া লইল। রট্টাও চিত্রকের সহিত কথা কহিতে কহিতে অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন।

এখন কর্তব্য কি এই প্রশ্নের উত্তরে চিত্রক বলিল—'দুইটি পথ আছে। কিন্তু আপনি যদি কিরাতকে বিবাহ করিতে সম্মত থাকেন তাহা হইলে কোনও পথেরই প্রয়োজন নাই।'

রট্টা বলিলেন—'কিরাতকে বিবাহ করার পূর্বে আমি আত্মঘাতিনী হইব।'

চিত্রক বলিল—'তবে দুই পথ। এক কপোতকূটে ফিরিয়া যাওয়া, সৈন্যদল লইয়া চষ্টনদুর্গ অবরোধ করা। যতদূর জানি সৈন্য সংগ্রহ করিতে সময় লাগিবে। চষ্টনদুর্গের ন্যায় ক্ষুদ্র দুর্গও অন্তত পাঁচশত সৈন্যের কমে অবরোধ করা অসম্ভব।'

রট্টা প্রশ্ন করিলেন—'দ্বিতীয় পথ কী?'

চিত্রক বলিল—'দ্বিতীয় পথ, স্কন্দগুপ্তের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করা।'

রট্টা উচ্চকিত হইয়া চাহিলেন—'স্কন্দগুপ্ত সাহায্য দিবেন?'

চিত্রক বলিল—'তিনি ক্ষত্রিয়-চূড়ামণি। তাঁহার শরণ লইলে তিনি অবশ্য সাহায্য করিবেন।'

'তবে স্কন্দগুপ্তেরই শরণ লইব। তাঁহার নাম শুনিলে কিরাত ভয় পাইবে, বিরুদ্ধতা করিতে সাহস পাইবে না।'

'তাহা সম্ভব। কিন্তু স্কন্দগুপ্তের কাছে কে যাইবে?'

'আমি যাইব। আপনি সঙ্গে থাকিবেন।'

চিত্রক ক্ষণেক মৌন রহিল, তারপর বলিল—'আপনি নারী, লক্ষ লক্ষ সৈন্যপূর্ণ স্কন্ধাবার নারীর উপযুক্ত স্থান নয়। অবশ্য আমি সঙ্গে থাকিলে বিশেষ ভয় নাই, অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় দেখাইয়া স্কন্দের সমীপে পৌঁছিতে পারিব। কিন্তু একটি কথা আছে—'

'কি কথা?'

'সকল কথা বলার সময় নাই। কিন্তু আমি যে স্কন্দগুপ্তের দূত একথা তাঁহাকে বলা চলিবে না। আমি বিটঙ্ক রাজ্যেরই একজন সেনানী, এই পরিচয় দিলেই হইবে। স্কন্দ আমাকে চেনেন না, সুতরাং কোনও গোলযোগের সম্ভাবনা নাই।'

'কিন্তু—কেন?'

'ওকথা এখন জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিব না।'

রট্টা বলিলেন—'আর্য চিত্রক, আমি সম্পূর্ণ আপনার অধীন। আপনি যাহা বলিবেন তাহাই কারব।'

চিত্রক বলিল—'আমি আপনার দাস। আপনার মঙ্গলের জন্য যাহা কর্তব্য তাহা করিব। স্কন্ধগুপ্তের শরণ লওয়াই স্থির?'

'হাঁ।'

চিত্রক উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—'তবে উঠুন। অবিলম্বে যাত্রা করিতে হইবে।' দ্বার পর্যন্ত গিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল—'একটা কথা। আপনি এমনভাবে বস্ত্র পরিধান করুন যাহাতে আপনাকে কিশোর বয়স্ক পুরুষ বলিয়া মনে হয়। ইহা প্রয়োজন।' বলিয়া তাড়াতাড়ি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

রট্টার মুখে ধীরে ধীরে অরুণাভা ফুটিয়া উঠিল। তিনি কক্ষের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া নূতনভাবে বেশ-প্রসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

চিত্রক বাহিরে আসিয়া দেখিল, পাশেই একটি কক্ষে চৈন ভিক্ষুগণ আশ্রয় লইয়াছেন; জম্বুক তাঁহাদের পরিচর্যায় নিবৃক্ত আছে। চিত্রক তাঁহাদের নিকটে গিয়া বলিল—'জম্বুক, ভিক্ষু মহাশয়কে আমি একটি প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি—মহারাজ স্কন্দগুপ্ত সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন কি?'

প্রশ্ন শুনিয়া ভিক্ষু বলিলেন—'জানি। স্কন্দগুপ্ত হূণ দলনের জন্য আসিয়াছেন। নিকটেই আছেন।'

চিত্রক: কোথায় আছেন?

ভিক্ষু: এই উপত্যকার পশ্চিমে যে পর্বতশ্রেণী আছে তাহা পার হইলে আর একটি বৃহত্তর উপত্যকা আছে; স্কন্দগুপ্ত তথায় সৈন্য স্থাপন করিয়াছেন।

চিত্রক: একথা আপনি কিরূপে জানিলেন?

ভিক্ষু: চষ্টনদুর্গে শুনিয়াছি। জনৈক সৈনিক মৃগয়ায় গিয়াছিল, সে দেখিয়া আসিয়াছে।

চিত্রক তখন ভিক্ষুকে সাধুবাদ করিয়া জম্বুককে আড়ালে ডাকিয়া আনিল, বলিল—'জম্বুক, আমরা স্থির করিয়াছি স্কন্দগুপ্তের শিবিরে যাইব।'

জম্বুক বলিল—'সে ভাল কথা।'

চিত্রক বলিল—'তোমাকে কপোতকূটে যাইতে হইবে। মন্ত্রী চতুর ভট্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা তাঁহাকে বলিবে। তারপর তিনি যাহা ভাল হয় করিবেন।'

'যথা আজ্ঞা।'

'এখন আমাদের অশ্ব আনিতে বল। এই বেলা যাত্রা করিলে সূর্যাস্তের পূর্বে স্কন্দগুপ্তের শিবিরে পৌঁছিতে পারিব।'

জম্বুক অশ্ব আনিতে গেল। চিত্রক ফিরিয়া গিয়া রট্টার দ্বারে করাঘাত করিল। রট্টা দ্বার খুলিয়া নত চক্ষে সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

চিত্রক দেখিল, বেশ পরিবর্তন করিয়া রট্টাকে অন্যরূপ দেখাইতেছে, প্রথম যেদিন সে রট্টাকে দেখিয়াছিল সে দিনের মতই তাঁহাকে সহসা নারী বলিয়া চেনা যায় না, ভস্মের তলে রূপের আগুন চাপা পড়িয়াছে। কিন্তু মস্তকে শিরস্ত্রাণ নাই, বেণী শোভা পাইতেছে। তাহার কী হইবে?

চিত্রক নিজ কটিবন্ধ খুলিয়া রট্টার মাথায় উষ্ণীষ বাঁধিয়া দিল; উষ্ণীষের অন্তরালে বেণীবন্ধ ঢাকা পড়িল। চিত্রক বিচারকের দৃষ্টিতে রট্টার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া গম্ভীরমুখে বলিল—'এতক্ষণে ছদ্মবেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। স্কন্দের সম্মুখে না পৌঁছানো পর্যন্ত ছদ্মবেশ আবশ্যক। যুদ্ধক্ষেত্র কিরূপ স্থান তাহা আপনি জানেন না, কিন্তু আমি জানি। তাই এই সাবধানতা।'

রট্টার চোখে জল আসিল, তিনি অবরুদ্ধ স্বরে বলিলেন—'স্ত্রীজাতি বড় জঞ্জাল।'

চিত্রক মাথা নাড়িয়া বলিল—'না, পুরুষ বড় জঞ্জাল।'

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

গিরিলঙ্ঘন

রট্টা ও চিত্রক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলে জম্বুক ছুটিয়া আসিয়া চিত্রকের অশ্বাসনে একটি বস্ত্রের পোট্টলী বাঁধিয়া দিল। চিত্রক প্রশ্ন করিল—'এ কী?'

জম্বুক বলিল—'কিছু খাদ্য। সঙ্গে থাকা ভাল। হয়তো প্রয়োজন হইবে।'

চিত্রক বলিল—'ভাল। তুমিও আর বিলম্ব করিও না।'

জম্বুক বলিল—'না। কিন্তু আমার অশ্ব নাই, গর্দভ পৃষ্ঠে যাইতে হইবে। পৌঁছিতে বিলম্ব হইতে পারে।'

রট্টা জম্বুকের হস্তে একটি স্বর্ণদীনার দিয়া বলিলেন—'তোমার পারিতোষিক। ভিক্ষুদের কথা ভুলিও না।'

জম্বুক স্বর্ণমুদ্রা সসম্ভ্রমে ললাটে স্পর্শ করিয়া বলিল—'আজ্ঞা, ভিক্ষুদের জন্য গোধূম লইয়া যাইব। সঙ্গে ভৃত্য থাকিবে, সে সংঘে গোধূম পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিবে। আমি কপোতকূটে চলিয়া যাইব।'

অতঃপর জম্বুকের কর্মকুশলতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া উভয়ে পশ্চিমদিকে অশ্বের মুখ ফিরাইলেন। সম্মুখে উপত্যকা; তাহার পরপ্রান্তে পাহাড় আছে, কিন্তু এখান হইতে দেখা যায় না। সেই পাহাড় পার হইয়া স্কন্দগুপ্তের স্কন্ধাবারে পৌঁছিতে হইবে।

রট্টা বায়ুকোণ হইতে নৈঋত কোণ পর্যন্ত চক্ষু ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোন্ স্থানে যাইতে হইবে? দিগ্‌দর্শন হইবে কি প্রকারে?'

চিত্রক বলিল—'ওই যে-স্থানে চিল্ল-শকুন উড়িতেছে উহাই আমাদের গন্তব্য স্থান। উহা লক্ষ্য করিয়া চলিলে স্কন্ধাবারে পৌঁছিব।'

বিস্মিতা বট্টা বলিলেন—'কি করিয়া বুঝিলেন?'

চিত্রক একটু হাসিয়া বলিল—'অনেক দেখিয়াছি। যুদ্ধের প্রাক্‌কালে সৈন্য-শিবিরের মাথায় চিল্ল-শকুন ওড়ে, উহারা বোধহয় জানিতে পারে। —আসুন, আর বিলম্ব নয়, আজ দ্রুত অশ্ব চালাইতে হইবে।'

দুইটি অশ্ব নদীর বাম তীররেখা ধরিয়া ছুটিয়া চলিল। বট্টা একবার চক্ষু ফিরাইয়া পান্থশালার পানে চাহিলেন; তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। মনে হইল, চির পরিচিত গৃহ ছাড়িয়া কোন অজানা নিরুদ্দেশের পথে চলিয়াছেন।

*   *   *   *

দ্বিপ্রহরের সূর্য মধ্যাকাশে উঠিয়াছে।

চিত্রক ও বট্টা এক বিশাল শিংশপা বৃক্ষের তলে আসিয়া অশ্ব থামাইলেন। নদীটি এইখানে ঈষৎ বক্র হইয়া নৈঋত কোণে চলিয়া গিয়াছে, পরপারের ভূমি শিলা-বন্ধুর ও উচ্চ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা উপত্যকার পশ্চিমপ্রান্ত বলা যাইতে পারে।

চিত্রক চারিদিক অবলোকন করিয়া বলিল—'এবার নদী পার হইতে হইবে।'

বট্টা বলিলেন—'নদীর জল যদি গভীর হয়?'

চিত্রক নদীর অর্ধস্বচ্ছ জলের ভিতর দৃষ্টি প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'না, নদীগর্ভ প্রস্তরময়, স্রোতও মন্দ, সুতরাং অগভীর হইবার সম্ভাবনা। যাহোক তাহা পরে পরীক্ষা করা যাইবে, আপাততঃ আহার ও বিশ্রামের প্রয়োজন।'

বট্টা যেন এই প্রস্তাবের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তিনি অশ্ব হইতে

নামিয়া তরুচ্ছায়ার শষ্পাসনে বসিলেন। চিত্রক অশ্বদুটিকে বল্‌গা ধরিয়া নদীর তীরে লইয়া গিয়া জলপান করাইল; তারপর তাহাদের যথেচ্ছা বিচরণ করিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়া, খাদ্যের পোট্টলী লইয়া রট্টার কাছে আসিয়া বসিল।

পোট্টলি খুলিয়া দেখা গেল জম্বুক অনেক খাদ্য দিয়াছে: যবের পিষ্টক ও তণ্ডুলের পৌলিক; কয়েকটি শঙ্খাকৃতি শর্করাকন্দ; এক কুক্ষি দ্রাক্ষা ও কিছু গুড়। চিত্রক সহাস্যে বলিল—'জম্বুক বিচক্ষণ ব্যক্তি। এত দিয়াছে যে দুই দিনেও ফুরাইবে না।'

পোট্টলী মধ্যস্থলে রাখিয়া উভয়ে তাহা হইতে তুলিয়া তুলিয়া আহার করিতে লাগিলেন। চিত্রক রট্টার প্রতি একটি সকৌতুক কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—'খাদ্য কেমন লাগিতেছে?'

রট্টা অর্ধমুদিত নেত্রে বলিলেন—'বড় মিষ্ট।'

চিত্রক তরবারি দ্বারা শর্করাকন্দ কাটিতে কাটিতে বলিল—'ক্ষুধায় চায় না সুধা। বৈশ্বানর জ্বলিলে তিন্তিড়ীও মিষ্ট লাগে।'

আহার শেষ হইলে চিত্রক পুঁটুলি আবার সযত্নে বাঁধিয়া রাখিল। দুইজনে নদীতীরে গিয়া অঞ্জলি ভরিয়া জলপান করিলেন। তারপর আবার তরুচ্ছায়া তলে আসিয়া বসিলেন। রট্টা তৃপ্তির একটি নিশ্বাস ফেলিয়া অজিনের ন্যায় ঘন শষ্পশয্যায় অর্ধ-শয়ান হইলেন।

চিত্রক জিজ্ঞাসা করিল—'আপনার কি ক্লান্তি বোধ হইতেছে?'

'না, আমি প্রস্তুত।' বলিয়া রট্টা উঠিবার উপক্রম করিলেন।

চিত্রক বলিল—'ত্বরা নাই। অশ্বদুটির আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম প্রয়োজন।'

অশ্বদুইটি ইতিমধ্যে শষ্পাহরণ করিতে করিতে নদীতীর হইতে কিছু দূরে চলিয়া গিয়াছিল; অলস নেত্রে তাহাদের একবার দেখিয়া লইয়া চিত্রকও শ্যামল তৃণশয্যায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া দিল।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর রট্টা ধীরে ধীরে যেন আত্মগতভাবে বলিলেন—'পৃথিবীতে যদি যুদ্ধবিগ্রহ স্বার্থপরতা কুটিলতা না থাকিত!'

চিত্রক চক্ষু মুদিত করিয়া একটু হাসিল।

রট্টা বলিলেন—'কেন এই হিংসা? কেন এত লোভ? এত কাড়া-কাড়ি? আর্য চিত্রক, আপনি বলিতে পারেন?'

চিত্রক উঠিয়া বসিল; কিছুক্ষণ নত নেত্রে চিন্তা করিয়া বলিল—'না। বোধহয় ইহাই মানুষের নিয়তি। মানুষ যাহা চায় তাহা পাইবার অন্য উপায় জানেনা বলিয়াই যুদ্ধ করে, হিংসা করে।'

'কিন্তু অন্য উপায় কি নাই?

চিত্রক ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল—'জানিনা। হয় তো আছে—'

নদীর দিকে চক্ষু তুলিয়া চিত্রক সহসা নীরব হইল। রট্টা তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিলেন, নদীর পরপারে প্রায় ত্রিশ দণ্ড দূরে একটি সুন্দর শৃঙ্গধর মৃগ মদগর্বিত পদক্ষেপে আসিতেছে। নদীর কূলে আসিয়া সে জলপান করিল, তারপর নির্ভয়ে নদী উত্তরণ করিয়া এপারে আসিয়া উপস্থিত হইল, নদীর জল তাহার উদর স্পর্শ করিল না। সে বৃক্ষচ্ছায়ায় মানুষের অস্তিত্ব লক্ষ্য করে নাই, প্রত্যাশাও করে নাই। তীরে উঠিয়া সহসা তাহাদের দেখিতে পাইয়া নিমেষ মধ্যে অতি দীর্ঘ লম্ফ প্রদানপূর্বক বিদ্যুদ্বেগে পলায়ন করিল।

চিত্রক হাসিয়া উঠিল। পোট্টলী হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল—'চলুন এবার যাত্রা করি। নদীর গভীরতা সম্বন্ধে প্রশ্নের সমাধান হইয়াছে।'

* * * *

পশ্চিম দিগ্বলয় সুরঞ্জিত করিয়া সূর্য অস্ত যাইতেছে। চারিদিকে পাহাড়; দীর্ঘশায়িত অনুচ্চ পর্বত শ্রেণী, মাঝে মাঝে প্রস্তরের স্কন্ধ উচ্চ

হইয়া আছে। পর্বত-গাত্রে সর্বত্র বর্বুর ও বন-বদরীর গুল্ম। এই দৃশ্যের মধ্যস্থলে অশ্বারূঢ় চিত্রক ও রট্টা দাঁড়াইয়া।

রট্টা নীরবে চিত্রকের পানে চাহিলেন; তাঁহার মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাঁহাদের পর্বত-লঙ্ঘনের চেষ্টা বহু পথে বিপথে আবর্তিত হইয়া এই কুটিল গিরিসঙ্কটের চক্রে আবদ্ধ হইয়াছে। রাত্রি আসন্ন; গন্তব্য স্থান এখনও সুদূরপরাহত।

এই সময় দূরাগত দুন্দুভির ডিণ্ডিম শব্দ তাঁহাদের কর্ণে আসিল; শব্দ নয়, স্থির বায়ুমণ্ডলে একটা অস্পষ্ট স্পন্দন মাত্র। চিত্রক উৎকর্ণ হইয়া শুনিল; তারপর রট্টার দিকে ফিরিয়া বলিল—'স্কন্ধাবারে সন্ধ্যার ভেরী বাজিতেছে! শুনিলেন?'

রট্টা বলিলেন—'হাঁ। এখান হইতে কতদূর অনুমান হয়?'

চিত্রক ললাট কুঞ্চিত করিয়া বলিল—'সিধা আকাশ পথে অন্তত এক যোজন। আজ স্কন্ধাবারে পৌঁছানো অসম্ভব।'

'তবে—?'

চিত্রক চারিদিকে চাহিল।

'এই স্থানেই রাত্রি কাটাইব। এখানে জল আছে।' বলিয়া সে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল।

কিছু দূরে নগ্ন পর্বত গাত্র প্রাচীরের ন্যায় ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে; তাহার অঙ্গ বহিয়া ক্ষীণ ধারায় জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

'আসুন, আলো থাকিতে থাকিতে রাত্রির জন্য একটা আশ্রয়স্থল খুঁজিয়া লইতে হইবে।' বলিয়া চিত্রক অশ্ব চালাইল।

গিরি-স্রুত জলধারা যেখানে সঞ্চিত হইয়াছে তাহার চারিপাশে তৃণ জন্মিয়াছে। চিত্রক ও রট্টা অশ্বদুটিকে এই স্থানে ছাড়িয়া দিয়া পদব্রজে এই পর্বত স্কন্ধের পাদমূলে ইতস্তত খুঁজিয়া দেখিতে লাগিলেন। অল্প দূর গিয়া একটি গুহা দেখা গেল। ঠিক গুহা নয়, দুইটি বিশাল পাষাণ খণ্ড

পরস্পরের অঙ্গে হেলিয়া পড়িয়া অধোদেশে ক্ষুদ্র একটি কোটর রচনা করিয়াছে। পর্বতের তুলনায় কোটর ক্ষুদ্র হইলেও দুইটি মানুষ তাহার মধ্যে স্বচ্ছন্দে রাত্রি যাপন করিতে পারে। রন্ধ্রমুখ ক্ষুদ্র বটে কিন্তু ভিতরে বেশ পরিসর।

গুহা মধ্যে প্রবেশ করিয়া বট্টা সানন্দে বলিয়া উঠিলেন—'এই তো সুন্দর গৃহ পাওয়া গিয়াছে।'

চিত্রক হাসিল—'সুন্দর গৃহই বটে! আদিম যুগের মানব মানবী বোধ করি এমনই গৃহে বাস করিত। যাহোক, মুক্ত আকাশের তলে রাত্রি-যাপন অপেক্ষা এ ভাল। আপনি অপেক্ষা করুন।' বলিয়া সে ছুটিয়া গিয়া অশ্বের পৃষ্ঠ হইতে কম্বলাসন দুইটি লইয়া আসিল, বট্টার পদপ্রান্তে রাখিয়া বলিল, 'আপনি গৃহের সাজসজ্জা করুন, আমি অন্য চেষ্টা করিতেছি।'

দিনের আলো দ্রুত ফুরাইয়া আসিতেছে। চিত্রক ত্বরিতে বর্বুর-গুল্ম ও বদরী বনের মধ্য হইতে শুষ্ক শাখাপত্র কুড়াইয়া আনিয়া গুহার ভিতর জমা করিতে লাগিল। এইরূপে শুষ্ক পত্র ও কাষ্ঠের স্তূপ প্রস্তুত হইলে সে একখণ্ড প্রস্তরের উপর তরবারির লৌহ পুনঃপুন আঘাত করিয়া অগ্নি উৎপাদনে প্রবৃত্ত হইল।

কিছুক্ষণ মন্থনের পর অগ্নি জ্বলিল, চড়্ চড়্ পট্ পট্ শব্দ করিয়া শুষ্ক শাখাপত্র জ্বলিতে লাগিল।

বট্টা করতালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন—'আমাদের অভাব কি? অগ্নি-দেবতাও উপস্থিত!' বলিয়াই তিনি সহসা লজ্জায় বক্রমুখী হইয়া উঠিলেন।

অগ্নির দুই পাশে দুইটি কম্বল পাতিয়া চিত্রক বলিল—'আপনি বসুন, আমি অশ্ব দুটির ব্যবস্থা করিয়া আসি।'

চিত্রক বাহির হইয়া গেল। বাহিরে তখন দিবা-দীপ্তি প্রায় নির্বাপিত হইয়াছে।

রট্টা প্রোজ্জ্বল অগ্নিশিখার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, জীবন কী অদ্ভুত, কী ভয়ঙ্কর, কী সুন্দর! এতদিন তিনি কেবল বাঁচিয়া ছিলেন, আজ প্রথম জীবনের স্বাদ পাইলেন।

চিত্রক ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, রট্টা মস্তক হইতে উষ্ণীষ মোচন করিয়াছেন। অগ্নিশিখার চঞ্চল আলোকে ছদ্মবেশমুক্ত সুন্দর সুকুমার মুখখানি দেখিয়া চিত্রকের চিত্ত ক্ষণকালের জন্য যেন স্ফুলিঙ্গের মত চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ মনকে সংহত করিয়া সহজভাবে বলিল—'ঘোড়া দুটিকে বল্‌গা খুলিয়া ছাড়িয়া দিলাম। এদিকে যদি শ্বাপদ থাকে—সম্ভবত নাই—তাহারা পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিবে।'

শ্বাপদ! এই পার্বত্য বনানীর মধ্যে শ্বাপদ থাকিতে পারে একথা রট্টার মনে আসে নাই।

চিত্রক রট্টার সম্মুখে খাদ্যের পুঁটুলি রাখিয়া বলিল—'এইবার আহার।'

দুইজনে এক কম্বলাসনে বসিয়া আহার আরম্ভ করিলেন। পিষ্টক পৌলিক কিছু অবশিষ্ট ছিল চিত্রক সেগুলি রট্টাকে দিয়া নিজে শুষ্ক চণক চিবাইতে লাগিল। রট্টা তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন; কিছু বলিলেন না। তিনিও দুই চারিটি চণক লইয়া মুখে দিলেন।

কিছুক্ষণ নীরবে আহার চলিবার পর চিত্রক বলিল—'আপনার এই দুর্দশার জন্য আমি বড় কুণ্ঠাবোধ করিতেছি।'

রট্টা বলিলেন—'আপনার কুণ্ঠা কেন? আমি তো স্বেচ্ছায় আসিয়াছি।'

চিত্রক বলিল—'কিন্তু আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম।'

রট্টা দৃঢ়স্বরে বলিলেন—'অন্যায় প্রস্তাব করেন নাই। এ পর্বত যে এত দুর্গম তাহা আপনি জানিতেন না।'

চিত্রক অগ্নিতে একটি শাখাখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া বলিল—'তাহা সত্য। তবু ভয় হয়, আপনি সন্দেহ করিতে পারেন আমার কোনও দুরভিসন্ধি আছে—'

'আর্য চিত্রক!' রট্টার চক্ষুদুটি দীপ্ত হইয়া উঠিল—'আমার অন্তঃকরণ এত নীচ মনে করিবেন না।'

চিত্রক দীনকণ্ঠে বলিল—'ক্ষমা করুন, রাজকুমারী। কিন্তু আপনার ক্লেশের নিমিত্ত হইয়া আমি প্রাণে শান্তি পাইতেছি না।'

রট্টা তেমনই উদ্দীপ্তস্বরে বলিলেন—'আপনি আমার ক্লেশের নিমিত্ত হন নাই। আর ক্লেশ! স্ত্রীজাতির কিসে ক্লেশ হয় তাহা আপনি কি বুঝিবেন?'

চিত্রকের বুক দুরুদুরু করিয়া উঠিল। সে আর কথা কহিল না। স্ত্রীলোকের কিসে ক্লেশ হয়—কিসে সুখ হয়, তাহা অধম যুদ্ধজীবী কি করিয়া বুঝিবে? স্ত্রীজাতির চরিত্র এবং পুরুষের ভাগ্য দেবতারাও জানেন না, মানুষ কোন্ ছার। কিন্তু তবু, রট্টা যশোধরা নাম্নী এই যুবতীটির চরিত্র যতই রহস্যময় হোক, তাহা যে অনন্ত, অনিন্দ্য এবং অনবদ্য তাহাতে চিত্রকের মনে সংশয়মাত্র রহিল না।

আহারের পর দুইজনে গুহার বাহিরে জলাধারে গিয়া জলপান করিলেন। চিত্রক একটি জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড হাতে লইয়া আলো দেখাইল। বাহিরে তখন গাঢ় অন্ধকার চারিদিকে ছাইয়া গিয়াছে; কেবল এখানে ওখানে কয়েকটি জ্যোতিরিঙ্গণ নীল নেত্রানল জ্বালিয়া কোন্ অলক্ষ্য বস্তুর সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে।

গুহায় ফিরিয়া আসিয়া চিত্রক অবশিষ্ট কাষ্ঠগুলি অগ্নিতে সমর্পণপূর্বক বলিল—'এইবার শয়ন।'

এক পাশে রট্টা শয়ন করিলেন, অন্য পাশে চিত্রক। মধ্যস্থলে অগ্নিদেবতা জাগ্রত রহিলেন।

শয়ন করিয়া চিত্রক চক্ষু মুদিত করিল। আজিকার এই অপরূপ পরিস্থিতি, রট্টার সহিত এই কোটরে দুই হস্ত ব্যবধানে শয়ন, চিত্রকের স্নায়ুমণ্ডলে আলোড়নের সৃষ্টি করিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার চিন্তাগুলি মস্তিষ্কের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করিবার পূর্বেই ছায়াবাজির ন্যায় মিলাইয়া যাইতে লাগিল। দুই দিন অশ্বপৃষ্ঠে এবং এক রাত্রি বিনিদ্র চক্ষে যাপন করিয়া তাহার লৌহময় শরীরেও ক্লান্তি প্রবেশ করিয়াছিল। সে অচিরাৎ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল।

* * * *

মধ্য রাত্রির পর চিত্রক জাগিয়া উঠিল। একেবারে পরিপূর্ণ চেতনা লইয়া উঠিয়া বসিল। অগ্নি নিঃশেষ হইয়া নিভিয়া গিয়াছে, চতুর্দিকে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। তাহার মধ্যে চিত্রক অনুভব করিল, রট্টা আসিয়া তাহার বাহু চাপিয়া ধরিয়াছেন, তাহার কানে কানে বলিতেছেন—'ঐ দেখুন—গুহার দ্বারের দিকে দেখুন—'

গুহামুখের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া চিত্রক দেখিল, অঙ্গারের ন্যায় রক্তবর্ণ দুইটি চক্ষু তাহাদের পানে চাহিয়া আছে। অন্ধকারে এই অঙ্গার-চক্ষু জীবের শরীর দেখা যাইতেছে না ; মাঝে মাঝে চক্ষুর পলক পড়িতেছে—

চিত্রক জানিত হিংস্র জন্তুর চক্ষু অন্ধকারে রক্তবর্ণ দেখায় ; সুতরাং এই জন্তুটা তরক্ষু হইতে পারে, আবার ব্যাঘ্রও হইতে পারে। বোধহয় গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস পাইতেছে না। কিন্তু ক্রমে সাহস পাইবে ; রক্ত-লোলুপতার কাছে ভয় পরাজিত হইবে।

চিত্রকের দেহের পেশীগুলি শক্ত হইয়া উঠিল। রট্টা তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া তাহার বাহু জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন ; কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, —'উহা কি ব্যাঘ্র ?'

চিত্রক রট্টার কথার উত্তর দিল না। তৎপরিবর্তে তাহার কণ্ঠ হইতে

এক দীর্ঘ-বিকট শব্দ বাহির হইল। শব্দ এত বিকট ও ভয়ঙ্কর যে কোনও হিংস্র জন্তুর কণ্ঠ হইতে এরূপ শব্দ বাহির হয় না; অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহিত এবং তূর্যনিনাদ মিশাইয়া এইরূপ ঘোর শব্দ সৃষ্টি হইতে পারে।

এই নিনাদ থামিবার পূর্বেই গুহা-মুখ হইতে রক্তচক্ষু দুইটি সহসা অন্তর্হিত হইল, বাহিরে শুষ্ক পত্রাদির উপর পলায়মান জন্তুর দ্রুত পদ-ধ্বনি ক্ষণেক শুনা গেল। তারপর আবার সব নিস্তব্ধ।

চিত্রকের মুখ-নিঃসৃত রোমহর্ষণ শব্দ শুনিয়া রট্টার সংজ্ঞা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল। চিত্রক এখন তাঁহাকে কোমল স্বরে বলিল—'রাজকুমারি, আর ভয় নাই, জন্তুটা পলাইয়াছে।'

রট্টা মুখ তুলিলেন। অন্ধকারে কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইল না। রট্টা ক্ষীণস্বরে বলিলেন—'ও কী ভয়ানক শব্দ! আপনি করিলেন?'

চিত্রক বলিল—'হাঁ। উহার নাম সিংহনাদ। যুদ্ধকালে ঐরূপ হুঙ্কার ছাড়িবার প্রথা আছে।'—বলিয়া লঘুকণ্ঠে হাসিল।

রট্টা একটি অতি গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার অঙ্গুলিগুলি নামিয়া আসিয়া চিত্রকের অঙ্গুলি জড়াইয়া লইল, তাঁহার কপোল চিত্রকের বাহুর উপর ন্যস্ত হইল।

চিত্রক উদ্‌গত হৃদয়াবেগ দমন করিয়া বলিল—'রাজকুমারি—'

অস্ফুটকণ্ঠে রট্টা বলিলেন—'রাজকুমারী নয়, বলো রট্টা।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া চিত্রক কম্পমানকণ্ঠে বলিল—'রট্টা!'

'বলো রট্টা যশোধরা।'

'রট্টা যশোধরা।'

কিছুক্ষণ নীরব। তারপর রট্টা বলিল—'আজ অন্ধকার আমার লজ্জা ঢাকিয়া দিয়াছে তাই বলিতে পারিলাম। তুমি আমার। জন্ম-জন্মান্তরে আমি তোমার ছিলাম, এ জন্মেও তোমার। পরজন্মেও তোমার হইব।'

অতঃপর তাহারা পর্বতগাত্র অবরোহণ করিয়া উপত্যকায় নামিল। কিন্তু এখনও তাহাদের পথের প্রতিবন্ধক শেষ হয় নাই। একদল অশ্বারোহী শিবির-রক্ষী আসিয়া তাহাদের ঘিরিয়া ধরিল। কে তোমরা ? কী অভিপ্রায় ?

চিত্রক স্কন্দগুপ্তেব অভিজ্ঞান-মুদ্রা দেখাইয়া পরিত্রাণ পাইল। তারপব আরও কয়েকবার রক্ষীরা তাহাদেব গতিবোধ করিল ; সাধাবণ সৈনিকরা নূতন লোক দেখিয়া রঙ্গ তামাসা করিল। কিন্তু ভাগ্যবলে রট্টাকে নারী বলিয়া কেহ চিনিতে পাবিল না।

অবশেষে তাহারা স্কন্দগুপ্তের প্রহরি-বেষ্টিত শিবির সম্মুখে উপস্থিত হইল ; অশ্ব হইতে অবতবণ কবিযা শূলধাবী প্রধান দ্বারপালের সম্মুখে দাঁড়াইল।

দ্বারপাল বলিল—'কি চাও ?'

চিত্রক বলিল—'ইনি বিটঙ্ক রাজ্যের রাজদুহিতা কুমারী রট্টা যশোধরা —পরম ভট্টারক সম্রাট স্কন্দগুপ্তের সাক্ষাৎপ্রার্থিনী।' বলিযা রট্টার মস্তক হইতে উষ্ণীষ খুলিয়া লইল। বন্ধনমুক্ত বিসর্পিল বেণী রট্টার পৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

স্কন্ধাবারে

মধ্যাহ্ন ভোজনের পব স্কন্দগুপ্ত শিবিরের একটি কক্ষে শয্যায় শায়িত হইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। দুইজন সম্বাহক তাঁহার পদসেবা করিতে-ছিল, একজন কিঙ্করী চামর দুলাইয়া ব্যজন করিতেছিল। ভুক্ত্বা রাজ-বদাচরেৎ! সেকালে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিশ্রামের রীতি ছিল; রাজা হইতে আপামর সাধারণ সকলেই দ্বিপ্রহরে কিয়ৎকালের জন্য রাজবৎ আচরণ করিতেন।

স্কন্দেব বস্ত্রাবাসে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ, তন্মধ্যে এইটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এটি মন্ত্রগৃহরূপে ব্যবহৃত হইত; সেনাপতি ও অমাত্যগণের সহিত বসিয়া রাজা মন্ত্রণা করিতেন। সিংহাসনাদি কিছুই ছিলনা; ভূমির উপর স্থূল আস্তরণ বিস্তৃত; তদুপরি রাজার জন্য উচ্চ গদির শয্যা। মন্ত্রণাকালে ইহাই রাজার আসন; দ্বিপ্রহরে বিশ্রামের জন্য ইহাই তাঁহার পালঙ্ক।

কিন্তু বিধাতা যাহাকে অসামান্য কর্মভাব প্রদান করিয়াছেন তাহার বিশ্রামেব সময় কোথায়? স্কন্দের তন্দ্রা থাকিয়া থাকিয়া বিঘ্নিত হইতেছিল। গুপ্তচব চুপি চুপি প্রবেশ করিয়া তাঁহার কানে কানে কথা বলিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছিল। আবার কিছুক্ষণ পরে অন্য গুপ্তচর আসিতেছিল—

এইরূপ অর্ধ-তন্দ্রিত অবস্থায় স্কন্দের মস্তিষ্কের ক্রিয়া চলিতেছিল—হূণ পঞ্চাশ ক্রোশ উত্তরে দল বাঁধিতেছে⋯কোন দিকে যাইবে? এক—আমাকে আক্রমণ করিতে পাবে⋯⋯তাহা বোধহয় করিবে না! দুই—আমাকে পাশ কাটাইয়া আর্যাবর্তের সমতল ভূমিতে নামিবার চেষ্টা কবিতে

পারে······তাহা করিতে দিব না। তিন—আমাকে দক্ষিণে রাখিয়া বিটঙ্ক রাজ্যটা অধিকার করিয়া বসিতে পারে···বিটঙ্ক রাজ্যের রাজাটা দুর্গ······সম্মুখে শত্রু ভাল, কিন্তু পিছনে শত্রু যদি ঘাঁটি গাড়িয়া বসে······

দুই তিন দণ্ড এইভাবে কাটিবার পর স্কন্দের তন্দ্রাবেশ দূর হইল; তিনি শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। সম্বাহকদের হস্ত সঞ্চালনে বিদায় করিয়া ডাকিলেন, 'পিপুল!'

কক্ষের এক অন্ধকার কোণে বিপুলকায় রাজবয়স্য পিপ্পলী মিশ্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যথেচ্ছা প্রসারিত করিয়া রাজবৎ আচরণ করিতেছিলেন, স্কন্দের আহ্বানে জাগিয়া উঠিয়া একটি প্রকাণ্ড জৃম্ভন ত্যাগ করিলেন। বলিলেন—'বয়স্য, আমি ঘুমাই নাই, চক্ষু মুদিয়া ব্রাহ্মণীর চিন্তা করিতেছিলাম।'

রাজা প্রশ্ন করিলেন—'পিপুল, ব্রাহ্মণীর জন্য কি বড়ই বিরহ-বেদনা অনুভব করিতেছ?'

'ঠিক বিরহ নয়; তবু চারিদিক ফাঁক-ফাঁক ঠেকিতেছে।' বলিয়া ব্রাহ্মণ রাজসমীপে আসিয়া বসিলেন।

যে কিঙ্করী চামর ঢুলাইতেছিল, রাজা তাহাকে বলিলেন—'লহরি, বয়স্যের জন্য তাম্বূল আনয়ন কর।'

কিঙ্করী চামর রাখিয়া চলিয়া গেল। লহরী নাম্নী এই দাসীটি উত্তীর্ণ-যৌবনা কিন্তু সুদর্শনা। স্কন্দের যৌবন-কাল হইতে সে তাঁহার সেবা করিয়াছে, যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁহার সঙ্গ ছাড়ে নাই। রাজপরিজনের মধ্যে লহরীই একমাত্র নারী; স্কন্দ তাহার হস্তে আপন গৃহস্থালীর সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।' সে তাঁহার পাচিকা সন্নিধাতা তাম্বূল-করঙ্কবাহিনী দেহরক্ষিণী। যুদ্ধ শিবিরে ছায়ার ন্যায় সে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত, যক্ষিণীর ন্যায় তাঁহাকে চোখে চোখে রাখিত। স্কন্দ তাহাকে সহোদরার ন্যায় স্নেহ করিতেন।

পিপ্পলী মিশ্র দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—'কবি কালিদাস লিখিয়া-

ছেন—কিং পুনর্দূরসংস্থে ; মেঘ দেখিলে প্রবাসী ব্যক্তির নাকি বড়ই কষ্ট হয়। মেঘ না দেখিয়াই আমার যেরূপ অবস্থা—'

'তোমার কিরূপ অবস্থা ?'

'এত সৈন্যসামন্ত রহিয়াছে, তবু মনে হয় যেন কেহ নাই। বয়স্য, বয়স যতই বাড়িতে থাকে গৃহিণীর অভাবে দশদিক ততই শূন্য মনে হয়। কিন্তু এসকল গূঢ় বৃত্তান্ত তুমি বুঝিবে না। গৃহিণী কী বস্তু তাহা তো ইহজন্মে জানিলে না !'

'গৃহিণী কী বস্তু ?'

পিপ্পলী বলিলেন—'গৃহিণী সচিবঃ সখী প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।'

স্কন্দ বলিলেন—'তোমার অবস্থা দেখিতেছি শঙ্কাজনক, বারম্বার কালিদাস আবৃত্তি করিতেছ। তোমার যুদ্ধ দেখিবার সাধ হইয়াছিল তাই সঙ্গে আনিয়াছিলাম, এমন জানিলে তোমার ব্রাহ্মণীকেও সঙ্গে লইয়া আসিতাম।'

'না বয়স্য, এই ভাল। আমার একটু ক্লেশ হইতেছে তাহাতে ক্ষতি নাই। সে যদি আসিত, এত সৈন্য আর হাতী ঘোড়া দেখিয়া ভয়েই মরিয়া যাইত।' পিপ্পলী মিশ্র অতিদীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিলেন, মনে হইল নিশ্বাসটি তাঁহার মূলাধার চক্রে জন্মলাভ করিয়া ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

এই সময় লহরী তাম্বূল করঙ্ক আনিয়া পিপ্পলী মিশ্রের অগ্রে রাখিল এবং পুনরায় চামর লইয়া ব্যজন করিতে লাগিল। তাম্বূল পাইয়া ব্রাহ্মণের মুখ প্রফুল্ল হইল, তিনি শঙ্কুলার সাহায্যে গুবাক কাটিয়া স্বয়ং তাম্বূল রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

স্কন্দ তখন বলিলেন—'পিপুল, এবার হূণের সহিত যুদ্ধ করার নূতন এক পন্থা আবিষ্কার করিয়াছি।'

পিপুল হৃষ্ট হইয়া বলিলেন—'ভাল ভাল। পলাণ্ডুসেবী দুর্গন্ধ ছুছুন্দর-গুলাকে ভাল করিয়া শিক্ষা দাও। কী পন্থা বাহির করিয়াছ?'

স্কন্দ বলিলেন—'দেখ, হূণেরা ঘোড়ার পিঠে ছাড়া যুদ্ধ করিতে পারেনা। কিন্তু পার্বত্য দেশে ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধ ভাল হয় না! তাই স্থির করিয়াছি—'

পিপুল বলিলেন—'বুঝিয়াছি, হস্তী চড়িয়া যুদ্ধ করিবে।'

স্কন্দ বলিলেন—'তুমি একটি হস্তি-মূর্খ। আমি পদাতি দিয়া যুদ্ধ করিব।'

পিপুল অবাক হইয়া বলিলেন—'পদাতি দিয়া! তবে পাল পাল হাতী আনিয়াছ কেন?'

স্কন্দ বলিলেন—'হাতীও কাজে লাগিবে। কিন্তু আসল যুদ্ধ করিবে পদাতি।'

'কিন্তু ইহাতে নূতন আবিষ্কার কী আছে?'

'নূতন আবিষ্কার এই যে, পদাতিদের হাতে দ্বাদশহস্ত পরিমিত দীর্ঘ বংশদণ্ড থাকিবে।'

'অ্যাঁ! বাঁশ দিয়া হূণ তাড়াইবে?'

স্কন্দ হাসিলেন—'শুধু বাঁশ নয়, বাঁশের অগ্রভাগে ভল্লের ফলক থাকিবে। বর্তমানে যে ভল্ল ব্যবহৃত হয় তাহার দৈর্ঘ্য মাত্র ছয় হস্ত। কিছু বুঝিলে?'

পিপ্পলী মিশ্র কিছুক্ষণ তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া শেষে মাথা নাড়িলেন—'যুদ্ধবিদ্যায় আমার তেমন পারদর্শিতা নাই। কিন্তু তুমি যখন আবিষ্কার করিয়াছ তখন নিশ্চয় কিছু মানে আছে।'

স্কন্দ হতাশ হইয়া নিশ্বাস ফেলিলেন—'কাহাকেই বা বলি!'

এই সময় দ্বারপাল আসিয়া সংবাদ দিল, বিটঙ্ক রাজ্যের রাজকন্যা এক অনুচরসহ আয়ুষ্মানের দর্শন ভিক্ষা করেন।

স্কন্দ ঈষৎ বিস্ময়ে কিয়ৎকাল চাহিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন—'বিটঙ্কের রাজকন্যা! হূণ দুহিতা! লইয়া এস।'

দ্বারপাল চলিয়া গেল। লহরী একটি সূক্ষ্ম মল্লবস্ত্রের উত্তরীয় দিয়া রাজার নগ্ন স্কন্দ আবৃত করিয়া দিল। পিপুল তাঁহার তাম্বূল করঙ্ক লইয়া একপাশে সরিয়া বসিলেন।

অনতিকাল পরে রট্টা আসিয়া শিবির দ্বারের অগ্রে দাঁড়াইল, পশ্চাতে চিত্রক। রট্টার হৃদ্‌যন্ত্র দ্রুত স্পন্দিত হইতেছিল; সে দেখিল কক্ষের মধ্যস্থলে এক পুরুষ সিংহ বসিয়া আছেন। রট্টা অনুমান করিয়াছিল ভারতবর্ষের চক্রবর্তী অধীশ্বর স্কন্দ অবশ্য বয়স্থ পুরুষ হইবেন; কিন্তু স্কন্দের সুগৌর দেহে জরার করাঙ্ক চিহ্নিত হয় নাই। তেজঃপুঞ্জ মুখমণ্ডল হইতে যৌবনের লাবণ্য বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার অনুভাব এত প্রবল যে শিবির প্রকোষ্ঠে অন্য কেহ আছে তাহা সহসা লক্ষ্য হয়না।

অপরপক্ষে রাজা দেখিলেন, এক অপরূপ সুন্দরী কন্যা। মনে হইল এক ঝলক বিদ্যুৎ আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি বিস্ময়োৎফুল্ল নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

রট্টা ত্বরিতে রাজার সম্মুখে আসিয়া নতজানু হইল, পুটাঞ্জলি হইয়া বলিল—'রট্টা যশোধরার প্রণতি গ্রহণ করুন রাজাধিরাজ।' চিত্রকও রট্টার পশ্চাতে থাকিয়া রাজাকে প্রণাম করিল।

স্কন্দ হস্তের ইঙ্গিতে উভয়কে ব'সিবার অনুমতি দিয়া ধীরকণ্ঠে বলিলেন—'রট্টা যশোধরা! তুমি বিটঙ্ক রাজের দুহিতা?'

'হাঁ রাজাধিরাজ।'

'হূণ কন্যা?'

রট্টার গ্রীবা ঈষৎ বক্র হইল। সে বলিল—'হাঁ, আমি হূণ কন্যা। কিন্তু সেজন্য আমার লজ্জা নাই। আমার পিতা মহানুভব পুরুষ।'

স্কন্দের অধরে অল্প হাসি দেখা দিল; তিনি বলিলেন—'তোমাকে লজ্জা দিবার জন্য এ প্রশ্ন করি নাই। তোমাকে দেখিয়া আর্যকন্যা বলিয়া মনে হয় তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।'

রট্টা বলিল—'আমার মাতা আর্য ছিলেন।'

স্কন্দ বলিলেন—'ভাল, এখন বুঝিলাম। রাজা কি তোমাকে দূতরূপে পাঠাইয়াছেন?'

'না মহারাজ, আমি নিজ ইচ্ছায় আসিযাছি।'

স্কন্দেব ভ্রূ ঈষৎ উত্থিত হইল; বলিলেন—'তুমি সাহসিনী বটে। এই বিপুল সেনা-সমুদ্রে অন্য কোনও নারী প্রবেশ করিতে পারিত না। তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?'

রট্টা বলিল—'উপস্থিত এক পান্থশালা হইতে। পর্বত পার হইতে দুই দিন লাগিয়াছে।'

'দুই দিন! রাত্রি কোথায় যাপন করিলে?'

'পর্বতের গুহায়।'

স্কন্দ প্রশ্ন-কুঞ্চিত চক্ষে রট্টার পানে চাহিলেন। রট্টাও নির্ভীক অকপট নেত্রে রাজার পানে চাহিয়া রহিল। রাজার চক্ষু নিমেষের জন্য একবার চিত্রকের মুখের উপর গিয়া ফিরিয়া আসিল। তিনি বলিলেন—'ভাল কথা, তুমি কুমারী না বিবাহিতা?'

রট্টা বলিল—'আমি কুমারী।' চিত্রকের দিকে নির্দেশ করিয়া বলিল—'ইনি চিত্রক বর্মা, বিটঙ্ক রাজ্যের এক সেনানী।'

চিত্রক আবার যোড়হস্তে প্রণাম করিল। অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় সে পূর্বেই কটিদেশে লুকাইয়াছিল।

স্কন্দ বলিলেন—'তোমরা অবশ্য কোনও প্রয়োজনে আমার নিকট আসিয়াছ। কিন্তু পর্বত লঙ্ঘন করিয়া তোমরা ক্লান্ত; আজ বিশ্রাম কর, কাল তোমাদের কথা শুনিব।'

রট্টা বলিল—'দেব, গুরুতর রাজকার্যে আপনার নিকট আসিয়াছি; অগ্রে আমার বক্তব্য নিবেদন করিব, তারপর বিশ্রাম।'

স্কন্দ বলিলেন—'ভাল। কিন্তু তৎপূর্বে একটি কথা জানিতে ইচ্ছা করি। বিটঙ্ক রাজার নিকট পত্র দিয়া আমি এক দূত পাঠাইয়া ছিলাম। সে দূত কি পৌঁছে নাই?'

পিপ্পলী অদূরে বসিয়া সকল কথা শুনিতেছিলেন, জনান্তিকে বলিলেন—'শশিশেখর—আমার ব্রাহ্মণীর ভ্রাতুষ্পুত্র।'

রট্টা একবার চিত্রকের দিকে কটাক্ষ করিল; চিত্রক বলিল—'দূতের কথা জানিনা আয়ুষ্মন্, কিন্তু রাজকীয় পত্র পৌঁছিয়াছে।'

স্কন্দ বলিলেন—'তবে পত্রের উত্তর আমি পাই নাই কেন?'

রট্টা বলিল—'মহারাজ আমার বক্তব্য শুনিলেই সকল কথা বুঝিতে পারিবেন।'

স্কন্দ শিরঃসঞ্চালনে সম্মতি দিলেন। রট্টা তখন চষ্টনদুর্গ ঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিল—কেবল চিত্রকের দূত পরিচয় গোপন রাখিল। রাজা মনোযোগের সহিত শুনিলেন। বৃত্তান্ত শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই কিরাত কি হূণ?'

রট্টা বলিল—'হাঁ মহারাজ, আমারই মতন।'

স্কন্দ সপ্রশংস নেত্রে চাহিয়া বলিলেন—'তোমার মতন অল্পই আছে। তোমার ন্যায় পিতৃভক্তি কর্তব্যনিষ্ঠা সাহস অতি বিরল। কিরাতের দোষ নাই; রূপে ও গুণে তুমি সকল পুরুষের লোভনীয়া।' বলিয়া মৃদু হাসিলেন।

রট্টা নতমুখে রহিল। স্কন্দ তখন বলিলেন—'আমি তোমার পিতাকে উদ্ধার করিব। আমার নিজেরও স্বার্থ আছে।' লহরীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'লহরি, গুলিক বর্মাকে ডাকিয়া পাঠাও।'

লহরী এতক্ষণ একাগ্রমনে বাক্যালাপ শুনিতেছিল এবং স্কন্দের মুখভাব নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে চামর রাখিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

গুলিক বর্মা একজন কনিষ্ঠ সেনানায়ক এবং স্কন্দের পার্শ্বচর ; ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ মূর্তি ; ধূমকেতুর ন্যায় গোঁফ। সে আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে স্কন্দ প্রশ্ন করিলেন—'গুলিক, চষ্টনদুর্গ কোথায় জানো ?'

গুলিক বলিল—'জানি আয়ুষ্মন্। চষ্টন দুর্গ বিটঙ্ক রাজ্যের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত। এখান হইতে প্রায় বিংশ ক্রোশ উত্তর-পূর্বে।'

স্কন্দ বলিলেন—'শোনো। চষ্টনদুর্গের দুর্গাধিপ কিরাত বিটঙ্ক রাজকে ছলে নিজ দুর্গে লইয়া গিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তুমি একশত অশ্বারোহী লইয়া কল্য প্রত্যূষে যাত্রা করিবে। বিটঙ্ক রাজ্যের এই সেনানী চিত্রক বর্মা তোমার সঙ্গে যাইবেন। তুমি দুর্গাধিপ কিরাতকে আমার নাম করিয়া বলিবে যেন তদ্দণ্ডেই বিটঙ্করাজকে তোমার হস্তে সমর্পণ করে। অতঃপর রাজাকে লইয়া তুমি অবিলম্বে ফিরিয়া আসিবে।'

গুলিক বলিল—'যথা আজ্ঞা। যদি কিরাত রাজাকে সমর্পণ করিতে সম্মত না হয় ?'

'তাহাকে বলিও—আদেশ উপেক্ষা করিলে সহস্র রণহস্তী লইয়া আমি স্বয়ং গিয়া তাহার দুর্গ সমভূমি করিব।'

'আজ্ঞা। যদি তাহাতেও ভয় না পায় ?'

'তখন আমার কাছে দূত পাঠাইবে। উপস্থিত চিত্রক বর্মাকে তোমার শিবিরে লইয়া যাও, উত্তমরূপে অতিথি সৎকার কর।'

চিত্রক একটু ইতস্তত করিল, কিন্তু স্কন্দের আদেশ অলঙ্ঘনীয়। সে রট্টার প্রতি একবার পশ্চাদ্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গুলিক বর্মার সহিত প্রস্থান করিল।

চিত্রককে চলিয়া যাইতে দেখিয়া রট্টার মনে ঈষৎ শঙ্কার উদয় হইল। কিন্তু সে তাহা দমন পূর্বক অল্প হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'আর আমি ? আমি কি চষ্টন দুর্গে যাইব না ?'

স্কন্দ মাথা নাড়িয়া বলিলেন—'না। তুমি আমার শিবিরে থাকিবে।

তুমি রাজকন্যা ; অনেক বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া আমার কাছে আসিয়াছ। আবার তোমাকে বিপদের মুখে পাঠাইব না।'

রট্টা বলিল—'দেব, আপনার অসীম করুণা। কিন্তু—'

স্কন্দ বলিলেন—'রট্টা যশোধরা, ভয় করিও না। তুমি তোমার পিতার প্রাসাদে যেরূপ নিরাপদে থাকিতে আমার শিবিরে তদপেক্ষা অধিক নিরাপদে থাকিবে। —লহরি, রাজকন্যাকে লইয়া যাও। উনি পথশ্রান্ত ; তোমার উপর মাননীয়া অতিথির পরিচর্যা ভার রহিল।'

ইহার পর রট্টার মুখে আর আপত্তির কথা যোগাইল না। লহরী তাহার পাশে আসিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল—'আসুন কুমার ভট্টারিকা।'

লহরী রট্টাকে লইয়া প্রস্থান করিলে পিপ্পলী মিশ্র জানু সাহায্যে রাজার পাশে আসিয়া বসিলেন, তাঁহার কানে কানে বলিলেন—'বয়স্য, কেমন দেখিলে ?'

স্কন্দ মৃদুহাস্যে বলিলেন—'অপূর্ব।'

পিপ্পলী বলিলেন—'তবে আর বিলম্ব করিও না। যদি গার্হস্থ্য ধর্ম অবলম্বন করিতে চাও, এই সুযোগ। গৃহিণী সচিবঃ সখী—এমনটি আর পাইবে না।'

স্কন্দ স্মিতমুখে নীরব রহিলেন।

* * * *

নৈশ ভোজনের পর রাত্রি প্রথম প্রহরে চিত্রক রট্টার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। প্রত্যূষে যাত্রা করিতে হইবে।

কক্ষে আর কেহ ছিল না, দীপমণ্ডে স্নিগ্ধ জ্যোতি বর্তিকা জ্বলিতেছিল। রট্টা আসিয়া চিত্রকের হাত ধরিয়া দাঁড়াইল, বলিল—'আমি তোমার সঙ্গে যাইতে পারিলাম না।'

নিম্নস্বরে কথা হইতে লাগিল। চিত্রক বলিল—'এই ভাল। এখানে তুমি নিরাপদে থাকিবে।'

রট্টা বলিল—'তুমি কাছে না থাকিলে আর নিরাপদ মনে হয় না।'

চিত্রক রট্টার স্কন্ধের উপর হাত রাখিল—'রট্টা, লক্ষ্য করিয়াছ কি, স্কন্দ তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন।'

চিত্রকের মুখের কাছে মুখ আনিয়া রট্টা বলিল—'লক্ষ্য করিয়াছি। ইহাতে ভালই হইবে।'

'সে তুমি জানো।' চিত্রক রট্টার স্কন্ধ হইতে হাত নামাইয়া লইল।

রট্টা বলিল—'হাঁ, আমি জানি। আমার মন আমি জানি!'

'তবে আজ চলিলাম। আবার কবে দেখা হইবে, দেখা হইবে কিনা জানিনা।'

'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আবার শীঘ্রই দেখা হইবে।'

চিত্রকের মনে কিন্তু কাঁটা ফুটিয়া রহিল। চতুঃসাগরা পৃথ্বীর একচ্ছত্র অধীশ্বর, তাঁহার একমাত্র মহিষী—এ প্রলোভন কোন্ নারী ছাড়িতে পারে? কিন্তু সে মুখে কিছু প্রকাশ করিল না; আরও দুই চারিটি কথার পর রট্টার নিকট বিদায় লইল। মনে মনে ভাবিল, এই বুঝি শেষ সাক্ষাৎ।

অতঃপর রট্টা শয্যায় আসিয়া শয়ন করিল। কিয়ৎকাল শূন্যে চক্ষু মেলিয়া থাকিবার পর দেখিল, দাসী লহরী নিঃশব্দে পদপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। লহরী মৃদুকণ্ঠে বলিল—'দেবি, আপনার পদ-সম্বাহন করিয়া দিই?'

রট্টা স্মিতমুখে বলিল—'তুমি অনেক সেবা করিয়াছ। আর প্রয়োজন নাই।'

লহরী বলিল—'সে কি কথা। আমি পদসেবা করি, আপনি ঘুমান। আপনি ঘুমাইলে আমিও আপনার পদতলে ঘুমাইব।'

রট্টা বুঝিল, এই কক্ষটি এবং এই শয্যা লহরীর; যে বস্ত্র রট্টা পরিধান করিয়াছে তাহাও লহরীর। সৈন্য শিবিরে অন্য নারী-বস্ত্র কোথা হইতে

আসিবে? রট্টা আর আপত্তি করিল না, লহরী শয্যাপ্রান্তে বসিয়া তাহার পদসেবা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল, তারপর রট্টা বলিল—'শিবিরে অন্য নারী কি নাই?'

'না দেবি।'

'তোমার নাম লহরী? তুমি কতদিন রাজ-সংসারে আছ?'

'দশ বৎসর বয়সে কুমার স্কন্দের তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী হইয়া রাজ-সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সে আজ বিশ বছরের কথা। সেই অবধি আছি।'

'যুদ্ধক্ষেত্রেও তোমাকে আসিতে হয়?'

'আমি না থাকিলে কুমার স্কন্দের সেবা হয় না। তিনি সেবা লইতে জানেন না। ভৃত্যেরা অবহেলা করে। তাই আমাকে আসিতে হয়।'

'তুমি এখনও রাজাকে কুমার স্কন্দ বলো?'

'হাঁ দেবি। পুরাতন অভ্যাস ছাড়িতে পারি নাই।'

'তুমি বিবাহিতা?'

'না দেবি।'

'বিবাহ কর নাই কেন?'

'আমি বিবাহ করিলে কুমার স্কন্দের সেবা কে করিবে?'

রট্টা কিছুক্ষণ লহরীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। স্কন্দের প্রতি এই দাসীর মনের ভাব কিরূপ? দাস্যভাব? বাৎসল্য? সখ্য? প্রেম? হয়তো সব ভাব মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

রট্টা প্রশ্ন করিল—'মহারাজ বিবাহ করেন নাই কেন?'

লহরী বলিল—'যুদ্ধ করিয়াই জীবন কাটিয়া গেল, বিবাহ করিবেন কখন? তাছাড়া, কোন্ জ্যোতিষী নাকি বলিয়াছিল তিনি চিরকুমার থাকিবেন।'

'ইহাই বিবাহ না করার কারণ ?'

লহরী ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল—'কুমার স্কন্দের ভোগে রুচি নাই। মনের মধ্যে তিনি বড় একাকী; কখনও মনের সঙ্গিনী পান নাই। পাইলে হয়তো বিবাহ করিতেন।'

রট্টা বলিল—'বিবাহ করিলে হযতো মনের সঙ্গিনী পাইতেন। কিন্তু এখন উপায় নাই।'

'উপায় নাই কেন ?'

'এখন কি তিনি আর বিবাহ করিবেন ?'

'তাঁহার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হয় নাই। অন্তরে বাহিরে তিনি যুবাপুরুষ। উপযুক্ত সঙ্গিনী পাইলে কেন বিবাহ করিবেন না ?'

'তা বটে।'

আর কোনও কথা হইল না। ক্রমে রট্টা ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রে কিন্তু ভাল নিদ্রা হইল না; বারবার কোন নিভৃত উৎকণ্ঠার পীড়নে ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল।

শিবিরের আর একটি কক্ষে স্কন্দ শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারও আজ ভাল নিদ্রা হইল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

রমণীর মন

স্কন্ধাবার তখনও জাগে নাই, পূর্বদিকের পর্বতরেখা আকাশের গায়ে পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। চিত্রক ও গুলিক বর্মা একশত সশস্ত্র অশ্বারোহী লইয়া যাত্রা করিল। চতুর্দিকের সুবিপুল নিস্তব্ধতার মধ্যে অশ্বের ক্ষুরধ্বনি ও অস্ত্রের ঝণৎকার অতি ক্ষীণ শুনাইল।

স্কন্দের অধিকৃত এই উপত্যকা হইতে নির্গমনের একটি পথ উত্তর দিকে, দুই গিরিশ্রেণীর মধ্যস্থলে প্রণালীর ন্যায় সঙ্কীর্ণ সঙ্কট পথ। এই সঙ্কট প্রায় দুই ক্রোশ দূর পর্যন্ত এক সহস্র সতর্ক প্রহরী দ্বারা রক্ষিত। পাছে শত্রু অতর্কিতে স্কন্ধাবার আক্রমণ করে তাই দিবারাত্র প্রহরার ব্যবস্থা। গুলিক বর্মা ও চিত্রক এই সঙ্কটমার্গ দিয়া চলিল। প্রহরীরা সংবাদ জানিত, তাহারা নিঃশব্দে পথ ছাড়িয়া দিল। ক্রমে সূর্য উঠিল, বেলা বাড়িতে লাগিল। সঙ্কট কখনও প্রশস্ত হইতেছে, আবার শীর্ণ হইতেছে; কদাচ দ্বিধা হইয়া অন্য উপত্যকায় মিশিতেছে। মাঝে মাঝে স্কন্দের গুপ্তচরেরা প্রচ্ছন্ন গুল্ম রচনা করিয়া অবস্থান করিতেছে, তাহাদের নিকট পথের সন্ধান জানিয়া লইয়া গুলিক বর্মার দল অগ্রসর হইল।

গুলিক ও চিত্রকের অশ্ব অগ্রে চলিয়াছে, পশ্চাতে শত যোদ্ধা। গুলিক স্বভাবত একটু বহুভাষী, এক রাত্রির পরিচয়ে চিত্রকের প্রতি তাহার সদ্ভাব জন্মিয়াছে, দু'জনেই সমপদস্থ সমবয়স্ক এবং যুদ্ধজীবী। গুলিক নানাবিধ প্রগল্ভ জল্পনা করিতে করিতে যাইতেছে; কোন্ রাজ্যের যোদ্ধারা কেমন যুদ্ধ করে, কোন্ দেশের যুবতীদের কিরূপ প্রণয়রীতি, আপন অভিজ্ঞতা হইতে এই সকল কাহিনী শুনাইতে শুনাইতে ধূমকেতুর

ন্যায় গুম্ফ আমর্শন করিয়া অট্টহাস্য করিতে করিতে চলিয়াছে। গুলিকের সরল চিত্তে যুদ্ধ ও যুবতী ভিন্ন অন্য কোনও চিন্তার স্থান নাই।

চিত্রক গুলিকের কথা শুনিতেছে, তাহার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া উচ্চ হাস্য করিতেছে, কদাচিৎ নিজেও দুই একটি সরস কাহিনী শুনাইতেছে। কিন্তু তাহার হৃদয়ের মর্মস্থলে একটি ভাবনা লূতা-কীটের ন্যায় নিভৃতে জাল বুনিতেছে। রট্টা…মন বলিতেছে রট্টা আর তাহার হইবে না। বিদ্যুৎ-শিখার মত অকস্মাৎ সে তাহার অন্তরে আসিয়াছিল, আবার বিদ্যুৎ-শিখার মতই অন্তর্হিত হইল, শুধু তাহার শূন্য অন্তর্লোকের অন্ধকার বাড়াইয়া দিয়া গেল। কাল রাত্রে সে বলিয়াছিল—ইহাতে ভালই হইবে। স্কন্দগুপ্ত রট্টার প্রতি আসক্ত হইয়াছেন ইহাতে ভালই হইবে।…কাহার ভাল হইবে?

কিন্তু রট্টার দোষ নাই। নব-যৌবনের স্বভাববশে সে চিত্রকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল; দুই দিনের নিত্য-সাহচর্য প্রীতির সৃজন করিয়াছিল… রাত্রে গুহার অন্ধকারে ভয়ব্যাকুল চিত্তে রট্টা যে-কথা বলিয়াছিল, যে-রূপ ব্যবহার করিয়াছিল তাহার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা যায় না; ক্ষণিকের আবেগ-বিহ্বলতাকে স্থায়ী মনোভাব মনে করা অন্যায়। রমণীর মন কোমল ও তরল—অল্প তাপে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

এই সময় চিত্রক গুলিকের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল; গুলিক একটি গল্প শেষ করিয়া বলিতেছে—'বন্ধু চিত্রক বর্মা, নারী যতক্ষণ তোমার বাহু মধ্যে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তোমার, বাহুমুক্ত হইলে আর কেহ নয়। অনেক দেশের অনেক নারী দেখিলাম; সকলে সমান, কোনও প্রভেদ নাই।'

চিত্রক হাসিয়া বলিল—'আমারও তাহাই অভিজ্ঞতা।'

গুলিক আবার নূতন কাহিনী আরম্ভ করিল।

না, চিত্রক রট্টাকে মন্দ ভাবিবে না। রট্টা রাজকন্যা; স্কন্দকে দেখিয়া সে যদি মনে মনে তাঁহার অনুরাগিণী হইয়া থাকে ইহাতে বিচিত্র

কি? স্কন্দের স্থায় অনুরাগের যোগ্য পাত্র আর্যাবর্তে আর কে আছে?… ইহাতে ভালই হইবে—মণিকাঞ্চন যোগ হইবে।…

জল নিম্নে অবতরণ করে; অগ্নির স্ফুলিঙ্গ উর্ধ্বে উচ্ছ্রিত হয়। রট্টা অগ্নির স্ফুলিঙ্গ; এত রূপ এত গুণ কি সাধারণ মানুষের ভোগ্য হইতে পারে?

কিন্তু—

চিত্রকের এখন কী হইবে? সাতদিনের মধ্যে তাহার জীবন সম্পূর্ণ ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। সাতদিন আগে সে যে-মানুষ ছিল, এখন আর সে-মানুষ নাই। সে রাজপুত্র; কিন্তু নিঃস্ব অজ্ঞাত রাজপুত্র; যতদিন সে নিজেকে সামান্য সৈনিক বলিয়া জানিত ততদিন তাহার চরিত্র অনুরূপ ছিল। আর কি সে সামান্য সৈনিক সাজিয়া যুদ্ধ করিতে পারিবে? তবে তাহার কী দশা হইবে? কী লইয়া সে জীবন কাটাইবে? লক্ষ্যহীন নিরালম্ব জীবন…যে আশাতীত আকাঙ্ক্ষার বস্তু অনাহূত তাহার হৃদয়ের উপকূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, প্রবলতর স্রোতের টানে সে দূরে ভাসিয়া যাইতেছে—

এখন সে কী করিবে? তাহার জীবনে আর কিছু অবশিষ্ট আছে কি?

গুলিক বর্মার হাস্য কণ্টকিত কণ্ঠস্বর চিত্রকের কর্ণে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। গুলিক বলিতেছে—'তিন বৎসর পরে সেই শত্রুর সাক্ষাৎ পাইলাম। বন্ধু, ভাবিয়া দেখ, পুরাতন শত্রুকে তরবারির অগ্রে পাওয়ার সমান আনন্দ আর আছে কি?'

চিত্রক বলিল—'না, এমন আনন্দ আর নাই।'

গুলিক বলিল—'সেদিন শত্রুর রক্তে তরবারির তর্পণ করিয়াছিলাম, সেকথা স্মরণ করিলে আজিও আমার হৃদয় হর্ষোৎফুল্ল হয়। ইহার তুলনায় রমণীর আলিঙ্গনও তুচ্ছ।'

চিত্রকের মনে পড়িয়া গেল। পুরাতন শত্রুর উপর প্রতিহিংসা সাধন।

এই কার্যটি বাকি আছে। যে তাহার পিতাকে হত্যা করিয়াছিল তাহাকে বধ করিয়া ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য পালন এখনও বাকি আছে। নিয়তি কুটিল পথে তাহাকে সেইদিকেই লইয়া যাইতেছে। রোট্ট ধর্মাদিত্যকে হত্যা করিয়া সে পিতৃঋণ মুক্ত হইবে।

তারপর? তারপর কি হইবে তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই। সকল পথের শেষেই তো মৃত্যু।

চিত্রক চষ্টনদুর্গ অভিমুখে চলুক, আমরা স্কন্দের শিবিরে ফিরিয়া যাই।

২

প্রাতঃকালে স্কন্দ বহিঃকক্ষে আসিয়া বসিলে পিপ্পলী মিশ্র তাঁহাকে স্বস্তিবাচন করিয়া বলিলেন—'বয়স্য, কাল রাত্রে বড় বিপদ গিয়াছে।'

স্কন্দ অন্যমনস্ক ছিলেন; বলিলেন—'বিপদ!'

পিপ্পলী বলিলেন—'শত্রু আমাদের সন্ধান পাইয়াছে। বয়স্য, এ স্থান আর নিরাপদ নয়।'

স্কন্দ তাঁহার বয়স্যকে চিনিতেন, তাই উদ্বিগ্ন হইলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন—'কাল রাত্রে কি ঘটিয়াছিল?'

পিপ্পলী বলিলেন—'কাল পরম সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, মধ্য রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অনুভব করিলাম, মেরুদণ্ডের অধোভাগে কি কিলবিল করিতেছে। ভারি আনন্দ হইল; বুঝিলাম কুলকুণ্ডলিনী জাগিতেছেন। জপতপ ধ্যানধারণা অধিক করি না বটে কিন্তু গোত্রফল কোথায় যাইবে? অতঃপর সহসা অনুভব করিলাম, কুণ্ডলিনী আমাকে দংশন করিতেছেন—দারুণ জ্বালা। দ্রুত উঠিয়া অনুসন্ধান করিলাম। কি বলিব বয়স্য, কুণ্ডলিনী নয়—পরম-ঘোর কাষ্ঠ-পিপীলিকা। তদবধি আর ঘুমাইতে পারি নাই।'

স্কন্দ ঈষৎ বিমনাভাবে বলিলেন—'কাল আমিও ঘুমাইতে পারি নাই।'

পিপ্পলী বলিলেন—'অ্যাঁ? তোমারও কাষ্ঠ-পিপীলিকা?"

স্কন্দ উত্তর দিলেন না, মনে মনে বলিলেন—'প্রায।'

এই সময় মহাবলাধিকৃত ও কয়েকজন সেনাপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন যুদ্ধ সংক্রান্ত মন্ত্রণা আরম্ভ হইল। শত্রুপক্ষ সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা লইয়া বাক্‌বিতণ্ডা তর্কবিচার চলিল। পরিশেষে স্থির হইল, শত্রুর অভিপ্রায় যতক্ষণ না স্পষ্ট হইতেছে ততক্ষণ তাহাদের আক্রমণ করা হইবে না, শত্রু যদি আক্রমণ করে তখন তাহাদের প্রতিরোধ করা হইবে। বর্তমানে স্কন্দের স্কন্ধাবার এই উপত্যকাতেই থাকিবে, স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই। এখান হইতে, শত্রু যে-পথেই যাক তাহার উপর দৃষ্টির রাখা চলিবে।

মন্ত্রণা সমাপ্ত হইতে দ্বিপ্রহর হইল। আহারাদি সম্পন্ন করিয়া স্কন্দ বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। লহরী আজ রট্টার সেবায় নিযুক্ত ছিল, একজন ভৃত্য স্কন্দকে ব্যজন করিল।

বিশ্রামান্তে স্কন্দ গাত্রোত্থান করিলে লহরী আসিয়া বলিল—'কুমার ভট্টারিকা রট্টা যশোধরা আসিতেছেন।'

রট্টা আসিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইল। সর্বাঙ্গে স্বর্ণভূষা ঝলমল করিতেছে, পরিধানে জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ চীনপট্ট, সীমন্তে মুক্তাফলের দাম। লহরী অতি যত্নে কবরী বাঁধিয়া দিয়াছে। রাজা মুগ্ধ বিস্ফারিত নেত্রে এই কন্দর্প-বিজয়িনী মূর্তির পানে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেকের জন্য নিজ অন্তরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন, ভাবিলেন, জীবন ভঙ্গুর, সুখ চঞ্চল; সারা জীবন যাহা খুঁজিয়া পাই নাই, তাহা যখন আপনি কাছে আসিয়াছে তখন আর বিলম্ব করিব না—

রট্টা রাজাকে প্রণাম করিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল—'দেব, এই সকল উপহারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিব কি, বিস্ময়ে আমি হতবাক্ হইয়াছি। আপনি কি ইন্দ্রজাল জানেন? নারী-বর্জিত সৈন্য-শিবিরে এই সকল অপূর্ব নূতন বস্ত্র অলঙ্কার কোথায় পাইলেন?'

স্মিতহাস্য করিয়া স্কন্দ বলিলেন—'সুচরিতে, চেষ্টা এবং পুরুষকার দ্বারা অপ্রাপ্য বস্তুও লাভ করা যায়।'

রট্টা নম্রকণ্ঠে বলিল—'তাহাই হইবে। আমি নারী, পুরুষকারের শক্তি কি করিয়া বুঝিব? প্রার্থনা করি আপনার সর্বজয়ী পুরুষকার চিরদিন অক্ষয় থাকুক। উপহারের জন্য আমার অন্তরের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন আর্য।'

স্কন্দ বলিলেন—'ধন্যবাদের প্রয়োজন নাই। তোমাকে উপহার দিয়া এবং সেই উপহার তোমার অঙ্গে শোভিত দেখিয়া আমি তোমার অপেক্ষা অধিক আনন্দ উপভোগ করিতেছি।'

স্কন্দের প্রশংসাদীপ্ত নেত্রতলে রট্টা সলজ্জ নতমুখে রহিল। স্কন্দ তখন বলিলেন—'যুদ্ধের চিন্তায় সর্বদা মগ্ন আছি, তোমার চিত্তবিনোদনের কোনও চেষ্টাই করিতে পারি নাই। এই সৈন্য-শিবিরে একাকিনী থাকিয়া তোমার মন নিশ্চয় উচাটন হইয়াছে, এস পাশা খেলি। খেলিবে?'

স্মিতমুখ তুলিয়া রট্টা বলিল—'খেলিব মহারাজ।'

স্কন্দের আদেশে লহরী পাশক্রীড়ার উপকরণ অক্ষবাট প্রভৃতি আনিয়া পাতিয়া দিল। রট্টা ও স্কন্দ অক্ষবাটের দুইদিকে বসিলেন।

রাজা পাশাগুলি দুই হস্তে ঘষিতে ঘষিতে মৃদু হাসিয়া বলিলেন—'কি পণ রাখিবে?'

রট্টা দীনভাবে বলিল—'আমার তো এমন কিছুই নাই মহারাজ, যাহা আপনার সম্মুখে পণ রাখিতে পারি।'

স্কন্দ প্রীতকণ্ঠে বলিলেন—'উত্তম, পণ এখন উহ্য থাক। যদি জয়ী হই তখন দাবী করিব।'

রট্টা বলিল—'কিন্তু আর্য, যে পণ আমার সাধ্যাতীত তাহা যদি আপনি আদেশ করেন, কী করিয়া দিব? পণ দিতে না পারিলে আমার যে কলঙ্ক হইবে।'

স্কন্দ বলিলেন—'তোমার সাধ্যাতীত পণ চাহিব না—তুমি নিশ্চিন্ত থাক।'

'ভাল মহারাজ।—আপনি কি পণ রাখিবেন?'

'তুমি কী পণ চাও?

রট্টা বলিল—'যদি বলি দণ্ড-মুকুট—ছত্র-সিংহাসন? মহারাজ পণ রাখিবেন কি?'

অনুরাগপূর্ণ চক্ষে রট্টার দিকে অবনত হইয়া স্কন্দ গাঢ়স্বরে বলিলেন—'এই পণ কি তুমি সত্যই চাও?'

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া রট্টা ধীরস্বরে বলিল—'আপনার পণও এখন উহ্য থাক, যদি জিতিতে পারি তখন চাহিয়া লইব।'

'ভাল।' বলিয়া স্কন্দ রুদ্ধশ্বাস মোচন করিলেন।

অতঃপর অক্ষক্রীড়া আরম্ভ হইল। মহারাজ স্কন্দগুপ্ত নবযুবকের ন্যায় উৎসাহ ও উত্তেজনা লইয়া নানা প্রকার রঙ্গ পরিহাস করিতে করিতে খেলিতে লাগিলেন। রট্টাও হাস্যকৌতুকে যোগ দিয়া পরম আনন্দে খেলিতে লাগিল। উভয়ে খেলায় মগ্ন হইয়া গেলেন।

এতক্ষণ লহরী ও পিপ্পলী মিশ্র এই কক্ষে উপস্থিত ছিলেন। পিপ্পলী অদূরে বসিয়া খেলা দেখিতেছিলেন; কিছুক্ষণ খেলা চলিবার পর মুখ তুলিয়া দেখিলেন, লহরী তাঁহাকে চোখের ইঙ্গিত করিতেছে। পিপ্পলী মিশ্র ইঙ্গিত বুঝিলেন। তারপর লহরী যখন লঘুপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল, তখন পিপ্পলীও নিঃশব্দে পা টিপিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রট্টা ও স্কন্দ ভিন্ন কক্ষে আর কেহ রহিল না। তাঁহারাও খেলায় এমনই নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন যে তাহাদের অলক্ষ্য অন্তর্ধান জানিতে পারিলেন না।

প্রায় তিন ঘটিকা মহা উৎসাহে খেলা চলিবার পর বাজি শেষ হইল। পরমভট্টারক শ্রীমন্মহারাজ স্কন্দ পরাজিত হইলেন।

রট্টা করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। স্কন্দ বলিলেন—'রট্টা যশোধরা,

আমি তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলাম। এখন কী পণ লইবে লও। দণ্ড-মুকুট ছত্র-সিংহাসন সমস্তই লইতে পার।'

রট্টা বলিল—'না মহারাজ, অত স্পর্ধা আমার নাই। আমার ক্ষুদ্র পণ যথাসময় যাচনা করিব।'

স্কন্দ কিয়ৎকাল রট্টার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—'ভাবিয়াছিলাম, পাশার বাজিতে তোমার নিকট হইতে এক অমূল্য বস্তু জিতিয়া লইব। কিন্তু তাহা হইল না। এখন নিতান্ত দীনভাবে তোমার নিকট ভিক্ষা চাওয়া ছাড়া অন্য পথ নাই। তুমি ভিক্ষা দিবে কি?'

স্কন্দ যে-কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহা রট্টার অপ্রত্যাশিত নয়, তবু তাহার হৃৎপিণ্ড দুরু দুরু করিয়া উঠিল। সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল—'আদেশ করুন আর্য।'

স্কন্দ বলিলেন—'আমার বয়স পঞ্চাশ বৎসর, কিন্তু আমি বিবাহ করি [illegible] বিবাহের প্রয়োজন কোনও দিন অনুভব করি নাই। এইরূপ [illegible]ভাবেই জীবন কাটিয়া যাইবে ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু তোমাকে দেখিয়া, তোমার পরিচয় পাইয়া তোমাকে জীবনসঙ্গিনী করিবার ইচ্ছা হইয়াছে।'

স্কন্দ এইটুকু বলিয়া নীরব হইলেন। রট্টাও দীর্ঘকাল নতমুখে নির্বাক রহিল। তারপর অতি কষ্টে স্খলিত বাক সংযত করিয়া বলিল—'দেব, আমি এ সৌভাগ্যের যোগ্যা নই। আমাকে ক্ষমা করুন।'

স্কন্দের চোখে ব্যথাবিদ্ধ বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল—'তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছ?'

সজল চক্ষু তুলিয়া রট্টা বলিল—'মহারাজ, আপনি অসীম শক্তিধর, সমুদ্রমেখলা আর্যভূমির অধীশ্বর, কেবল এই তুচ্ছ নারীদেহ লইয়া সন্তুষ্ট হইবেন?'

তীক্ষ্ণচক্ষে রট্টার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া স্কন্দ বলিলেন—'না, তোমার দেহ-মন দুই-ই আমার কাম্য। যদি হৃদয় না পাই, দেহে আমার প্রয়োজন নাই। এই বয়সে প্রাণশূন্য নারীদেহ বহন করিয়া বেড়াইতে পারিব না।'

গলদশ্রুনেত্রা রট্টা কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল—'রাজাধিরাজ, তবে মার্জনা করুন। হৃদয় দিবার অধিকার আমার নাই।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া স্কন্দ বলিলেন—'অন্যকে হৃদয় অর্পণ করিয়াছ?'

রট্টা মুখ অবনত করিল, পুষ্পের মনকোষে সঞ্চিত শিশির বিন্দুর ন্যায় কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া তাহার বক্ষে পড়িল।

দীর্ঘকাল উভয়ে নীরব। স্কন্দ ভূমিতে এক হস্ত রাখিয়া অক্ষবাটের দিকে চাহিয়া আছেন; তাঁহার মুখে বিচিত্র ভাবব্যঞ্জনা পরিস্ফুট হইয়া আবার মিলাইয়া যাইতেছে। শেষে তিনি একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিলেন; তাঁহার অধরে ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—'কিছুক্ষণ পূর্বে আমি বলিয়াছিলাম, পুরুষকার দ্বারা অপ্রাপ্য বস্তুও লাভ করা যায়। ভুল বলিয়াছিলাম। ভাগ্যই বলবান। কিন্তু তুমি ধন্য, ধন্য তোমার প্রেম। তোমার প্রেম পাইলাম না, এ ক্ষোভ মরিলেও যাইবে না।'

রট্টা সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়া রহিল, কথা বলিতে পারিল না। স্কন্দ আবার বলিলেন—'যাহাকে তুমি হৃদয় দান করিয়াছ সে যেই হোক—আমা অপেক্ষা ভাগ্যবান। তুমি বুদ্ধিমতী, তোমাকে প্রলোভন দেখাইব না, বলপূর্বক তোমাকে গ্রহণ করিবার চেষ্টাও করিব না। দীর্ঘকাল বলের চর্চা করিয়া দেখিয়াছি, বলের দ্বারা হৃদয় জয় করা যায় না। তুমি কাঁদিও না। আমি কখনও পরস্ব হরণ করি নাই, আজও তাহা করিব না।—তোমার নিকট একটি প্রার্থনা—আমাকে ভুলিও না, আমি যখন ইহলোকে থাকিব না, তখনও আমাকে মনে রাখিও।'

স্কন্দের পদস্পর্শ করিয়া বাষ্পাকুলকণ্ঠে রট্টা বলিল—'দেব, যতদিন

বাঁচিয়া থাকিব, আমার হৃদয় মন্দিরে আপনার মূর্তি দেবতার ন্যায় পূজা পাইবে।'

স্কন্দ ভট্টার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন—'সুখী হও।'

স্কন্দের শিবিরে যখন এই দৃশ্যের অভিনয় হইতেছিল, সেই সময় চিত্রক ও গুলিক বর্মা দলবল লইয়া চষ্টন দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইল। দিবা তখন একপাদ অবশিষ্ট আছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

হূণ বক্ষ

মৎস্যের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট একটি উপত্যকায় চষ্টনদুর্গ অবস্থিত। উত্তরদিক হইতে আর্যাবর্তে প্রবেশের যতগুলি সঙ্কট-পথ আছে, এই উপত্যকা তাহার অন্যতম, তাই এখানে দুর্গের প্রতিষ্ঠা। এই পথে পূর্বকালে বহু দুর্মদ যোধজাতির অভিযান আর্যভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে, বণিকের সার্থবাহ মহামূল্য পণ্য লইয়া যাতায়াত করিয়াছে, চৈন পরিব্রাজকগণ তীর্থযাত্রা করিয়াছেন। উপত্যকাটি উত্তরে দক্ষিণে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দীর্ঘ, প্রস্থে মাত্র অর্ধক্রোশ। পূর্বে ও পশ্চিমে অতট গিরিশ্রেণী।

চষ্টনদুর্গের সিংহদ্বার দক্ষিণমুখী। দুর্গটি দৃঢ়গঠন, কমঠাকৃতি, কিন্তু আয়তনে বৃহৎ নয়। উচ্চ প্রাকারবেষ্টনীর মধ্যে তিন চারি শত লোক বাস করিতে পারে।

অপরাহ্নে দুর্গের দ্বার খোলা ছিল, দূর হইতে অশ্বারোহীর দল আসিতে দেখিয়া ঝনৎকার শব্দে লৌহ-কবাট বন্ধ হইয়া গেল।

গুলিক ও চিত্রক দুর্গদ্বারের প্রায় শত হস্ত দূর পর্যন্ত আসিয়া অশ্বের গতিরোধ করিল। এই স্থানে কয়েকটি পার্বত্য বৃক্ষ ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া একটি বৃক্ষ-বাটিকা রচনা করিয়াছে। গুলিকের ইঙ্গিতে সৈনিকের দল অশ্ব হইতে নামিয়া অশ্বের পরিচর্যায় নিযুক্ত হইল। আজ রাত্রি সম্ভবত এই তরুতলেই কাটাইতে হইবে। সকলের সঙ্গে দুই তিন দিনের আহার্য ছিল।

চিত্রক ও গুলিক অশ্ব হইতে নামিল না। ওদিকে দুর্গের দ্বার তো বন্ধ হইয়া গিয়াছিলই, উপরন্তু দুর্গ প্রাকারের উপর বহু লোকের ব্যস্ত যাতায়াত দেখিয়া মনে হয় তাহারা আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া দুর্গ রক্ষার আয়োজন করিতেছে।

ইহাদের যুযুৎসা অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া চিত্রক মৃদু হাস্য করিল, বলিল—'মনে হইতেছে ইহারা বিনা যুদ্ধে আমাদের দুর্গে প্রবেশ করিতে দিবে না। আমরা কে কোথা হইতে আসিতেছি তাহা না জানিয়াই দুর্গরক্ষায় উদ্যত হইয়াছে।'

গুলিক বলিল—'আমাদের সংখ্যা দেখিয়া বোধহয় ভয় পাইয়াছে। আমরা সকলে দুর্গের দিকে অগ্রসর হইলে উহারা তীর ছুড়িবে, পাথর ফেলিবে, কিন্তু দুই এক জন যাইলে বোধহয় কিছু বলিবে না। আমরা কে তাহা জানিবার আগ্রহ নিশ্চয় উহাদের আছে। চল, আমরা দুইজনে যাই। আমাদের পরিচয় পাইলে নিশ্চয় দুর্গে প্রবেশ করিতে দিবে।'

চিত্রক বলিল—'সম্ভব। কিন্তু আমাদের দুইজনের যাওয়া উচিত হইবে না। যদি দুইজনকেই ধরিয়া রাখে তখন আমাদের নেতৃহীন সৈন্যেরা কী করিবে?'

গুলিক বলিল—'সে কথা সত্য। তবে তুমি থাক আমি যাই।'

চিত্রক বলিল—'না, তুমি থাক আমি যাইব। প্রথমত তোমাকে যদি ধরিয়া রাখে তখন আমি কিছুই করিতে পারিব না; সৈন্যেরা তোমার

অধীন, আমার সকল আদেশ না মানিতে পারে। দ্বিতীয়ত, আমি যদি কিরাত বর্মার সাক্ষাৎ পাই, আমি তাহাকে এমন অনেক কথা বলিতে পারিব যাহা তুমি জাননা। সুতরাং আমার যাওয়াই সমীচীন।'

যুক্তির সারবত্তা অনুভব করিয়া গুলিক সম্মত হইল। বলিল—'ভাল। দেখ যদি দুর্গে প্রবেশ করিতে পার। কিন্তু একটা কথা, সূর্যাস্তের পূর্বে নিশ্চয় ফিরিয়া আসিও। না আসিলে বুঝিব তোমাকে ধরিয়া রাখিয়াছে কিম্বা বধ করিয়াছে। তখন যথাকর্তব্য করিব।'

চিত্রক দুর্গের দিকে অশ্ব চালাইল। সে তোরণ হইতে বিশ হাত দূরে উপস্থিত হইলে তোরণশীর্ষ হইতে পরুষকণ্ঠে আদেশ আসিল—'দাঁড়াও।'

চিত্রক অশ্ব স্থগিত করিল; ঊর্ধ্বে চক্ষু তুলিয়া দেখিল, প্রাকারস্থ সারি সারি ইন্দ্রকোষের ছিদ্রপথে কয়েকজন ধানুকী ধনুতে শর সংযোগ করিয়া তাহার পানে লক্ষ্য করিয়া আছে। একটি ইন্দ্রকোষের অন্তরাল হইতে প্রশ্ন আসিল—'কে তুমি? কী চাও?'

চিত্রক গম্ভীরকণ্ঠে বলিল—'আমি পরম ভট্টারক শ্রীমন্মহারাজ স্কন্দগুপ্তের দূত। দুর্গাধিপ কিরাত বর্মার জন্য বার্তা আনিয়াছি।'

প্রাকারের উপর কিছুক্ষণ নিম্নস্বরে আলাপ হইল, তারপর আবার উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন হইল—'কী বার্তা আনিয়াছ?'

চিত্রক দৃঢ়স্বরে বলিল—'তাহা সাধারণের জ্ঞাতব্য নয়। দুর্গাধিপকে বলিব।'

আবার কিছুক্ষণ হ্রস্বকণ্ঠ আলোচনার পর তোরণ হইতে শব্দ আসিল—'উত্তম। অপেক্ষা কর।'

কিয়ৎকাল পরে দুর্গের কবাট ঈষৎ উন্মোচিত হইল। চিত্রক দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। কবাট আবার বন্ধ হইয়া গেল।

তোরণ অতিক্রম করিয়া দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার ঘোড়ার বল্গা ধরিল। চিত্রক অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ

করিল। চারিদিক হইতে প্রায় ত্রিশজন সশস্ত্র যোদ্ধা তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। চিত্রক লক্ষ্য করিল, ইহাদের অধিকাংশই আকৃতিতে হূণ; খর্বকায় গজস্কন্ধ ক্ষুদ্রচক্ষু, মুখে শ্মশ্রু গুম্ফের বিরলতা। সকলের চোখেই সন্দিগ্ধ কুটিল দৃষ্টি।

যে-ব্যক্তি ঘোড়া ধরিয়াছিল সে কর্কশকণ্ঠে বলিল—'তুমি দূত! যদি মিথ্যা পরিচয় দিয়া দুর্গে প্রবেশ করিয়া থাক উপযুক্ত শাস্তি পাইবে। চল, দুর্গাধিপ নিজ ভবনে আছেন, সেখানে সাক্ষাৎ হইবে।'

চিত্রক এই ব্যক্তিকে শান্তচক্ষে নিরীক্ষণ করিল। চল্লিশ বৎসর বয়স্ক দৃঢ়শরীর হূণ; বামগণ্ডে অসির গভীর ক্ষতচিহ্ন মুখের শ্রীবর্ধন করে নাই; বাচনভঙ্গী অতিশয় অশিষ্ট। চিত্রক কিন্তু কোনও রূপ ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া তাচ্ছিল্যের সহিত প্রশ্ন করিল—'তুমি কে?'

হূণের মুখ কালো হইয়া উঠিল, সে চিত্রকের প্রতি কষায়িত নেত্রপাত করিয়া বলিল—'আমার নাম মরুসিংহ। আমি চষ্টনদুর্গের রক্ষক—দুর্গপাল।'

আর কোনও কথা হইল না। চিত্রক নিরুৎসুক চক্ষে দুর্গের চারিদিক দেখিতে দেখিতে চলিল। দুর্গটি সাধারণ প্রাকারবেষ্টিত পুরীর মতই, বিশেষ কোনও বৈচিত্র্য নাই। মধ্যস্থলে দুর্গাধিপের প্রস্তর নির্মিত দ্বিভূমক ভবন।

ভবনের নিম্নতলে প্রশস্ত বহিঃকক্ষে কিরাত বাহু দ্বারা বক্ষ আবদ্ধ করিয়া ভ্রূকুটি বিকৃত মুখে পাদচারণা করিতেছিল; কক্ষের চার দ্বারে চারজন অস্ত্রধারী রক্ষী। চিত্রক ও মরুসিংহ কক্ষে প্রবেশ করিলে কিরাত তাহাদের লক্ষ্য করিল না, পূর্ববৎ পাদচারণা করিতে লাগিল। তারপর সহসা মুখ তুলিয়া ক্ষিপ্রপদে চিত্রকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

পরস্পরের দর্শনে উভয়ের মনে আনন্দ উপজাত হইল না। চিত্রক দেখিল কিরাতের আকৃতি হূণদের মত নয়; সে দীর্ঘকায় ও সুদর্শন;

কেবল তাহার চক্ষুদুটি ক্ষুদ্র ও ক্রূর। চিত্রক মনে মনে বলিল—তুমি কিরাত! রট্টার প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলে।

কিরাত বলিয়া উঠিল—'কে তুমি? কোথা হইতে আসিতেছ?'

চিত্রক বলিল—'পূর্বেই বলিয়াছি আমি সম্রাট স্কন্দগুপ্তের দূত। তাঁহার স্কন্ধাবার হইতে আসিয়াছি।'

ক্রোধ-তীক্ষ্ণ স্বরে কিরাত বলিল—'স্কন্দগুপ্ত! কী চায় স্কন্দগুপ্ত আমার কাছে? আমি তাহার অধীন নহি।'

চিত্রক বলিল—'সম্রাট স্কন্দগুপ্ত কী চান তাহা তাঁহার বার্তা হইতেই প্রকাশ পাইবে।' একটু থামিয়া বলিল—'শিষ্টসমাজে মাননীয় ব্যক্তি সম্বন্ধে বিনয় বাক্য প্রয়োগের রীতি আছে।'

কিরাত অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিল—'তুমি ধৃষ্ট। আমার দুর্গে আসিয়া আমার সহিত যে ধৃষ্টতা করে আমি তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া প্রাকার বাহিরে নিক্ষেপ করি।'

চিত্রকের ললাটের তিলকচিহ্ন ক্রমশ লাল হইয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু সে ধীরস্বরে বলিল—'সম্রাট স্কন্দগুপ্তের দূতকে লাঞ্ছিত করিলে স্কন্দ সহস্র রণ-হস্তী আনিয়া তোমাকে এবং তোমার দুর্গকে হস্তীর পদতলে নিষ্পিষ্ট করিবেন। মনে রাখিও আমি একা নই; বাহিরে শত অশ্বারোহী অপেক্ষা করিতেছে।'

মনে হইল কিরাত বুঝি ফাটিয়া পড়িবে; কিন্তু সে দন্ত দ্বারা অধর দংশন করিয়া অতি কষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করিল। অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে বলিল—'তুমি যে স্কন্দগুপ্তের তাহার প্রমাণ কি?'

চিত্রক নিঃশব্দে অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া দিল।

নতমুখে কিছুক্ষণ অঙ্গুরীয় পর্যবেক্ষণ করিয়া কিরাত যখন মুখ তুলিল তখন তাহার মুখ দেখিয়া চিত্রক অবাক হইয়া গেল। কিরাতের মুখে অগ্নিবর্ষ ক্রোধ আর নাই, তৎপরিবর্তে অধরপ্রান্তে মৃদু কৌতুকহাস্য ক্রীড়া

করিতেছে। কিরাত মিষ্টস্বরে বলিল—'দূত মহাশয়, আপনি স্বাগত। আমার রূঢ় ব্যবহারের জন্য কিছু মনে করিবেন না। যুদ্ধ বিগ্রহের সময় কোনও আগন্তুক দুর্গে প্রবেশ করিলে তাহাকে পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। আপনি যদি আমার তর্জনে ভয় পাইতেন তাহা হইলে বুঝিতাম—অঙ্গুরীয় সত্ত্বেও আপনি সম্রাটের দূত নয়, শত্রুর গুপ্তচর। যাহোক আপনার ব্যবহারে আমার সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে। আসুন—উপবেশন করুন।'

চিত্রক কথায় ভিজিল না; মনে মনে বুঝিল কিরাত তাহাকে ভয় দেখাইবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া এখন অন্য পথ ধরিয়াছে। সে আরও সতর্ক হইল। কিরাত শুধু ক্রুর ও ক্রোধী নয়, কপটতায় ধুরন্ধর।

উভয়ে আসন পরিগ্রহ করিলে কিরাত বলিল—'সম্রাট কি বার্তা পাঠাইয়াছেন? লিখিত লিপি?'

চিত্রক শুষ্কস্বরে বলিল—'না, সম্রাট সামান্য দুর্গাধিপকে লিপি লেখেন না। মৌখিক বার্তা।'

কিরাত এই অবজ্ঞা গলাধঃকরণ করিল। চিত্রক তখন বলিল—'সম্রাট সংবাদ পাইয়াছেন যে বিটঙ্করাজ রোট্ট ধর্মাদিত্য চষ্টন দুর্গে আছেন—'

চকিতে কিরাত প্রশ্ন করিল—'এ সংবাদ সম্রাট কোথায় পাইলেন?'

চিত্রক বলিল—'কুমার ভট্টারিকা রট্টা যশোধরার মুখে।'

কিরাতের চক্ষু ক্ষণেকের জন্য বিস্ফারিত হইল; সে কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল—'তারপর বলুন।'

'সম্রাট জানিতে পারিয়াছেন যে আপনি ছলপূর্বক ধর্মাদিত্যকে দুর্গে আবদ্ধ রাখিয়াছেন।'

কিরাত পরম বিস্ময়ভরে বলিয়া উঠিল—'আমি আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি! সে কি কথা! ধর্মাদিত্য আমার রাজা, আমার প্রভু—'

চিত্রক নীরসকণ্ঠে বলিয়া চলিল—'কুমার ভট্টারিকা রট্টা যশোধরাকেও আপনি কপট-পত্র পাঠাইয়া দুর্গে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—'

গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কিরাত বলিল—'সকলেই আমাকে ভুল বুঝিয়াছে। ইহা দুর্দৈব ছাড়া আর কি হইতে পারে? ধর্মাদিত্য স্বয়ং কন্যাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন—'

চিত্রক বলিল—'সে যা হোক, সম্রাট স্কন্দগুপ্ত আদেশ দিয়াছেন অচিরাৎ বিটঙ্করাজকে আমাদের হস্তে অর্পণ করুন। সম্রাট তাঁহার সাক্ষাতের অভিলাষী।'

কিরাত বলিল—'কিন্তু বিটঙ্করাজ আমার অধীন নয়, আমিই তাঁহার অধীন। সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করা না করা তাঁহার ইচ্ছা।'

'তবে বিটঙ্করাজকেই সম্রাটের আদেশ জানাইব। তিনি কোথায়?'

'তিনি এই ভবনেই আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি অতিশয় অসুস্থ। তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইতে পারে না।'

কিছুক্ষণ উভয়ে চোখে চোখে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কিরাতের দৃষ্টি অবনত হইল না। শেষে চিত্রক বলিল—'তবে কি বুঝিব সম্রাটের আজ্ঞা পালন করিতে আপনি অসম্মত?'

কিরাত ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—'দূত মহাশয়, আপনিও আমাকে ভুল বুঝিতেছেন। আমি অসহায়। ধর্মাদিত্য আমার রাজা, আমার পিতৃ-তুল্য, তাঁহার জীবন বিপন্ন করিয়া আমি আপনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটাইতে পারি না। বৈদ্য আমাদের সাবধান করিয়া দিয়াছেন, কোনও প্রকার উত্তেজনার কারণ ঘটিলেই ধর্মাদিত্যের প্রাণবিয়োগ হইবে।'

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া চিত্রক বলিল—'মহারাজের সঙ্গে সন্নিধাতা আসিয়াছিল, তাহার নাম হর্ষ। সে কোথায়?'

স্কন্দগুপ্তের দূতের কাছে কিরাত এ প্রশ্ন প্রত্যাশা করে নাই, সে চমকিয়া উঠিল। তারপর দ্রুতকণ্ঠে বলিল—'হর্ষ আসিয়াছিল বটে, কিন্তু গতকল্য কপোতকূটে ফিরিয়া গিয়াছে।'

'আর নকুল? এবং তাহার সহচরগণ?'

'রাজকন্যা রট্টা যশোধরা আসিলেন না দেখিয়া তাহারাও ফিরিয়া গিয়াছে।'

কিরাত যে মিথ্যা কথা বলিতেছে তাহা চিত্রক বুঝিতে পারিল; হর্ষ ও নকুলের দল দুর্গেই কোনও কূটকক্ষে বন্দী আছে। সে নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—'দুর্গাধিপ মহাশয়, আমার দৌত্য শেষ হইয়াছে। সম্রাটকে সকল কথা নিবেদন করিব; তারপর তাঁহার যেরূপ অভিরুচি তিনি করিবেন। তিনি আপনাকে জানাইতে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার আদেশ অমান্য করিলে তিনি স্বয়ং আসিয়া সহস্র হস্তী দ্বারা দুর্গ সমভূমি করিবেন। আপনাকে একথা জানাইয়া রাখা উচিত বিবেচনা করি।'

চিত্রক ফিরিয়া দ্বারের দিকে চলিল।

'দূত মহাশয়!'

কিরাত তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। কিরাতের কণ্ঠস্বর মর্ম্মাহত, মুখের ভাব বংশবদ। সে বলিল—'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না, কিন্তু ভাবিয়া দেখুন মহাপরাক্রান্ত সম্রাটের বিরাগভাজন হইয়া আমার লাভ কি? নিতান্ত নিরুপায় হইয়া আমি—'

'সে কথা সম্রাট বিবেচনা করিবেন।'

'দূত মহাশয়, আপনাব প্রতি আমার একটি নিবেদন আছে। আপনি কয়েকদিন অপেক্ষা করুন, এখনি ফিরিয়া যাইবেন না। ইতিমধ্যে যদি ধর্মাদিত্য আরোগ্য হইয়া ওঠেন তখন আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথোচিত কর্তব্য করিবেন। আমার দায়িত্ব শেষ হইবে।'

এ আবার কোন্ নূতন চাতুরী? চিত্রক বিবেচনা কবিয়া বলিল—'আমি আগামী কল্য সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা কবিতে পারি। তাহার অধিক নয়।'

কিরাত ললাট কুঞ্চিত করিয়া বলিল—'মাত্র কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত! ভাল, আপনার যেরূপ অভিরুচি। আপনাদের সকলকে দুর্গ মধ্যে স্থান দিতে

পারিলে সুখী হইতাম; কিন্তু দুর্গে স্থানাভাব।—মরুসিংহ, দূত-প্রবরকে সসম্মানে দুর্গ বাহিরে প্রেরণ কর।'

মরুসিংহ হিংস্রচক্ষে চিত্রকের পানে চাহিল; তারপর বাক্যব্যয় না করিয়া বাহিরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। চিত্রক তাহার অনুগামী হইল।

ভবনের প্রতিহারভূমি পর্যন্ত আসিয়া চিত্রক একবার ফিরিয়া চাহিল। দ্বারের কাছে কিরাত দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখে বংশবদ ভাব আর নাই, দুই চক্ষু হইতে কুটিল হিংসা বিকীর্ণ হইতেছে। চারি চক্ষুর মিলন হইতেই কিরাত ফিরিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল।

*　　*　　*　　*

চিত্রক যখন বৃক্ষবাটিকায় ফিরিয়া আসিল তখন সূর্যাস্ত হইতেছে। গুলিককে সমস্ত কথা বলিলে গুলিক গুম্ফের প্রান্ত আকর্ষণ করিতে করিতে বলিল—'হুঁ। অসভ্য বর্বরটার কোনও দুরভিসন্ধি আছে। রাত্রে সাবধান থাকিতে হইবে; অতর্কিতে আক্রমণ করিতে পারে।'

কিরাতের যে কোনও গুপ্ত অভিপ্রায় আছে তাহা চিত্রকও সন্দেহ করিয়াছিল; কিন্তু রাত্রে আক্রমণ করিবে তাহা তাহার মনে হইল না। অন্য কোনও উদ্দেশ্যে কিরাত কালবিলম্ব করিতে চাহে। কিন্তু কী সেই উদ্দেশ্য? চিত্রকের দল ফিরিয়া না গিয়া এখানে থাকিলে কিরাতের কী সুবিধা হইবে? কিরাত কি ধর্মাদিত্যকে হত্যা করিয়াছে? কিম্বা হত্যা করিতে চায়? সম্ভব নয়। ইচ্ছা থাকিলেও আর তাহা সাহস করিবে না। তবে কী?

গুলিক বলিল—'দণ্ডেন গো-গদভৌ—লোকটাকে হাতে পাইলে লাঠ্যৌষধি দিয়া সিধা করিতাম। যাহোক উপস্থিত সতর্ক থাকা দরকার। আমি দশজন প্রহরী লইয়া মধ্যরাত্রি পর্যন্ত পাহারায় থাকিব, বাকি রাত্রি তুমি পাহারা দিও।'

সন্ধ্যার পর চিত্রক বৃক্ষতলে কম্বল পাতিয়া শয়ন করিল। দেহ ও মন দুইই ক্লান্ত, সে অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল।

মধ্যরাত্রে গুলিক আসিয়া তাহাকে জাগাইয়া দিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইতেই গুলিক তাহার কম্বলে শয়ন করিয়া নিমেষ মধ্যে নিদ্রাভিভূত হইল এবং ঘর্ঘর শব্দে নাসিকাধ্বনি করিতে লাগিল।

বৃক্ষবাটিকায় ঘোর অন্ধকার, চারিদিকে সৈন্যগণ ভূ-শয্যায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে। তরুছায়ার বাহিরে আসিয়া চিত্রক সাবধানে বৃক্ষবাটিকা পরিক্রমণ করিল। ভূমি সমতল নয়; অত্রতত্র বৃহৎ পাষাণ খণ্ড পড়িয়া আছে, অন্ধকারে দৃষ্টিগোচর হয় না। দশজন সৈনিক স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে প্রহরা দিতেছে। বাটিকার পশ্চাদ্‌ভাগে অশ্বগুলি ছন্দবদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে। বাহিরের দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া চিত্রক কিছুই দেখিতে পাইল না; ঘন তমিস্রায় সমস্ত একাকার হইয়া গিয়াছে। কেবল দুর্গের উন্নত স্কন্ধ আকাশের গাত্রে গাঢ়তর অন্ধকারের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে।

সতর্ক থাকা ব্যতীত প্রহরীর আর কিছু করিবার নাই। চিত্রক তরবারি কোমরে বাঁধিয়া অলস মন্থর পদে বৃক্ষবাটিকা প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। দুর্গ নিস্তব্ধ, শব্দ মাত্র নাই। নানা অসংলগ্ন চিন্তা চিত্রকের মস্তিষ্কে ক্রীড়া করিতে লাগিল। রট্টা ··স্কন্দগুপ্ত · কিরাত ··

ক্রমে চন্দ্রোদয় হইল। চন্দ্রের পরিপূর্ণ মহিমা আর নাই, অনেকখানি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। তবু তাহার ক্ষীণ প্রভায় চতুর্দিক অস্পষ্টভাবে আলোকিত হইল।

পরিক্রমণ করিতে করিতে চিত্রক লক্ষ্য করিল, যে-দশজন সৈনিক পাহারা দিতেছে তাহারা প্রত্যেকেই একটি বৃক্ষকাণ্ডে বা প্রস্তরখণ্ডে পৃষ্ঠ রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের চক্ষু মুদিত। চিত্রক বিস্মিত হইল না; দাঁড়াইয়া ঘুমাইবার অভ্যাস প্রত্যেক সৈনিককে আয়ত্ত করিতে হয়।

অল্পমাত্র শব্দ শুনিলেই তাহারা জাগিয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সে তাহাদের জাগাইল না।

শত হস্ত দূরে দুর্গের তোরণ ও প্রাকার ম্লান জ্যোৎস্নায় ছায়াচিত্রবৎ দেখাইতেছে। অকারণেই চিত্রক সেই দিকে চলিল। একবার তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে একটি চিন্তা ক্ষণিক রেখাপাত করিল—এই দুর্গ ন্যায়ত ধর্মত আমার!

অর্ধেক দূর গিয়া চিত্রক থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল; তারপর দ্রুত এক প্রস্তরখণ্ডের পশ্চাতে লুকাইল। তাহার চোখের দৃষ্টি স্বভাবতই অতিশয় তীক্ষ্ণ। সে দেখিল, দুর্গের দ্বার নিঃশব্দে খুলিতেছে; অল্প খুলিবার পর দ্বারপথে একজন অশ্বারোহী বাহির হইয়া আসিল।

চিত্রক কুঞ্চিত পলকহীন নেত্রে চাহিয়া রহিল। কিন্তু আর কোনও অশ্বারোহী বাহিরে আসিল না, দুর্গদ্বার আবার বন্ধ হইয়া গেল। যে অশ্বারোহী বাহিরে আসিয়াছিল, এতদূর হইতে মন্দালোকে চিত্রক তাহার মুখ দেখিতে পাইল না। অশ্বারোহী বাম দিকে অশ্বের মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দ ছায়ার ন্যায় প্রাকারের পাশ দিয়া চলিল।

অশ্বারোহীর ভাব-ভঙ্গীতে আত্মগোপনের চেষ্টা পরিস্ফুট; অশ্বক্ষুর হইতে কিছুমাত্র শব্দ বাহির হইতেছে না। চিত্রক একাগ্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া দেখিল—অশ্বের চারি পায়ে ক্ষুরের উপর বস্ত্রের মতো কিছু বাঁধা রহিয়াছে, তাই শব্দ হইতেছে না। কোথায় যাইতেছে এই নৈশ অশ্বারোহী—?

সহসা তড়িচ্চমকের ন্যায় চিত্রকের মস্তিষ্ক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পলকের মধ্যে কিরাতের সমস্ত কুটিল দুরভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িল। চিত্রক বুঝিল অশ্বারোহী চোরের মত কোথায় যাইতেছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

উপসংহার

দুর্গ হইতে প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরে গিয়া অশ্বারোহী অশ্ব থামাইল। উপত্যকা এখানে সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, চারিদিকে উচ্চ নীচ প্রস্তরখণ্ড বিকীর্ণ; সাবধানে অশ্ব চালাইতে হয়। পথ এত বিঘ্নসঙ্কুল বলিয়াই অশ্বারোহীকে চন্দ্রোদয়ের পর যাত্রা করিতে হইয়াছে; উপরন্তু চন্দ্রালোক সত্ত্বেও বেগে অশ্বচালনা করা সম্ভব হয় নাই। শব্দ নিবারণের জন্য ঘোড়ার পায়ে কর্পট বাঁধা; এরূপ অবস্থায় ঘোড়া অধিক বেগে দৌড়িতে পারে না।

অশ্বারোহী পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দূর পর্যন্ত নিরীক্ষণ করিল। প্রস্তরখণ্ডগুলা চারিদিকে কালো কালো ছায়া ফেলিয়াছে, সচলতার আভাস নাই; সব স্থির নিথর। অশ্বারোহী অশ্ব হইতে অবরোহণ করিল। ঘোড়ার ক্ষুরের কর্পট খুলিয়া এবার বেগে ঘোড়া ছুটানো যাইতে পারে; শব্দ হইলেও শুনিবার কেহ নাই।

তিনটি ক্ষুরের বস্ত্র খুলিয়া অশ্বারোহী চতুর্থ ক্ষুরে হাত দিয়াছে এমন সময় ঘোড়াটা ভয় পাইয়া দূরে সরিয়া গেল। অশ্বারোহী চকিতে উঠিয়া পিছু ফিরিল, অমনি তরবারির অগ্রভাগ তাহার বুকে ঠেকিল। চিত্রক বলিল—'মরুসিংহ, অশুভক্ষণে যাত্রা করিয়াছিলে। আমার সঙ্গে ফিরিতে হইবে।'

মরুসিংহের বুকে লৌহজালিক ছিল, সে এক লাফে পিছু হটিয়া সঙ্গে সঙ্গে তরবারি বাহির করিল। চিত্রকের অসি তাহার বুকে বিঁধিল না, তাহাকে আর একটু দূরে ঠেলিয়া দিল মাত্র।

তখন মলিন চন্দ্রালোকে দুইজনে অসিযুদ্ধ হইল।

যুদ্ধ শেষ হইলে চিত্রক মরুসিংহের বুকের উপর বসিয়া তাহার হস্তদ্বয়

তাহারই উষ্ণীষ-বস্ত্র দিয়া বাঁধিল ; তারপর তাহাকে দাঁড় করাইয়া উষ্ণীষ-বস্ত্র তাহার কটিতে জড়াইল ; উষ্ণীষ-প্রান্ত বামহস্তে এবং তরবারি দক্ষিণহস্তে ধরিয়া বলিল—'এবার চল। হাঁটিয়া ফিরিতে হইবে। তুমি আগে চল, আমি পিছনে থাকিব। পলায়নের চেষ্টা করিও না—'

মরুসিংহ এতক্ষণ একটি কথা বলে নাই, এখনও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না।

তাহারা যখন তরুবাটিকায় ফিরিল তখন ঊষার আলোক ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে ; কিন্তু তখনও রাত্রির ঘোর কাটে নাই।

চিত্রকের রহস্যময় অন্তর্ধান ইতিমধ্যে লক্ষিত হইয়াছিল। ছাউনীতে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল ; সকলে জাগিয়া উঠিয়াছিল। চিত্রক বন্দীসহ ফিরিতেই গুলিক ছুটিয়া আসিয়া বলিল—'একি, কোথায় গিয়াছিলে ? এ কে ?'

চিত্রক বলিল—'ইনি চষ্টনদুর্গের দুর্গপাল—মরুসিংহ। আগে ইহাকে শক্ত করিয়া গাছের কাণ্ডে বাঁধ। তারপর সব বলিতেছি।'

মরুসিংহকে গাছে বাঁধিয়া দুইজন রক্ষী খোলা তলোয়ার হাতে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন নিশ্চিন্ত হইয়া চিত্রক গুলিককে অন্তরালে লইয়া গিয়া রাত্রির সমস্ত ঘটনা বলিল।

শুনিয়া গুলিক বলিল—'তোমার অনুমানই সত্য। কিন্তু কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, হূণটার মুখ হইতে প্রকৃত কথা জানিতে হইবে।'

চিত্রক বলিল—'উহার নিকট হইতে কথা বাহির করা শক্ত হইবে।'

গুলিক বলিল—'যদি সহজে না বলে তখন কথা বাহির করিবার অন্য পথ ধরিব।'

তখন সূর্যোদয় হইয়াছে। চিত্রক ও গুলিক গিয়া মরুসিংহকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। মরুসিংহ কিন্তু নীরব ; একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিল না।

ক্রমে বেলা বাড়িয়া চলিল। নিরামিষ প্রশ্নে ফল হইতেছে না দেখিয়া গুলিক লাঠ্যৌষধের প্রয়োগ করিল। কিন্তু মরুসিংহের মুখ খুলিল না। দৈহিক পীড়ন ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। প্রাণে না মারিয়া যতদূর নৃশংসতা প্রয়োগ করা যাইতে পারে তাহা প্রযুক্ত হইল।

দ্বিপ্রহর হইল। তথাপি মরুসিংহের মুখের অর্গল খুলিল না দেখিয়া গুলিক বর্মা সহসা হুঙ্কার ছাড়িল—'হতবুদ্ধি হূণ যখন প্রশ্নের উত্তর দিবেনা তখন উহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া লাভ নাই। উহাকে ঘোড়া দিয়া চিরিয়া ফেলিব। তবু একটা হূণ কমিবে।'

ঘোড়া দিয়া চিরিয়া ফেলার প্রক্রিয়া অতি সহজ। যাহাকে চিরিয়া ফেলা হইবে তাহার দুই পায়ে দুইটি রজ্জুর প্রান্ত বাঁধিয়া রজ্জু দুটির অন্ত প্রান্ত দুইটি ঘোড়ার সহিত বাঁধিয়া দিতে হইবে; তারপর ঘোড়া দুইটিকে এক সঙ্গে বিপরীত দিকে ছুটাইয়া দিতে হইবে—

মরুসিংহকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার গুল্ফে রজ্জু বাঁধা হইলে মরুসিংহ প্রথম কথা কহিল। বলিল—'প্রশ্নের উত্তর দিব।'

দুইজন রক্ষী মরুসিংহকে টানিয়া দাঁড় করাইল।

অতঃপর প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হইল।

প্রশ্ন: গত রাত্রে চুপি চুপি কোথায় যাইতেছিলে?

উত্তর: হূণ শিবিরে।

প্রশ্ন: হূণ শিবির কত দূর?

উত্তর: এখান হইতে ত্রিশ ক্রোশ বায়ুকোণে।

প্রশ্ন: পথ আছে?

উত্তর: গুপ্তপথ আছে।

প্রশ্ন: তুমি হূণদের পথ দেখাইয়া আনিতে যাইতেছিলে?

উত্তর: হাঁ।

প্রশ্ন: কে তোমাকে পাঠাইয়াছিল?

উত্তর : দুর্গাধিপ।

প্রশ্ন : তুমি নিজ ইচ্ছায় যাও নাই ? প্রমাণ কি ?

উত্তর : দুর্গাধিপের পত্র আছে।

প্রশ্ন : কোথায় পত্র ?

উত্তর : আমার তরবারির কোষের মধ্যে।

মরুসিংহের কটি হইতে তখনও শূন্য কোষ ঝুলিতেছিল। কোষ ভাঙ্গিয়া তাহার নিম্ন প্রান্ত হইতে লিপি বাহির হইল। অগুরুত্বকের পত্র, তদুপরি ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিত লিপি। লিপি পাঠ করিয়া মরুসিংহকে আর প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন হইল না। গুলিক বলিল—'বন্দীকে পানাহার দাও। কিন্তু বাঁধিয়া রাখ। উহার ব্যবস্থা পরে হইবে।'

তারপর চিত্রক ও গুলিক বিরলে গিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ করিল। মন্ত্রণার ফলে দুইজন অশ্বারোহী বার্তা লইয়া স্কন্দের স্কন্ধাবারের দিকে যাত্রা করিল। গুরুতর সংবাদ ; অবিলম্বে সম্রাটের গোচর করা প্রয়োজন।

তারপর মন্ত্রণানুযায়ী, অপরাহ্নের দিকে চিত্রক একাকী দুর্গতোরণের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল—'দুর্গস্বামীর সাক্ষাৎ চাহি।'

আজ আর বিলম্ব হইল না। দুর্গদ্বার খুলিয়া গেল ; চিত্রক প্রবেশ করিল।

কিরাত নিজ ভবনে ছিল, হাসিয়া চিত্রককে সম্ভাষণ করিল—'দূত মহাশয়, আপনি ফিরিয়া যাইবার জন্য নিশ্চয় বড় চঞ্চল হইয়াছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ধর্মাদিত্যের অবস্থা পূর্ববৎ, কোন উন্নতি হয় নাই। আপনাকে আরও দুই একদিন অপেক্ষা করিতে হইবে।'

চিত্রক উত্তর দিলনা, স্থির দৃষ্টিতে কিরাতের পানে চাহিয়া রহিল।

কিরাত পুনশ্চ বলিল—'অবশ্য আপনারা যদি নিতান্তই থাকিতে না পারেন তাহা হইলে কল্য প্রাতে ফিরিয়া যাওয়াই কর্তব্য। কিন্তু যে কার্য

করিতে আসিয়াছেন তাহার শেষ না দেখিয়া ফিরিয়া যাওয়া উচিত হইবে কি ?' কিরাতের কণ্ঠস্বরে গোপন ব্যঙ্গের আভাস ফুটিয়া উঠিল।

কিরাতের মুখের উপর স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া চিত্রক বলিল—'আমরা ফিরিয়া না যাই ইহাই আপনার ইচ্ছা ?'

'হাঁ—অবশ্য। সম্রাটের আদেশ—'

'কিন্তু তাহাতে আপনার কোনও লাভ হইবে না।'

'আমার লাভ—?' কিরাত প্রখর চক্ষে চাহিল।

চিত্রক শান্ত স্বরে বলিল—'আপনি আশা করিতেছেন আপনার নিমন্ত্রণ লিপি পাইয়া হূন সেনাপতি সসৈন্যে আসিয়া আমাদের হত্যা করিবে। কিন্তু তাহা হইবার নয়। মরুসিংহ ধরা পড়িয়াছে; যে অধম গুপ্তচর হূণদের পথ দেখাইয়া আনিতে পারিত, সে এখন আমাদের হাতে।'

কিরাত প্রস্তরমূর্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া চিত্রক আবার বলিতে লাগিল—'আপনার পত্র হইতে আপনার অভিপ্রায় সমস্তই ব্যক্ত হইয়াছে। আপনি শত্রুকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া প্রথমে নিজ দুর্গ এবং ধর্মাদিত্যকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে চান; তারপর হূণেরা যাহাতে সহজে বিটঙ্ক রাজ্য অধিকার করিয়া সম্রাট স্কন্দগুপ্তের কণ্টকস্বরূপ হইতে পারে সেজন্য তাহাদের সাহায্য করিতেও উদ্যত আছেন। আপনি রাজদ্রোহী—দেশদ্রোহী। কিন্তু সম্রাট স্কন্দগুপ্ত ক্ষমাশীল পুরুষ। এখনও যদি আপনি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া বৃদ্ধ ধর্মাদিত্যকে আমাদের হস্তে অর্পণ করেন তাহা হইলে সম্রাট হয় তো আপনাকে ক্ষমা করিতে পারেন।'

এতক্ষণে কিরাত আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ন্যায় ফাটিয়া পড়িল। তাহার অগ্নিবর্ণ মুখে শিরা উপশিরা স্ফীত হইয়া উঠিল; সে উন্মত্তবৎ গর্জন করিয়া বলিল—'রাজদ্রোহী! দেশদ্রোহী! মূর্খ দূত, তুমি কী বুঝিবে কেন আমি হূণকে ডাকিয়াছি! এ রাজ্য আমার—অধম ধর্মাদিত্য

প্রবঞ্চনা করিয়া আমার পৈতৃক অধিকার অপহরণ করিয়াছে! আমি বিটঙ্ক রাজ্যের ন্যায্য রাজা—'

চিত্রক বলিয়া উঠিল—'তুমি ন্যায্য রাজা ?'

বাধা অগ্রাহ্য করিয়া কিরাত ফেনায়িত মুখে বলিয়া চলিল—'তথাপি আমি ধৈর্য ধরিয়া ছিলাম, বিদ্রোহ করিয়া নিজ অধিকার সবলে গ্রহণ করিতে চাহি নাই। আমি শুধু চাহিয়াছিলাম, ধর্মাদিত্যের কন্যাকে বিবাহ করিয়া উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসন লাভ করিব। তাহাতে কাহারও ক্ষতি হইত না। কিন্তু নষ্টবুদ্ধি ধর্মাদিত্য এবং তাহার নষ্টবুদ্ধি কন্যা—'

চিত্রক বাধা দিয়া প্রশ্ন করিল—'বিটঙ্ক রাজ্য ন্যায়ত তোমার একথার অর্থ কি ?'

'তাহা তুমি বুঝিবে না। হূণ হইলে বুঝিতে। আমার পিতা তুষ্‌ফাণ স্বহস্তে পূর্ববর্তী আর্য রাজার মস্তক স্কন্ধচ্যুত করিয়াছিলেন; সেই অধিকারে বিটঙ্ক রাজ্য আমার পিতার প্রাপ্য। হূণদের মধ্যে এইরূপ প্রথা আছে। কিন্তু চতুর ধর্মাদিত্য—'

'কি বলিলে? তোমার পিতা পূর্ববর্তী আর্য রাজাকে হত্যা কবিয়াছিল? ধর্মাদিত্য হত্যা করে নাই ?'

'না। এ কথা সকলে জানে। কিন্তু এ পৃথিবীতে সুবিচার নাই—'

চিত্রকের তিলক ত্রিলোচনের ললাট বহ্নির ন্যায় জ্বলিতেছিল। সে কিরাতের দিকে একপদ অগ্রসর হইল—

এই সময় বাহিরে উচ্চ গণ্ডগোল শুনা গেল। দুই তিনজন প্রাকার রক্ষী কক্ষের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। একজন রুদ্ধশ্বাসে বলিল—'দুর্গেশ, শত শত রণহস্তী লইয়া একদল সৈন্য দক্ষিণদিক হইতে আসিতেছে। বোধ হয় স্বয়ং স্কন্দগুপ্ত। একটি হস্তীর মাথায় শ্বেত ছত্র রহিয়াছে।'

* * * *

স্কন্দগুপ্ত বলিলেন—'রট্টা যশোধরার নিকট পাশার বাজি হারিয়াছিলাম, তাই পণ রক্ষার জন্য আসিতে হইয়াছে। এখন দেখিতেছি আসিয়া ভালই করিয়াছি।'

দুর্গের মধ্যে উন্মুক্ত স্থানে সভা বসিয়াছিল; স্কন্দের রণহস্তীর দল চক্রাকারে সভাস্থল ঘিরিয়া ছিল। দুর্গ এখন স্কন্দের অধিকারে। কিরাত স্কন্দের বিরুদ্ধে দুর্গদ্বার রোধ করিতে সাহসী হয় নাই; প্রাণ বাঁচাইবার ক্ষীণ আশা লইয়া তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

এদিকে কপোতকূট হইতে চতুরানন ভট্ট অনুমান চারিশত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রায় স্কন্দের সমকালেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গর্দভপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া জম্বুকও সঙ্গে আসিয়াছে।

স্কন্দ একটি প্রশস্ত বেদীর উপর বসিয়াছিলেন; পাশে ধর্মাদিত্য। ধর্মাদিত্যের দেহ শুষ্ক শীর্ণ, মুখে ক্লেশের চিহ্ন বিদ্যমান; কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া মরণাপন্ন রোগী বলিয়া মনে হয়না। রট্টা যশোধরা তাঁহার জানু আলিঙ্গন করিয়া পদপ্রান্তে বসিয়াছিল। চিত্রক গুলিক ও আরও অনেক সেনামুখ্য সভার সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান ছিল। কিরাত কিছু দূরে একাকী বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

ধর্মাদিত্য ভগ্নস্বরে বলিলেন—'আমার আর রাজ্যসুখে স্পৃহা নাই। আমি সংঘের শরণ লইব। রাজাধিরাজ, আপনি আমার এই ক্ষুদ্র রাজ্য গ্রহণ করুন; আততায়ীর সন্ত্রাস হইতে প্রজাকে রক্ষা করুন।'

স্কন্দ বলিলেন—'তাহা করিতে পারি। কিন্তু আমি তো বিটঙ্ক রাজ্যে থাকিয়া রাজ্য শাসন করিতে পারিব না। একজন স্থানীয় সামন্ত প্রয়োজন, যে সিংহাসনে বসিয়া প্রজা শাসন করিবে। এমন কে আছে?'

ধর্মাদিত্য বলিলেন—'আমার একমাত্র কন্যা আছে—এই রট্টা যশোধরা।' বলিয়া রট্টার মস্তকে হস্ত রাখিলেন।

স্কন্দ বলিলেন—'রট্টা আপনার কুমারী কন্যা। যদি আপনার জামাতা থাকিত সে আপনার স্থলাভিষিক্ত হইয়া রাজ্য শাসন করিতে পারিত, কাহারও ক্ষোভের কারণ হইত না। কিন্তু অনধিকারী ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইলে রাজ্যে অশান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা, বর্তমান অবস্থায় তাহা বাঞ্ছনীয় নয়। ধর্মাদিত্য, আপনি আরও কিছুকাল রাজদণ্ড ধারণ থাকুন। তারপর—'

ধর্মাদিত্য সবিনয়ে যুক্তকরে বলিলেন—'আমাকে ক্ষমা করুন। সংসারে আমার নির্বেদ উপস্থিত হইয়াছে। আপনার রাজ্য আপনি যাহাকে ইচ্ছা দান করুন; আমার কন্যার জন্যও আর আমি অনুগ্রহ ভিক্ষা করি না। রট্টা আপনার স্নেহ পাইয়াছে, সে আপনারই কন্যা। আপনি প্রজার কল্যাণে যেরূপ ইচ্ছা করুন।'

সভা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; তার রট্টা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার চিত্রকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু হাসিল; তারপরে স্কন্দের দিকে ফিরিল। বলিল—'আয়ুষ্মন্, রাজ্যের ন্যায্য অধিকারীর যদি অভাব ঘটিয়া থাকে আমি একজন ন্যায্য অধিকারীর সন্ধান দিতে পারি।'

সকলে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিল। রট্টা বলিল—'যে আর্য রাজাকে জয় করিয়া পিতা বিটঙ্ক রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন সেই আর্যরাজার বংশধর জীবিত আছেন—'

স্কন্দ বলিয়া উঠিলেন—'কে সে? কোথায় সে?'

উত্তর না দিয়া রট্টা ধীর পদে গিয়া চিত্রকের সম্মুখে দাঁড়াইল। চিত্রক অভিভূতভাবে স্খলিত স্বরে একবার 'রট্টা—!' বলিয়া নীরব হইল।

রট্টা চিত্রকের হাত ধরিয়া স্কন্দের সম্মুখে লইয়া আসিল, বলিল—'ইনিই সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী।'

স্কন্দ সবিস্ময়ে বলিলেন—'চিত্রক বর্মা—!'

রট্টা বলিল—'ইঁহার প্রকৃত নাম তিলক বর্মা।'

স্কন্দ বলিলেন—'তিলক বর্মা, তুমি ভূতপূর্ব আর্য রাজার পুত্র?'

চিত্রক বলিল—'হাঁ। পূর্বে জানিতাম না, সম্প্রতি জানিয়াছি।'

স্কন্দ প্রশ্ন করিলেন—'প্রমাণ আছে?'

চিত্রক বলিল—'যিনি আমার গোপন পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন তিনিই প্রমাণ দিবেন। আমার কোনও আগ্রহ নাই।'

রট্টা বলিল—'প্রমাণ আছে; প্রয়োজন হইলেই দিব। কিন্তু আর্য, প্রমাণের কি কোনও প্রয়োজন আছে?'

স্কন্দ তীক্ষ্ণ চক্ষে একবার রট্টার মুখ ও একবার চিত্রকের মুখ দেখিলেন। তাঁহার অধরে ঈষৎ ক্লিষ্ট হাসি দেখা দিল। তিনি বলিলেন—'না, প্রয়োজন নাই। তিলক বর্মা, বিটঙ্কের সিংহাসন তোমাকে দিলাম। রট্টা যশোধরা, বিটঙ্কের রাজমহিষী হইতে বোধকরি তোমার কোনও আপত্তি নাই?'

রট্টা অধোমুখী হইয়া আবার পিতার পদতলে বসিয়া পড়িল। সভাস্থ সকলে চিত্রার্পিতবৎ এই দৃশ্য দেখিতেছিল, এখন হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল।

রোট্ট ধর্মাদিত্য আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; চিত্রককে সম্বোধন করিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—'বৎস, যৌবনের প্রচণ্ডতায় যে হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলাম তজ্জন্য অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। বিটঙ্কের সিংহাসন তোমার, তুমি তাহা ভোগ কর। আর, আমার রট্টা যশোধরাকে গ্রহণ করিয়া আমাকে ঋণমুক্ত কর।'

চিত্রক মস্তক অবনত করিয়া বলিল—'আপনি স্বেচ্ছায় ঋণ পরিশোধ করিলেন; আপনি মহানুভব। কিন্তু অন্য একটি আদান প্রদান এখনও বাকি আছে।'

চিত্রক দ্রুতপদে কিরাতের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল; বলিল—'আমার পরিচয় শুনিয়াছ। পিতৃঋণ শোধ করিতে প্রস্তুত আছ?'

রক্তহীন মুখ তুলিয়া কিরাত বলিল—'আছি।'

চিত্রক বলিল—'তবে তরবারি লও। আমাকেও পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।'

পরিশিষ্ট

আবার কপোতকূট।

রাজপ্রাসাদ আলোকমালায় ঝলমল করিতেছে। চারিদিকে বাদ্যোদ্যম। ঝল্লরী মুরলী মৃদঙ্গ বাজিতেছে; নগরীর পথে পথে নাগরিক নাগরিকার নৃত্যগীত আর শান্ত হইতেছে না। পুরাতন রাজপুত্র ও নূতন রাজকুমারীর বিবাহ। দুই রাজবংশ মিলিত হইয়াছে। রোট্ট ধর্মাদিত্য জামাতার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া চিত্রকূট বিহারে আশ্রয় লইবেন। সম্রাট স্কন্দগুপ্ত বরবধূর জন্য স্কন্ধাবার হইতে পাঁচটি হস্তী উপহার পাঠাইয়াছেন। বিশ্বাস-ঘাতক কিরাত মরিয়াছে।

সকলেই সুখী; সকলেই আনন্দমত্ত। এমন কি বৃদ্ধ হূণ-যোদ্ধা মোঙের অধরে হাসি ফুটিয়াছে। প্রত্যেক মদিরা-ভবনে নাগরিকেরা আনন্দ কোলাহল করিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছে এবং মদ্য পান করাইতেছে। তাহার বহুশ্রুত গল্প শুনিয়া কেহই পলায়ন করিতেছে না, বরং উচ্চকণ্ঠে হাসি-তেছে; বলিতেছে—'মোঙ, তারপর কী হইল? তারপর কী হইল?' মোঙের সুরাভিষিক্ত মন আনন্দে টলমল করিতেছে। সে ক্রমাগত গল্প বলিয়া চলিয়াছে।

রাজপ্রাসাদে বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। গভীর রাত্রে একটি পুষ্প-সুরভিত কক্ষে চিত্রক রট্টা আর সুগোপা ছিল।

চিত্রক বলিল—'সুগোপা, তুমি আমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ।'

সুগোপা চটুলকণ্ঠে বলিল—'বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে সখীকে পাইতেন কি?'

পুষ্পাভরণভূষিতা রট্টার হাতে একটি রৌপ্যনির্মিত বাণ* ছিল;

* আধুনিক কাজললতা

কন্যাকে বিবাহকালে ইহা ধারণ করিতে হয়। সেই বাণ দিয়া সুগোপার উরুর উপর মৃদু আঘাত করিয়া রট্টা বলিল—'সুগোপা কি আমার কাছে কিছু গোপন করিতে পারে। পর দিনই প্রাতে আসিয়া আমাকে তোমার সকল পরিচয় দিয়াছিল।'

চিত্রক রট্টার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'রট্টা, আমার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিয়া তোমার কী মনে হইয়াছিল?'

রট্টার চক্ষুদুটি ক্ষণকাল তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া রহিল; তারপর সে বলিল—'সেদিন সন্ধ্যার পর চাঁদের আলোয় প্রাকারের উপর তোমার সহিত দেখা হইয়াছিল, মনে আছে? তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলাম। মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তোমাকে প্রতিহিংসা লইবার সুযোগ দিব, নচেৎ তোমার হৃদয় জয় করিব। কিন্তু তুমি প্রতিহিংসা লইলে না। তাই তোমার হৃদয় জয় করিলাম; আর তোমাকে ভালবাসিলাম।'

রট্টা চিত্রকের প্রতি বিদ্যুদ্‌বিলাস তুল্য কটাক্ষ হানিল, তারপর সুগোপার কানে কানে বলিল—'সুগোপা, তুই এখন গৃহে যা—রাত্রি শেষ হইতে চলিল। আজিকার রাত্রে মালাকরকে আর বঞ্চিত করিস না।'

সুগোপাও চুপি চুপি বলিল—'বল না, নিজের মালাকর পাইয়াছ তাই আমাকে বিদায় করিতে চাও। আর বুঝি ত্বর্ সহিতেছে না?' সুগোপা ফুৎকারে প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল।

তারপর সুখ স্বপ্নের ন্যায় ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে।

ওদিকে হূণের সহিত স্কন্দগুপ্তের যুদ্ধ চলিতেছে। হূণ কখনও হটিয়া যাইতেছে, কখনও অতর্কিত পথে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। বিটঙ্ক রাজ্যে এখনও হূণ প্রবেশ করিতে পারে নাই। চষ্টন দুর্গে অধিষ্ঠিত হইয়া গুলিক বর্মা সহস্র চক্ষু হইয়া সঙ্কট পথ পাহারা দিতেছে।

চিত্রক নিজ রাজ্যে এক সৈন্য দল গঠিত করিয়াছে। তিন সহস্র সৈন্য কপোতকূট রক্ষার জন্য সর্বদা প্রস্তুত হইয়া আছে।

একদিন সূর্যাস্তের সময় প্রাসাদ শীর্ষে উঠিয়া রট্টা দেখিল, চিত্রক স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পশ্চিম দিগন্তের পানে তাকাইয়া আছে।

রট্টা কাছে গিয়া তাহার বাহু জড়াইয়া দাঁড়াইল। 'কি দেখিতেছ?'

চমক ভাঙিয়া চিত্রক বলিল—'কিছু না। সূর্যাস্তের বর্ণগৌরব কী অপূর্ব, মেঘ পাহাড় ও আকাশ একাকার হইয়া গিয়াছে—যেন রক্ত-বর্ণ রণক্ষেত্র।'

রট্টা কিছুক্ষণ চিত্রকের মুখের উপর চক্ষু পাতিয়া রহিল, তারপর বলিল—'যুদ্ধে যাইবার জন্য তোমার মন বড় চঞ্চল হইয়াছে?'

ধরা পড়িয়া গিয়া চিত্রক একটু করুণ হাসিল। রট্টা তাহার স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া বলিল—'যদি মন অধীর হইয়া থাকে, যুদ্ধে যাও না কেন?'

চিত্রক চকিতে একবার তাহার পানে চাহিল, কিন্তু নীরব রহিল। রট্টা তখন ঈষৎ হাসিয়া বলিল—'তোমার মনের কথা বুঝিয়াছি। তুমি ভাবিতেছ, হূণ আমার স্বজাতি, তাহাদের বিরুদ্ধে তুমি যুদ্ধ যাত্রা করিলে আমি দুঃখ পাইব। তোমার বোধ হয় বিশ্বাস, স্বজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে বলিয়া পিতা রাজ্য ত্যাগ করিয়াছেন। সত্য কি না?'

চিত্রক বলিল—'না, ধর্মাদিত্য অন্তর হইতে বুদ্ধ তথাগতের শরণ লইয়াছেন। কিন্তু তুমি রট্টা? তোমার দেহে হূণ রক্ত আছে। আমি হূণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলে সত্যই কি তুমি দুঃখ পাইবে না?'

রট্টা দৃঢ় স্বরে বলিল—'না। হূণ যেমন তোমার শত্রু তেমনই আমার শত্রু। আমার দেশ যে আক্রমণ করে, পরমাত্মীয় হইলেও সে আমার শত্রু। তোমার মন টানিয়াছে, তুমি যুদ্ধে যাও, স্কন্দগুপ্তের সহিত যোগদান কর।'

চিত্রক রট্টাকে বাহু বদ্ধ করিয়া বলিল—'রট্টা, ভাবিয়াছিলাম আমার

রাজ্য যতদিন আক্রান্ত না হইবে ততদিন নিরপেক্ষ থাকিব। কিন্তু তব হৃদয় অধীর হইয়াছিল। তুমি আমার মনের কথা কি করিয়া জানিলে?'

'আমি অন্তর্যামিনী তাহা এখনও বুঝিতে পারো নাই?' রট্টা হাসিল।

উৎসাহ ভরে চিত্রক বলিল—'তবে যাই? আমি এক সহস্র সৈন্য লইয়া যাইব, বাকি দুই সহস্র পুরী রক্ষার জন্য থাকিবে।'

রট্টা বলিল—'তুমি রাজা, তোমার যাহা ইচ্ছা কর। কিন্তু তোমার অনুপস্থিতিতে রাজ্য দেখিবে কে?'

চিত্রক বলিল—'তুমি দেখিবে। চতুর ভট্ট দেখিবেন।'

রট্টা অনেকক্ষণ স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। চোখ দুটি ছল ছল করিতে লাগিল। শেষে বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলিল—'তুমি যখন যুদ্ধ জয় করিয়া ফিরিয়া আসিবে, একটি নূতন মানুষ পুরদ্বারে তোমাকে অভ্যর্থনা জানাইবে।' বলিয়া স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইল।

শেষ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স এর পক্ষে

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬